ছোটগল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ জীবনবীক্ষা ও শিল্পচেতনা

(কলাবিভাগে পিএইচ.ডি. উপাধির জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত গবেষণাঅভিসন্দর্ভ)

উপস্থাপক - *সীমান্ত চৌধুরী*

তত্ত্বাবধায়ক - *ডঃ প্রসূন ঘোষ*

বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

মে, ২০০৯

STOCK TAKING - 2011

TK 80.33
Chow/Chofo
220129

26 JUL 2010

UNIVERSITY OF CALCUTTA
87/1 College Street
Kolkata - 700073

PRASUN GHOSH
Department of Bengali Language and Literature

Certified that the thesis entitled 'ছোটগল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র : জীবনবীক্ষা ও শিল্পচেতনা' submitted by Sri Simanta Chowdhury for the award of the degree of Doctor of Philosophy in Arts in University of North Bengal is based upon his original work carried out under my supervision and that this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere else.

Further, I certify that the candidate has followed all the established rules relevant for P.h.D. degree and I recommend that the thesis is up to the mark, for consideration for the award of Ph.D. degree.

Prasun Ghosh 1.5.200

(PRASUN GHOSH)
Supervisor

Lecturer
Dept. of Bengali
University of Calcutta

নিবেদন

সুদীর্ঘকাল ধরে উঁচুমানের কাজ ক'রে যাওয়া যদি কোনো লেখকের শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড হয় তবে সেই মানদণ্ডে নরেন্দ্রনাথ মিত্র বাংলা ছোটগল্পের জগতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার হিসেবে পরিগণিত হবেন, এই বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি চারশতাধিক ছোটগল্প রচনা করেছেন। রচনার এত বাহুল্য সত্ত্বেও তিনি সেই সকল রচনায় একটি প্রত্যাশিত উচ্চমান ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর রচনা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে, চিত্ররূপ লাভ করেছে যা তাঁর রচনার উৎকৃষ্টতার পরিচায়ক, কিন্তু এই কথাও এর সঙ্গে স্বীকার্য যে, তাঁর রচনা প্রত্যাশিত পর্যায়ে পঠিত ও আলোচিত হয়নি। স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠগ্রহণ কালে নরেন্দ্রনাথের রচনা আমাদের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত থাকলেও সেই সময়েই লক্ষ করি তাঁর ছোটগল্পের আলোচনার বই সুলভ নয়। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে ও সমালোচনামূলক সাহিত্যগ্রন্থে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পের আলোচনা বিধৃত হলেও তাঁর ছোটগল্পের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য ভাবে অপ্রতুল। ইতিপূর্বে মঞ্জুরী চৌধুরী ও অঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য মহাশয়া নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্প বিষয়ে পুস্তক রচনা করলেও ছোটগল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জীবনচেতনা, তাঁর গল্পের ভাষা, সময়ের ব্যবহার, কথনরীতি, তাঁর ছোটগল্পের রূপ-রীতি ও প্রকরণশিল্প বিষয়ক আলোচনা সেখানে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেনি। ছোটগল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বিশিষ্ট জীবনবীক্ষা ও তাঁর ছোটগল্পের শিল্পরূপকে পর্যালোচনা করবার উদ্দেশ্যেই এই অভিসন্দর্ভটি পরিকল্পিত হয়েছে।

বাংলা ছোটগল্প জগতে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের আবির্ভাবের কালটি বহুবিধ কারণেই বিশেষ গুরত্বপূর্ণ। এক উত্তাল সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাঁর সাহিত্যজগতে আর্বিভাব। তাই নরেন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বিশিষ্টতা পর্যালোচনায় তাঁর সময়কালটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই কারণেই আমার সমগ্র গবেষণাঅভিসর্ন্দভটি প্রস্তুত করা হয়েছে ঐতিহাসিক সমালোচনামূলক পদ্ধতিকে অনুসরণ ক'রে। অপরদিকে ছোটগল্পকার নরেন্দ্রনাথের জীবনবীক্ষা ও তাঁর ছোটগল্পের শিল্পরূপ বিশ্লেষণ করার সময় প্রয়োজন অনুসারে তুলনামূলক সমালোচনা পদ্ধতিকেও অবলম্বন করা হয়েছে। নরেন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী, সমসাময়িক ও পরবর্তী ছোটগল্পকারদের রচনার সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের রচনার তুলনার দ্বারা তাঁর রচনার বিশিষ্টতার দিকটি তুলে ধরবার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যেহেতু তাঁর জন্ম ও সাহিত্য জগতে আবির্ভাবের কালটি শুধু মাত্র রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণেই উত্তাল নয়, যুদ্ধ, মন্বন্তর,স্বাধীনতা আন্দোলন, দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু স্রোতধারা প্রভৃতিও সেই সময়ের বিশিষ্ট চিহ্ন, তাই প্রথম অধ্যায়ে নরেন্দ্রনাথের আবির্ভাব কাল ও সমকালীন প্রেক্ষাপটটি একটু বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরবার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শ্রী প্রসূন ঘোষ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে আমি এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি

প্রস্তুত করেছি। কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি সদাসর্বদা আমাকে উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং এই অভিসন্দর্ভটি প্রস্তুতিতে অমূল্য উপদেশ দান করেছেন। প্রয়োজনীয় সংশোধন ক'রে ও বিভিন্ন গ্রন্থের সন্ধান দিয়ে আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনা ক'রে ও তাঁর উপদেশ লাভ করে আমি ধন্য হয়েছি। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

গবেষণা অভিসন্দর্ভটি প্রস্তুতকালে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় গ্রন্থ, সাময়িক পত্র ও তথ্যাদি সংগ্রহে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের সকল কর্মীদের বিশেষ সহায়তা লাভ করেছি। লাইব্রেরিয়ান শ্রী রাণু চন্দ্র দে মহাশয় ও শ্রী সন্টু কর মহাশয় আমাকে বিশেষ সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের সহৃদয় সহায়তা ব্যতীত অনেক পুরাতন ও দুস্পাপ্য গ্রন্থ ও পত্রিকা ব্যবহার করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। তাদের সকলকেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমার শ্রদ্ধেয় পিতৃদেব শ্রীযুক্ত পীযূষকান্তি চৌধুরী ও মাতৃদেবী শ্রীযুক্তা শঙ্করী চৌধুরী আমাকে সর্বদা উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং তাঁদের বহুবছরের সংগ্রহকৃত পুস্তক সমূহ থেকে বিভিন্ন তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন। এছাড়া আমার সুহৃদ শ্রীমতি যূথিকা ঝা মহাশয়া আমাকে অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও প্রেরণা যুগিয়েছেন। তাঁদের উৎসাহ ব্যতীত এ কাজে অগ্রসর হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিলনা। তাদের ঋণ আমার কাছে অপরিশোধ্য।

কোচবিহার বাবুরহাটের ব্রাইট কম্পিউটার সেন্টারের শ্রী পিন্টু দাস ও শ্রী অভিজিৎ দত্ত মহাশয় আমার অভিসন্দর্ভটি টাইপ করে দিয়েছেন এবং বহু সময় ধরে প্রুফ সংশোধনের কাজে আমাকে সহায়তা করে আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করেছেন।

যথাসম্ভব ত্রুটি মুক্ত রাখার প্রচেষ্টা করা হলেও গবেষণা অভিসন্দর্ভটিতে বেশ কিছু ত্রুটি রয়ে গেল, সে দায় আমার।

সীমান্ত চৌধুরী
সীমান্ত চৌধুরী

তারিখ ঃ— ২৭.০৫.২০০৭.

সূচীপত্র

।। প্রথম অধ্যায় ।। পৃষ্ঠা

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের আর্বিভাব, সমকালীন প্রেক্ষাপট ও বাংলা সাহিত্য ১

।। দ্বিতীয় অধ্যায় ।।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সংক্ষিপ্ত জীবনভাষ্য ১৯

।। তৃতীয় অধ্যায় ।।

ছোটগল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জীবনবীক্ষা ৩২

।। চতুর্থ অধ্যায় ।।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পের শিল্পরূপ ১১২

।। পঞ্চম অধ্যায় ।।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পের ভাষা ১৭৮

।। ষষ্ঠ অধ্যায় ।।

সমকালীন ছোটগল্পকার ও নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পের তুলনামূলক আলোচনা এবং বাংলা ছোটগল্পসাহিত্যে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের স্থান ২০৮

।। প্রথম অধ্যায় ।।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের আর্বিভাব, সমকালীন প্রেক্ষাপট ও বাংলা সাহিত্য

সময় ও সমাজ পরিবর্তনের ধারা ব্যক্তির মানসিকতা, জীবনাদর্শ ও মূল্যবোধের পরির্বতন ঘটায়, আর ব্যক্তির এই পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী ছায়াপাত ঘটে সেই সময়ে রচিত কথাসাহিত্যে। সাহিত্যের অন্যান্য শাখা অপেক্ষা ছোটগল্পের সঙ্গে সমকালীন জীবনের সর্ম্পক একান্ত ঘন নিবদ্ধ কারণ ছোটগল্পে কাল সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায় সুস্পষ্টরূপে। লেখকের ভাবলোককে প্রভাবিত করে সমকাল আর শিল্পির তথা লেখকের ভাবলোক জন্ম দেয় গল্পের জীবনভূমিকে।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট ছোটগল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জন্ম ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে আর ছোটগল্পকার হিসাবে তাঁর আবির্ভাব ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে 'দেশ' পত্রিকায় 'মৃত্যু ও জীবন' গল্পটি রচনার মধ্য দিয়ে। তাঁর লেখক হিসাবে গড়ে উঠবার কালটি (১৯১৬-১৯৩৬) ও লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার সময়টিও বিভিন্ন কারণেই বিশিষ্টতায় পরিপূর্ণ। সাহিত্য জগতে তাঁর আর্বিভাবের অব্যবহিত পূর্বে উনিশ শতকের তিনের দশকে বাংলা সাহিত্যে তরুণ সাহিত্যিক গোষ্ঠী প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখের নতুন সাহিত্য প্রচেষ্টার ফসল হিসাবে শুরু হয়েছে 'কল্লোল' ও 'কলিকলমে'র যুগ। বাংলা সাহিত্যের এই ভিন্নমুখী প্রবর্তনার মূল লক্ষ্য রবীন্দ্রবিরোধিতা ও রবীন্দ্রোত্তর যুগ আনয়ন। সুগভীর দেহোত্তীর্ণ প্রেমচেতনার পরিবর্তে বিক্ষুব্ধ দেহকামনার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি, নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন সংগ্রাম, সংশয় ও সঙ্কটের জটিল রূপবিন্যাস, সমাজের নীচতম তলার 'অবজ্ঞাত অপজাত' মানুষের কাহিনির রূপায়ণ এবং মানুষের অদিম প্রবৃত্তির লীলার উদ্‌ঘাটনে বাংলা কথাসাহিত্য তখন আলোড়িত। বুদ্ধদেব বসুর একটি লেখা থেকে এই সময়ের সাহিত্যের দিক নির্দেশ পাওয়া যায়। তিনি লেখেন — " বাহ্যিক অবস্থার ওলোট-পালোট হলে চিন্তাজগতেও কিছু না কিছু বিল্পব আসতে বাধ্য। বর্তমান বাঙ্গালীর চিন্তাধারার বর্ণনা করতে গেলে এককথায় বলা যেতে পারে যে তাদের সম্পূর্ণ disillusionment - এসে গেছে। আমরা মোটের উপর অনেক বেশী rational হয়েছি। অন্ধভক্তির উপর আমাদের আর আস্থা নেই; আমরা বিশ্বাস করতে শিখেছি বিজ্ঞানকে। ভগবান, ভূত ও ভালোবাসা – এ তিনটি জিনিসের উপর আমাদের প্রাক্তন বিশ্বাস আমরা হারিয়েছি।"[১]

বুদ্ধদেব বসু বাহ্যিক অবস্থার যে 'ওলোট পালোট' কে সমকালীন চিন্তাজগতের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন, সেগুলির সূত্রপাত অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায় তাদের সূচনা বহু পূর্বেই ঘটেছিল। এসবের অভিঘাত ও পরবর্তী বিপরীত অভিঘাতের ফলাফলই এই 'ওলোট-পালোট'। এর সূচনা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১) থেকে। এরপর ক্রমান্বয়ে ঘটেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪),

রুশ বিপ্লব (১৯১৭), মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার পরিকল্পনা (১৯১৯), প্রাক্ বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালে বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দা, অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, নিদারুণ খাদ্য ও বস্ত্রসংকট, নিষ্ঠুর দমনমূলক রাওলাট আইনের প্রবর্তন, জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ও দেশব্যাপী বিক্ষোভ, অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০)— প্রভৃতি ঘটনা। এই সমস্ত ঘটনা দেশের জনসমাজে এক প্রবল হতাশা, অনিশ্চয়তা,অস্থিরতা, অবিশ্বাস ও প্রচলিত মূল্যবোধ সম্পর্কে বিশ্বাসভঙ্গের জন্ম দিয়েছিল। এই সময়েরই প্রতিনিধিত্ব ক'রে জগদীশ গুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (জন্ম ১৯০৩), প্রেমেন্দ্রমিত্র (জন্ম ১৯০৪), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮) প্রমুখেরা প্রকাশ করেছেন 'কল্লোল' পত্রিকা (১৯২৩)। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে ওঠা সাহিত্য আন্দোলনের যুগই 'কল্লোল যুগ' নামে পরিচিত। সমালোচক তৎকালীন সময়ের ঘটনাবলী ও সাহিত্যে তার প্রতিফলন সম্পর্কে বলেন— "যুদ্ধোত্তর কালে জাতীয়- জীবনে নানা বিপর্যয় ও আন্দোলনের ফলে সমগ্র দেশের তথা বাঙলার যুবচিত্ত অশান্ত, বিহ্বল ও হতাশ হয়ে উঠেছিল। প্রচলিত মূল্যবোধ সম্পর্কে সংশয় ও জিজ্ঞাসা উদ্যত হয়ে উঠতে লাগল মনের মধ্যে। সেই জিজ্ঞাসা সংশয় ও হতাশার ছবি এই শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের কথাসাহিত্যে ফুটে উঠেছে।"[২]

আমাদের আলোচ্য গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পকার হিসাবে আবির্ভাব ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে, সুতরাং এক অগ্নিগর্ভ সময়ে সাহিত্য জগতে তাঁর পদার্পণ। তাই তাঁর রচনার প্রেক্ষাপট ও আর্বিভাব কালের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণস্থান দখল করে তাঁর সময়কাল। তাঁর লেখক হয়ে গড়ে উঠার ইতিহাস পর্যালোচনায় তাই তৎকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী, বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব, আবিষ্কার ও উদ্‌ঘাটন গুরুত্বপূর্ণ স্থান আধিকার ক'রে আছে।

পূর্বে উল্লেখিত বুদ্ধদেব বসু কথিত 'ওলোট-পালটে'র সূচনার বিচারে একটু পিছনে ফিরে তৎকালীন বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতির দিকে দৃষ্টি ফেরানো যেতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমেই সবচেয়ে বড় ঘটনা বঙ্গভঙ্গ ও তৎসঞ্জাত গণআন্দোলনের সূত্রপাত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বাংলাদেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের জোয়ার দেখা যায়। জাতীয় চেতনার বিকাশ ও জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলার অগ্রণী ভূমিকাতে চিন্তিত চতুর রাজনীতিবিদ কার্জন বঙ্গ-বিভাগ ক'রে বাঙালি জাতিকে দুর্বল করার সুচতুর রাজনৈতিক প্রয়াস করেন। ১৯০৫ সালের ১৯শে জুলাই সরকারী ভাবে বঙ্গভঙ্গের কথা ঘোষণা করা হয়। এতে বলা হয় ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রাজশাহি বিভাগ (দার্জিলিং বাদে), মালদা জেলা এবং পার্বত্য ত্রিপুরাকে অসমের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠন করা হবে। এর ফলে আসামের নতুন নাম হবে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম'। ১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫ বঙ্গভঙ্গের দিন স্থির হয়। বঙ্গভঙ্গের পক্ষে সরকারী যুক্তি ছিল যে, বাংলার ভৌগোলিক এলাকার বিস্তৃতি ও জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বঙ্গভঙ্গের প্রয়োজন। কিন্তু

প্রকৃতপক্ষে এর পিছনে কাজ করেছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সুগভীর রাজনৈতিক স্বার্থ। ভারত সরকারের তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব এইচ.এইচ. রিজলির ১৯০৪ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী ও ৬ই ডিসেম্বর তারিখের দুটি চিঠিতে ইংরেজ শাসকদের প্রকৃত উদ্দেশ্যের স্পষ্ট উল্লেখ আছে— "Bengal united is a power; Bengal devided will pull in several different ways. Our main object is to split up and thereby weaken a solid body of opponents to our rule."[৩]

বাংলার ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভের সূত্রপাত ঘটে। এই আন্দোলনের কর্মসূচীতে বিলাতি দ্রব্য বর্জন ও বয়কট এবং স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহারের আহ্বান অন্যতম। বাহ্যত অর্থনৈতিক চরিত্রের হলেও এই স্বদেশি আন্দোলন অচিরেই সমগ্র ভারতবাসীর গণআন্দোলনের রূপ নিয়েছিল। বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলেও ছড়িয়ে প'রে এই স্বদেশি বয়কট আন্দোলন সর্ব-ভারতীয় রূপ গ্রহণ করে। যেদিন বঙ্গভঙ্গ আইন বলবৎ হয় অর্থাৎ ১৯০৫ এর ১৬ই অক্টোবর, সেদিন বঙ্গভঙ্গ দিবস হিসাবে প্রদেশের সর্বত্র শোকদিবস পালিত হয়। কলকাতায় সেদিন এক বিরাট বিক্ষোভের পর এক বিশাল শোভাযাত্রা গঙ্গাতীরে পৌঁছয় এবং বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে মাতৃভুমিকে পুনরায় সংযুক্ত করার শপথ গ্রহণ করা হয়। সে দিন শহরের দোকানপাট বন্ধ থাকে, গৃহে গৃহে অরন্ধন পালিত হয় এবং রাখীবন্ধন উৎসব পালিত হয়। এই আন্দোলন কোন বিশেষ শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে গণ-আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে স্বদেশি আন্দোনের এই বছরগুলিতে বাঙালির যেন নবজন্ম হয়েছিল। এই আন্দোলনের আহ্বানে দেশের যুব সম্প্রদায় তাদের ব্যক্তিগত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে বৃহত্তর জনসমাজের কল্যাণ সাধনের ব্রতগ্রহণ করেছিল। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮) প্রমুখের জন্ম এই ১৯০৫ সালের কাছাকাছি সময়ে।

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয় আর ১৯১৪ সালে শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে বিরোধের কারণে এবং মুসলিম লিগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কারণে জাতীয় আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে ব্রিটেনের মিত্র দেশ হিসেবে মিত্রপক্ষে যোগদান করতে বাধ্য করে। ভারতীয় সৈন্য ও অর্থ যুদ্ধের কাজে লাগানো হয় কিন্তু এ বিষয়ে ভারতবাসীর মতামত গ্রহণ করা হয়নি। যুদ্ধের প্রারম্ভে দেশীয় নেতৃবর্গের আশা ছিল, যুদ্ধে যোগদান ক'রলে ব্রিটেন কৃতজ্ঞতাবশে ভারতবাসীকে স্বরাজদান করবে। কিন্তু যুদ্ধের তৃতীয় বছরেও এর কোনো সম্ভাবনা দেখা না গেলে অ্যানি বেসান্ত ও পরে বাল গঙ্গাধর তিলক স্বরাজ লাভের দাবিতে হোমরুল আন্দোলন শুরু করেন যা ঝিমিয়ে পড়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে পুনরায় চাঙ্গা করে তোলে ও আন্দোলনে

গতি সঞ্চার করে। এই আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনে একটি নতুন অধ্যায় সূচিত করে। এত আন্দোলনের পরেও কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে ভারতবাসী স্বরাজ লাভ করেনি বরং ভারতবর্ষের মানুষ লাভ করে মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার পরিকল্পনা (১৯১৯)।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অর্থনৈতিক ভাবে ভারতবর্ষকে বিশেষভাবে দুর্বল ক'রে তুলেছিল। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দুর্মূল্যতা, খাদ্যাভাব, বস্ত্রাভাব বাংলা তথা ভারতবাসীকে এক কঠোর নিষ্পষণে পীড়িত করে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের 'Indian Annual Registar' থেকে এই সময়ের অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়— "Large numbers were thrown out of work. The working class could not support their families, people died from starvation , women committed suicide for nekedness."[৪]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিপুল ব্যয়ভার মেটাবার দায়ভার বিট্রিশরা চাপিয়ে দিয়েছিল ভারতের উপর। এক প্রবল শোষণের দ্বারা সামরিক ব্যয়ের দাবি মেটাতে নাভিশ্বাস উঠেছিল সাধারণ ভারতবাসীর। যুদ্ধ চলাকালীন সমস্ত বিশ্বজুড়েই চলছিল অর্থনৈতিক সঙ্কট। শিল্প সম্পর্কযুক্ত ফসলের রপ্তানি হ্রাসে যেমন কৃষকদের দুরবস্থা বৃদ্ধি পেয়েছিল তেমনি জমিদার ও মহাজনেরা কৃষকদের উপর শোষণ বৃদ্ধি ক'রে নিজেদের ক্ষতিপূরণের প্রচেষ্টা করেছিলেন। যুদ্ধ সমকালে ও তার পরবর্তী কালে কৃষক ও ক্ষুদ্রশিল্পের কারিগর ও শ্রমিক সম্প্রদায় ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। যুদ্ধশেষে যুদ্ধ সংলগ্ন উৎপাদন বন্ধের ফলে দেখা যায় ব্যাপক কর্মী ছাটাই ও তার বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় বোম্বাই, মাদ্রাজ, কানপুর, আমেদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়ন গুলির ধর্মঘট। ১৯১৮-১৯১৯ এবং ১৯২০-১৯২১ এই দুই বছর শষ্যহানি ও শষ্য উৎপাদনে ঘাটতি হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও শস্য রপ্তানি বহাল থাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং একই সঙ্গে মহামারি রূপে দেখা দেয় ইনফ্লুয়েঞ্জা। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা মানুষকে ঠেলে দেয় মৃত্যুর মুখে। এই সময়ে শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের তীব্রতাকে বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়।

এর পূর্বে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার বিপ্লব ও জারের পতন ভারতের মুক্তি সংগ্রামে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। রুশ বিপ্লবের সাফল্য ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে তীব্রতর করবার প্রেরণা যুগিয়েছিল। একদিকে বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্য অপরদিকে বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন সময়ে এশিয়া আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদী সচেতনতার প্রসারে ব্রিটিশেরা শঙ্কান্বিত হয়েছিল।অপরদিকে ভারতীয় নেতৃবর্গ যুদ্ধে সহযোগিতার পুরস্কার স্বরূপ স্বরাজ লাভের স্বপ্ন দেখছিলেন। কিন্তু তাদের স্বপ্নভঙ্গের জন্য ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তন করেন ১৯১৯- এর সংস্কার আইন যা মন্টেগু চেমসফোর্ড আইন নামে খ্যাত। এই আইনের দ্বারা শাসনের বিষয়গুলি কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সুনির্দিষ্ট ভাবে বণ্টন করা হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচক মণ্ডলীর কিছুটা সম্প্রসারণ ঘটেছিল। কিন্তু এই সংস্কার আইনের ফলে

প্রশাসনিক কাঠামোয় কোনো মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়নি। দ্বৈতশাসনের ফলে প্রদেশেও প্রকৃত স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ই ছিল সংরক্ষিত, সেই বিষয়গুলিতে গভর্নরই সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। ভারতবাসীর আশাভঙ্গের ফলে গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেসের এক বিরাট অংশ নির্বাচন বয়কট করে। এই অসন্তোষ নিয়ে আসে প্রবল রাজনৈতিক অস্থিরতা।

এই সময় যুদ্ধকালীন ভারতরক্ষা আইনের মেয়াদ শেষে ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তন করে কুখ্যাত রাওলাট আইন। এই আইনের বলে সরকার বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে যে কোন ব্যাক্তিকে গ্রেপ্তার ও বিনা বিচারে বন্দী করা যেত। বিনা পরোয়ানায় যে কোন ব্যক্তির গৃহ তল্লাশি করা যেত এবং যে কোনো ব্যক্তির গতিবিধির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা যেত। এই আইনে রাজনৈতিক বিচারের জন্য পৃথক বিশেষ আদালত গঠনের ব্যবস্থা হয়, এই বিশেষ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা যেতনা, এমনকি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপরেও হস্তক্ষেপ করা হয়। এই আইনের প্রতিবাদে সমগ্র ভারতে গণ- আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠে। এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য গান্ধীজি 'সত্যাগ্রহ' ও অহিংস গণ-আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সমগ্র ভরতবর্ষ জুড়ে এক অভাবনীয় উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দেয়। এই সময় জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের ফলে ব্রিটিশবিরোধী তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এরপর গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন ছিল (১৯২০-২২) ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এক সাহসী প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। এই সময়ের পর থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির কাল ও তার পরবর্তী সময়েও ভারতবর্ষ ছিল উত্তাল সমরাঙ্গন বিশেষ। যেখানে একে একে যোগ হয়েছে বিভিন্ন উদ্দীপক যেমন - সাইমন কমিশন, আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০-৩১), চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন (১৯৩০), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (প্রারম্ভ ১৯৩৯), আগস্ট বা ভারত ছাড়ো আন্দোলন (১৯৪২)।

৪০ এর দশক বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের পালাবদলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। এই পালাবদলগুলির সর্বশেষ ফললাভ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উত্তাপ তেমন ক'রে ভারতবর্ষের গায়ে লাগেনি কারণ ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের জনসাধারণের তেমন প্রত্যক্ষ যোগ সেই যুদ্ধের সঙ্গে ছিল না। তথাপি যে যুদ্ধে পৃথিবীর প্রায় সব দেশকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছিল সেই যুদ্ধের প্রভাব ভারতবর্ষের উপরেও কিছু মাত্রায় পড়েছিল। এই প্রভাবের নিদর্শন— শুধুমাত্র ভারতীয় সৈনিকদের নিয়ে গঠিত Bengal Battalion। যুদ্ধে ইংরেজ সহায়তার পরিবর্তে ভারতবর্ষের স্বরাজ লাভের সম্ভবনা শেষ পর্যন্ত ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। স্বরাজের পরিবর্তে ভারতবর্ষ লাভ করেছিল স্বায়ত্ব শাসন, যাকে নজরুল ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন— "পোড়া বার্তাকু এনেছি খাস' ('আমার কৈফিয়ৎ')। তবে যাইহোক প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অপেক্ষা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত ভারতবর্ষের বুকে প্রগাঢ়তর হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলির প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনার মূল কারণ। হিটলার জার্মানে

শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনকে ধ্বংস করার ফলে সমগ্র বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক শক্তিও এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং পরিস্থিতিকে ঘোরালো ক'রে তোলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি ও সূচনার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে সমালোচক বলেন — "আন্তর্জাতিক দিক থেকে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের প্রকৃতি নির্ণয় করলে দেখা যায় যে এই যুদ্ধের মূলসূত্রটি ছিল সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক শক্তিগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে। যদিও জার্মানী, ইতালি ও জাপান এবং ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা এই দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলেই এই যুদ্ধের সূচনা, তথাপি এর সঙ্গে নবজাত সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা যুক্ত হয়ে যুদ্ধের গতিকে করে তুলেছিল তীব্র এবং জটিল। জার্মানিতে যখন হিটলার শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনকে ধ্বংস করলেন তখন সারা পৃথিবীতে ভারসাম্য পাল্টে গেল এবং ফ্যাসীবিরোধী মনোভাবের চেতনা বাড়তে লাগল। প্রকৃত বিরোধের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রথমত ধনতান্ত্রিক রাজ্যগুলি সোভিয়েত বিরোধিতা বজায় রেখে, মিউনিক চুক্তির মাধ্যমে ফ্যাসীজোট কে তোষণ করার নীতি চালাতে লাগল। কিন্তু হিটলার কর্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রান্ত হওয়ার পর এই তোষণ নীতি বজায় রাখা আর সম্ভব হল না এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্রতর আকারে প্রকাশিত হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে ।

প্রথম দিকে এই যুদ্ধ সীমাবদ্ধ ছিল মিত্রশক্তি অর্থাৎ ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ এবং অক্ষশক্তি অর্থাৎ জার্মানি, জাপান, ইতালি প্রভৃতি দেশগুলির মধ্যে। কিন্তু ১৯৪১ সালের ২২শে জুন জার্মানি সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করার পর এ যুদ্ধ বিস্তৃত আকার ধারণ করল এবং পৃথিবীব্যাপী কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলি এ যুদ্ধকে ফ্যাসীবিরোধী মুক্তিযুদ্ধ রূপে ঘোষণা করল ।"[৫]

এমন একটি সর্বব্যাপী ও সর্বাত্মক যুদ্ধ ভারতবর্ষের বুকেও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই সময় ভারতবর্ষ ছিল সম্পূর্ণরূপেই ইংরেজের হাতের পুতুলমাত্র। ফলে এই যুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তির যোগদানের পরই তৎকালীন ভারতের ভাইসরয় লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো এই যুদ্ধে ভারতের যোগদানের কথা ঘোষণা করে দেন। এই সিদ্ধান্তের পূর্বে ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে কোনরূপ আলোচনার প্রয়োজন তিনি বোধ করেননি। ফলে সরকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের ঢেউ ওঠে । এই আন্দোলনের পিছনে ছিল ব্যাপক গণ সমর্থন । নাৎসী জার্মানির বিরুদ্ধে যে সব দেশ যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল,তাদের মধ্যে ভারতবর্ষের বুকেই এই যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন ব্যাপক গণ সমর্থন লাভ করেছিল ।

১৯৩৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে কংগ্রেস পার্টি এই যুদ্ধে ইংরেজদের সহায়তা করবার বিষয়টিকে শর্ত সাপেক্ষ করে তুললেন । কংগ্রেস ব্রিটিশদের এই যুদ্ধোদ্যোগে সাহায্য করবার জন্য, ইংরেজ সরকার দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা লাভের অধিকার স্বীকার করা, সংবিধান সভা আহ্বান করা, অদূর ভবিষ্যতে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণে ভারতীয় রাজনৈতিক

দলগুলির অধিকার স্বীকার,অবিলম্বে ভাইসরয়ের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় আইনসভার কাছে দায়বদ্ধ একটি সরকার গঠন প্রভৃতি শর্ত স্থাপন করে। অপর প্রধান রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগও তাদের অর্থাৎ মুসলমানদের অধিক সংখ্যায় প্রতিনিধিত্ব আইনসভা গুলিতে থাকবে এই শর্তে ইংরেজদের যুদ্ধোদ্যোগকে সমর্থন করবে বলে ঘোষণা করেছিল। একমাত্র এদেশের দেশিয় রাজন্যবর্গ , সামন্ত ভূস্বামী ও বুর্জোয়াদের প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলিই ব্রিটিশ সরকারের এই যুদ্ধোদ্যোগকে নিঃশর্তে সমর্থন করেছিল।

কংগ্রেস কমিটির এই প্রস্তাব বা দাবীগুলির জবাবে ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর একটি 'শ্বেতপত্র' প্রকাশ করে এবং তাতে ঐ দাবীগুলিকে পরোক্ষে অগ্রাহ্য করে। এই শ্বেতপত্রের প্রতিবাদে আটটি প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রীরা পদত্যাগ করে ১৯৩৯ সালের আক্টোবর ও নভেম্বর মাসে। ইতিহাসকার লেখেন— "কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের দৃঢ় পদক্ষেপ তখন জায়মান সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ-আন্দোলনে নতুন অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল এবং ফলত, ব্রিটিশ সরকার জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবর্গের কাছে নতুন প্রস্তাব উপস্থাপনে বাধ্য হয়েছিল।"[৬]

ফলে চাপে পড়ে ১৯৪০ এর ১০ই জানুয়ারি তৎকালীন বোম্বাইয়ের একটি বক্তৃতায় ভাইসরয় লিন্‌লিথগো বলেন যে যুদ্ধের পর ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা দেওয়া হবে এবং আরও ত্রিশ বছর দেশরক্ষা ব্যবস্থা ব্রিটেনের হাতেই থাকবে। এই ঘোষণায় যেহেতু দায়িত্বশীল সরকার গঠন সংক্রান্ত জাতীয়তাবাদীদের মূল দাবীর কোন সুস্পষ্ট উত্তর ছিল না ফলে জাতীয় কংগ্রেস এই প্রস্তাবকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেনি।

মাদ্রাজ (বর্তমান চেন্নাই), কানপুর, পাটনা প্রভৃতি বেশ কিছু স্থানের শিল্পকেন্দ্রগুলিতে কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীরা যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকেই । এই বছরে মোট ১১০টি ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই আন্দোলনে ১লক্ষ ৭০ হাজার লোক যোগ দিয়েছিল। এই শ্রমিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা অস্থির হয়ে উঠেছিল আর এই শ্রমিক আন্দোলনের পটভূমিতে নরেন্দ্রনাথ বেশ কয়েকটি ছোট গল্প রচনা করেছেন, এই প্রসঙ্গে 'অপঘাত' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮), 'শোক' (১৩৫৪), 'ক্রৌঞ্চমিথুন' (চৈত্র, ১৩৫২) প্রভৃতি গল্পের নাম উল্লেখ করা যায়।

১৯৩৯-৪০ সালে মোট ধর্মঘট ও তাতে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের সংখ্যা ও মোট বিনষ্ট কার্যদিবসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ এই সময় শ্রমিক শ্রেণির অর্থনৈতিক সংগ্রাম আরও তীব্রতা লাভ করেছিল।

ভারতবর্ষের আভ্যন্তর পরিস্থিতি যখন এইভাবে উত্তাল হয়ে উঠেছে তখন ১৯৪০ এর শেষদিকে পশ্চিম সীমান্তে জার্মানির সাফল্য ব্রিটিশদের সামরিক অবস্থান তথা রাজনৈতিক অবস্থানকে দুর্বল করেছিল

এবং এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত ভারতবর্ষের পরিস্থিতিও এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ১৯৪০ এর অক্টোবরে মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেন। যুদ্ধ বিরোধীতা ও শান্তির সমর্থন ছিল তাঁর উদ্দেশ্য, কিন্তু ব্রিটিশদের চরম দমন নীতির ফলে এই আন্দোলন সফল হয়নি।

পূর্বেই বলা হয়েছে নাৎসি জার্মানরা সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করলে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধে যোগদান করলে যুদ্ধের প্রকৃতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। এই ঘটনা ঘটেছিল ১৯৪১ এর জুন মাসে। এই ঘটনায় ভারতবর্ষের কম্যুনিষ্ট পার্টির ভাবধারায় ব্যাপক পরিবর্তন হয় এবং তারা অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধকে জনযুদ্ধে রূপান্তরিত করবার আহ্বান জানায় এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিরোধিতাকে সমর্থন করে না। এই সময় পর্যন্ত ভারতবর্ষের ভিতরে রাজনৈতিক আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠলেও যুদ্ধে অক্রান্ত হবার আশঙ্কা দেখা দেয়নি বা যুদ্ধের আতঙ্ক জনমানসে ছড়িয়ে পড়েনি। কিন্তু ১৯৪১ সালের শেষদিকে জাপান সরকার এই যুদ্ধে যোগদান করলে ব্রিটিশদের এশীয় উপনিবেশগুলির উপর যুদ্ধের আক্রমণের ছায়াপাত ঘটে। ১৯৪২ এর ২৮শে জানুয়ারি জাপানিরা ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনের উপর বোমাবর্ষণ করে এবং ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুন দখল ক'রে নেয়। জাপান ব্রহ্মদেশ আক্রমণ ক'রে দখল ক'রে নেওয়ার ফলে যুদ্ধ ভারতের একেবারে দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়। ব্রহ্মদেশ দখলের পর জাপান ভারত অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং ২০শে ডিসেম্বর কলকাতায় প্রথম বোমাবর্ষণ করে।

এই সময়ে লেখা নরেন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে কলকাতায় বোমা বর্ষণের সংবাদ পাওয়া যায়। ৩,এফ. নিবেদিতা লেন থেকে ২২শে ডিসেম্বর ১৯৪২ তারিখে লেখা চিঠিতে স্ত্রী শোভনাদেবীকে নরেন্দ্রনাথ লেখেন— "বোমা শেষ পর্যন্ত পড়লই কলকাতায়, অবশ্য এখনও ঠিক মাথার উপর নয়, এপাশে ওপাশে, কলকাতার শহরতলির এখানে-ওখানে কিছু বোমাবর্ষণ হয়েছে এ খবর ইতিমধ্যেই খবরের কাগজে বোধহয় পেয়েছ। পরশু রবিবার রাত্রে প্রথম আরম্ভ হয়।"[৭] নরেন্দ্রনাথ চিঠি লিখছেন ২২শে ডিসেম্বর আর বোমাবর্ষণে শুরু হয়েছে 'পরশু' অর্থাৎ ২ দিন আগে অর্থাৎ ২০ শে ডিসেম্বর। এই চিঠিতেই অন্যত্র তিনি নিজের যে অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে সেই সময়ের কলকাতার অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়— "কাল রাত্রেও সাইরেন বাজল রাত সাড়ে তিনটায় এবং পাঁচ মিনিট পরেই বোমাবর্ষণের আওয়াজ শুনতে পেলাম। কাল অবশ্য বাসাতেই ছিলাম। নিচের বৈঠকখানা ঘরে সবাই মিলে গিয়ে বসলাম। গোটা চারেক শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম। প্রত্যেক বারই জানলা দরজা কেঁপে উঠেছিল। ... সকালে কাগজে কালকে রাত্রের খবর কিছু বার হয়নি দেখলাম। কোথায় কী হল বলা যাচ্ছে না। তবে শহরে নয় শহরতলিতেই পড়েছে এটা ঠিক। এ-যাত্রাও মাথা বাঁচল। শব্দ যা শোনা গেছে এখান থেকে, তা কিন্তু তত দারুণ নয়। বহুদূর থেকে শোনা বাজীর আওয়াজের মতো।"[৮]

অতএব দেখা যাচ্ছে চল্লিশের দশকের এই উত্তাল ও উত্তপ্ত যুদ্ধ ও বিক্ষোভময় পরিস্থিতিতে

নরেন্দ্রনাথ কলকাতায় কাটাচ্ছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই সময় তিনি চাকরীর সন্ধান করেছেন ও লেখালিখির মাধ্যমেও উপার্জনের চেষ্টা করেছেন। যাইহোক এখন আবার তৎকালীন ভারত তথা বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা আলোচনা করা যেতে পারে। এই সময় জাপানের আক্রমণ, ব্রহ্মদেশে ব্রিটিশ সৈন্যদের পরাজয় – দেশে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চাপ প্রভৃতি সব মিলিয়ে দেশের অবস্থা উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছিল।

১৯৪১ এর ডিসেম্বর মাসে সত্যাগ্রহ আন্দোলনকারী অধিকাংশ বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। এরপর ১৯৪২ এর মার্চ মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌কে বিশেষ দূত হিসাবে ভারতে পাঠান। ক্রিপস্ নতুন ব্রিটিশ প্রস্তাব সহ ভারতে আসেন। এই প্রস্তাবে বলা হয়— যুদ্ধকালে ভারতবর্ষে স্থিতাবস্থা বজায় থাকবে এবং যুদ্ধ শেষে নির্বাচনের মাধ্যমে এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের মনোনীত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি সংবিধান সভা গঠন করা হবে আর এই পরিষদ ডোমিনিয়নের জন্য একটি সংবিধান রচনা করবে। এছাড়া কতকগুলি প্রদেশ ও এলাকা স্বাধীন ডোমিনিয়ন হিসেবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত থাকতে পারবে।

এই প্রস্তাব কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সমবেত বিরোধিতায় প্রত্যাখ্যাত হয়। যদিও উভয় দলের প্রত্যাখ্যানের কারণ ছিল ভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় উপমহাদেশকে খণ্ড খণ্ড করে বিভক্ত করার ব্রিটিশ চক্রান্ত এই ক্রিপস প্রস্তাবেই প্রথম সূত্রাকারে রচিত হয়েছিল।

১৯৪২ এর এপ্রিলে 'হরিজন' পত্রিকায় লেখা একটি প্রবন্ধে গান্ধীজী 'ভারতছাড়ো' স্লোগানটি উত্থাপন করেন। ভারতবর্ষকে অবিলম্বে স্বাধীনতা দানের আহ্বানই ছিল এই স্লোগান। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ওয়ার্ধা বৈঠকে এই ভারতছাড়ো দাবিটি অনুমোদিত হয় এবং এই প্রস্তাবে ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা হয়। ৪২ এর আগষ্টে বোম্বাই অধিবেশনে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি আইন অমান্য আন্দোলন প্রারম্ভের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের দুদিনের মধ্যে ইংরেজ সরকার গান্ধীজী সহ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সকল কংগ্রেস নেতাকেই গ্রেপ্তার করে এবং কংগ্রেসের যাবতীয় কার্যকলাপ ও সংগঠনকে বেআইনি বলে ঘোষণা করে।

একদিকে জাপানী আক্রমণের আশঙ্কায় শঙ্কিত ভারতবাসী, অপরদিকে জাতীয় ও প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারি এই দুইয়ের যোগে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে স্বতঃস্ফূর্ত জনরোষ দেখা দেয় এবং নেতৃত্ববিহীন এই জনরোষবহ্নি কেবল বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ ধর্মঘটে আটকে না থেকে সশস্ত্র বিপ্লবের আকার ধারণ করে। শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত এমনকি উচ্চবিত্ত সকলের যোগদানে এই বিদ্রোহ জাতীয় গণ –আন্দোলনের রূপ নেয়। যুবকেরা এই সময় রেলস্টেশন, পোস্ট–অফিস, থানা প্রভৃতি সরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর আক্রমণ চালায়, যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে, সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার বিঘ্ন ঘটাতে পুল উড়িয়ে দেয়। কোথাও কোথাও পুলিশ কর্মচারীদের উপর আক্রমণ ঘটে। এই সকল বিষয় নরেন্দ্রনাথের

বেশ কিছু ছোটগল্পের পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'শোক' গল্পটির কথা উল্লেখ করা যায়। প্রাক স্বাধীনতা পর্বের গণ-আন্দোলন গল্পটির পটভূমি রূপে অঙ্কিত হয়েছে। যাইহোক প্রকৃত পক্ষে এই বিদ্রোহের বিদ্রোহীদের মধ্যে কোনো পারস্পরিক সমন্বয় ছিলনা। অতি স্বল্প অস্ত্রধারী এই বিদ্রোহীদের দ্বারা ব্রিটিশ সৈন্য ও পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সম্ভব হয়নি। এই প্রতিরোধ ছিল অসম। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ চরম দমননীতি দ্বারা আন্দোলনকারীদের দমন করে। ২ হাজারেরও বেশি আন্দোলনকারী প্রাণ হারায় এবং প্রায় ৬০ হাজার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই 'আগস্ট আন্দোলন' ব্যর্থ হলেও এই আন্দোলনের তীব্রতা ও ব্যাপকতা ব্রিটিশদের ভীত করেছিল, অপরদিকে ভারতবাসী সশস্ত্র সংগ্রামের গুরুত্ব অনুধাবন করেছিল।

এরই মধ্যে ১৯৪৩ এর ২৮ শে মার্চ ফজলুল হকের মন্ত্রীসভার শেষ হয় এবং ২৪শে এপ্রিল নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এই সময় দেশে চরম অরাজকতা দেখা দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, অজন্মা, মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগনায় বন্যা, অক্টোবরে উপকূল অঞ্চলে বন্যা ও সর্বোপরি ব্রিটিশ প্রশাসনের দুর্বল বন্টনব্যবস্থা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ব্রিটিশ সরকারের চরম ঔদাসীন্যের ফলে ১৯৪৩-৪৪ সালে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার কোন কোন অঞ্চলে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় । যুদ্ধের কারণে বাংলাদেশে প্রচুর সৈন্যের আগমন ও ব্রহ্মদেশে থেকে আগত নিঃস্ব-কপর্দকশূন্য ভারতীয়দের আগমনের ফলে অবস্থা আরও জটিল হয়ে পড়ে।ব্রহ্মদেশে জাপানিদের আক্রমণের ফলে সে দেশ থেকে চালের আমদানি বন্ধ হয়ে যায় উপরন্তু সে দেশ থেকে আসে প্রচুর শরণার্থী। অপর দিকে ব্রিটিশ সরকার সৈন্যদের জন্য আতিরিক্ত খাদ্য শস্য মজুত করে এবং যুদ্ধের পরিস্থিতিতে রেলপথে সামরিক প্রয়োজনের বস্তু ব্যতীত অন্যান্য সামগ্রী আনয়ন বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে একদিকে শস্য ঘাটতি হয়, অপর দিকে অন্য অঞ্চল থেকে শস্য আমদানি করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু অজন্মা সত্ত্বেও এই অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে খাদ্যশস্য রপ্তানি অব্যাহত থাকে। এই সময় বড় বড় ব্যবসায়ীরা অধিক মুনাফার লোভে বিভিন্ন স্থান থেকে চাল সংগ্রহ ক'রে এই সংকটকে আরও ঘনীভূত করে তুলেছিল। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম আকাশ ছোঁয়া হয় এবং তারপর মূল্য প্রদান করেও দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এই মনুষ্য নির্মিত দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতিতে সমগ্র বাংলাদেশের অবস্থা ভয়ানক হয়ে দাঁড়ায়। গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক বাঙালি পরিবারগুলিতে ভাঙন দেখা দেয়, একমুঠো অন্নের আশায় সকলে শহরমুখী হয় আর শহরে দেখা দেয় বীভৎস ক্ষুধার জগৎ – মৃত্যুমিছিল। এই অরাজক পরিস্থিতির কালে নরেন্দ্রনাথ বাস করতেন কলকাতার ৩,এফ. নিবেদিতা লেনে। এখান থেকেই স্ত্রী শোভনা দেবীকে ২১শে মার্চ, ১৯৪৩ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে তিনি লেখেন – "অন্নবস্ত্রের অস্বাভাবিক দুর্মূল্যতায় দেশে হাহাকার উঠল অবস্থা ক্রমেই আরও বেশি খারাপ হচ্ছে। এক বিরাট দুর্বোধ্য নাট্যের সামনে আমরা শুধু বিমূঢ় দর্শক মাত্র।

তবু কী দেখছি তাও ভালো করে বুঝবার চেষ্টা করা দরকার।"[৯]

১৩৫০ সালের এই মন্বন্তরের সময় একস্থান থেকে অন্যস্থানে চাল রপ্তানির কাজ করেছিল গ্রাম-গ্রামান্তরের মহিলারা। পুলিশের চোখ এড়িয়ে তারা শহরের বাড়িতে বাড়িতে চাল পৌঁছে কিছু মুনাফা করত। 'ব্লাকমার্কেটিং' – এর এই চিত্র ফুটে উঠেছে নরেন্দ্রনাথের 'রসাভাস' গল্পে। যেখানে পদ্মমনি, কুমুদিনী, প্রভৃতিরা এই চাল ব্যবসায়ের অবৈধ কারাবারের সঙ্গে যুক্ত। গল্প থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে— "গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে তাদের মতই গেরস্থ ঘরের বউ-ঝিদের কাছ থেকে সস্তায় ভাল চাল কিনে শহরের বউ-ঝিদের কাছে গিয়ে বিক্রি করে আসতে হয়। কোন কোন সময় দ্বিগুন তিনগুণ লাভ থাকে। যাতায়াতে রেলভাড়া লাগে আনা ছয়েক, সতর্কভাবে মা কালীগঙ্গার নাম নিয়ে গেটটা পার হতে পারলেই হয়। ব্যস, তারপর আর ভয় নেই। কেবল মাঝে মাঝে এই গোয়েন্দাদের উৎপাত সহ্য করতে হয়। কাউকে কাউকে সিকিটা দু'আনিটা ফেলে দিলেই চলে। কারো বা লোভ আরো বেশি। তাদের হাতে ধরা পড়লে একেক দিন তিন দিনের লাভ পর্যন্ত রেখে যেতে হয়।"[১০] এইভাবে দেখা যায় ১৩৫১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত এই 'রসাভাস' গল্পে লেখক তার সমকাল চেতনাকে অনুপুঙ্খতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

১৩৫০ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষে ৫০ লক্ষেরও অধিক মানুষ প্রাণ হারায়। বাংলা ও পূর্ব ভারতের বিরাট অংশে দুর্ভিক্ষ মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল। মনুষ্যসৃষ্ট এই দুর্ভিক্ষের মতই আরেক ভয়াবহ ও কলঙ্কজনক ঘটনা ১৯৪৪ সালের বস্ত্র সংকট। মুনাফালোভী কালোবাজারীদের অসাধু চক্রান্তে বাংলাদেশে প্রবল বস্ত্র সংকট দেখা দিয়েছিল। খাদ্য সংকটের মতই প্রবল আকার ধারণ করেছিল এই বস্ত্র সংকট। ন্যূনতম লজ্জা নিবারণের জন্য প্রয়োজনীয় বস্ত্রেরও আকাল দেখা দিয়েছিল এই সময়। নগ্ন-বিবস্ত্র নরনারীর ক্রন্দনে সভ্যতার ইতিহাস কালিমালিপ্ত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের অদূরদর্শিতা ও সদিচ্ছার অভাবেই এই সংকট এমন তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। বাংলার রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবী মহল এই সংকট মোকাবিলায় জনসমাবেশ ও প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত করেছিলেন এবং ১০ই মার্চ তারিখকে 'বস্ত্রসংকট দিন' হিসাবে পালন করেছিলেন। সাহিত্যিক মহলও এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসন' প্রভৃতি ছোট গল্পের সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের 'আবরণ' গল্পেও আমরা এই বস্ত্র সংকট কালের চিত্র পাই। ১৯৪৪ এ প্রকাশিত এই 'আবরণ' গল্পে প্রবল বস্ত্র সংকট ও বাজার থেকে কাপড় উধাও হয়ে যাবার বিষয়টি স্বল্পপরিসরে হলেও যথাযথভাবে বর্ণিত হয়েছে। গল্প থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে— "কাঠ ফাটা রোদে মাইল আড়াই রাস্তা পাড়ি দিয়ে বংশী গুপিগঞ্জে এসে পৌঁছল। গত হাটবারেও শহরের সব দোকানে বংশী একখানা কাপড়ের জন্য প্রায় মাথা কোটাকুটি করেছে। রাগ করে ভেবেছে আর আসব না, কিন্তু না এসে উপায় কি ! কাপড় আজ জোটাতেই হবে।"[১১]

১৯৪৪ থেকে ১৯৪৬ এই সময়কালে দেশের মধ্যে আভ্যন্তরীণ উত্তেজনার প্রবাহ বয়ে গিয়েছিল। দেশের সকল স্তরের মানুষই এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৯৪৫ সনের মধ্যবর্তী সময়ে ধর্মঘট আন্দোলনে পুনরায় প্রাণ সঞ্চার হয়েছিল। শ্রমিক শ্রেণির অর্থনৈতিক সংগ্রামে ছাত্র ও অন্যান্য স্তরের মানুষও স্বতস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছিল। ইতিহাসকার লেখেন – "১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে ধর্মঘট ও বিক্ষোভগুলি প্রায়ই সৈন্যবাহিনী ও পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষের রূপ লাভ করেছিল।"[১২] শ্রমিক শ্রেণির এই আন্দোলনের চিত্র, ধর্মঘটীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ছবি নরেন্দ্রনাথের 'ক্রৌঞ্চমিথুন' গল্পে শিল্পিত রূপ লাভ করেছে। ১৩৫২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত এই গল্পের নায়ক মন্মথের মৃত্যু হয়েছে কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দিয়ে – "রাত প্রায় দুপুরের সময় পাড়ার জন কয়েক ছাত্র আর মন্মথদের কারখানার কয়েকজন কারিগর মিলে নিয়ে এল মন্মথকে। পুলিশের গুলিতে তার মৃত্যু হয়েছে।"[১৩] গল্পটিতে শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামের সঙ্গে ছাত্রদের যোগাযোগের বিষয়টিও পরোক্ষে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া এই সকল আন্দোলনের স্বতস্ফূর্ত চরিত্রের পরিচয়টিও গল্পে পরিস্ফুট, যেখানে দেখা যায় মন্মথ নিছক কৌতূহলবশত যোগদান করলেও শেষ পর্যন্ত এই সংগ্রামের সঙ্গে সে একাত্ম হয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছে। গল্প থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে — "অসহায় ভীরুর মতো মরেনি মন্মথ। মরেছে পুরুষের মতো, বীরের মতো। মরবার আগে একটা সার্জেন্টকে ঘায়েল করে গেছে। প্রথমে মন্মথ খানিকটা কৌতূহল নিয়েই ঢুকেছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল দেখছিল ব্যাপারটা কি হচ্ছে। তারপর চোখের সামনে পুলিশের গুলিতে একজন তেরো চৌদ্দ বছরের ছেলে যখন রাস্তার উপর লুটিয়ে পড়ল মন্মথের মনে কৌতুকবোধ আর রইল না। জনতার সঙ্গে মিশে সেও ইঁটের পর ইঁট ছুড়তে লাগল পুলিশের ওপর। অদ্ভুত তার হাতের তাক, কব্জির এমন জোর সাধারণত দেখা যায় না।"[১৪]

শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থরক্ষার সংগ্রাম ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু ঘটনাও সে সময় দেশের অভ্যন্তরে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। এই ঘটনাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হল ১৯৪৫ এর নভেম্বরে দিল্লীতে সুভাষচন্দ্রের 'আজাদ হিন্দ ফৌজে'র অফিসারদের বিচার। সুভাষ চন্দ্র বসু সারা বাংলা তথা ভারতবর্ষে অসাধারণ জনপ্রিয় ছিলেন। ফলে ব্রিটিশ সামরিক ট্রাইবুনালের দ্বারা আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাধ্যক্ষ শাহ্ নওয়াজ খান এবং আরও দুজন আফিসারের দীর্ঘ কারাদণ্ডের ঘোষণায় সারা দেশে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। এই বিচার চলাকালীনই দেশের লোক আজাদ হিন্দ বাহিনীর বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও সাহসিকতা সম্বন্ধে জানতে পারে ও সচেতন হয়। ফলে আজাদ হিন্দ বাহিনীর আফিসারদের কারাদণ্ডের সংবাদে দেশজুড়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভের জোয়ার নামে। বিশেষ ক'রে কলকাতায় প্রতিবাদ আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। কলকাতায় বিক্ষোভ আন্দোলন গণ আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল এবং এই বিক্ষোভ আন্দোলনে শ্রমিক, ছাত্র, ব্যবসায়ী, অফিস কর্মচারী সকলেই স্বতস্ফূর্ত ভাবে যোগদান

করেছিল। পরিবহণ ও পুরকর্মচারীরা ধর্মঘটে সামিল হওয়ায় শহরের জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হয়েছিল। ২২শে নভেম্বর থেকে ২৫ শে নভেম্বরের মধ্যে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর হাতে বহু বিক্ষোভকারী নিহত ও আহত হয়েছিলেন।

১৯৪৬ এর বিক্ষোভ বিদ্রোহের আরেকটি বড় ঘটনা হল নৌবিদ্রোহ। নাবিকদের বিভিন্ন অসন্তোষকে কেন্দ্র করে এই বিদ্রোহের সূচনা হলেও ক্রমে তা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের রূপ নেয় ।

এইভাবে একের পর এক বিদ্রোহ, বিক্ষোভ, গণ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ এগিয়ে চলেছিল স্বাধীন হবার পথে । ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল দেশবিভাগের মত দুঃখজনক ঘটনার মধ্যদিয়ে। এই দেশবিভাগ ও তজ্জনিত প্রতিক্রিয়া, উদ্বাস্তু সমস্যা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি সমগ্র চল্লিশের দশককে উত্তপ্ত করে রেখেছিল। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রথম দিকের গল্পে সবচেয়ে বেশি উঠে এসেছে এই দেশবিভাগের চিত্র, দেশবিভাগের ফলে উদ্বাস্তু মানুষদের কঠোর জীবনসংগ্রামের চিত্র আর দেশ বিভাগের পরেও স্বদেশেই থেকে যাওয়া মানুষের কাহিনি। এর সঙ্গেই ফুটে উঠেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ছবিও। 'হেডমাস্টার', 'পালঙ্ক' প্রভৃতি ছোটগল্পগুলি দেশবিভাগের জীবন্ত চিত্ররূপের সাক্ষ্য হিসেবে বর্তমান। দেশভাগের রাজনৈতিক ও সামাজিক আলেখ্য তাই নরেন্দ্রনাথের দেশকালকে চিনে নেবার আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। দেশভাগ তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, নিজে একজন উদ্বাস্তু হবার ফলে তিনি এই দেশভাগজনিত বেদনাকে অন্তরের সঙ্গে অনুভব করেছিলেন। তিনি এই অধ্যায়ে বর্ণিত উত্তাল সময়কে খুব কাছের থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন কারণ তখন তিনি এই আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল কলকাতায় অবস্থান করেছেন। এই সময় তিনি নিজেও খুব সুখে নেই, কারণ তখন তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টায় রত। আর্থিক স্বচ্ছলতা আহরণের জন্য কখনও চাকুরি খুঁজছেন, কখনও ছাত্র পড়াচ্ছেন আর একই সঙ্গে নিরন্তর গল্প কবিতা লিখে যাচ্ছেন যার কিছু কিছু বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিতও হচ্ছে। এই সময়ে তাঁর লেখা দুটি চিঠিতে তাঁর এই সময়ের জীবন সংগ্রাম ও দেশের অবস্থা এই দুয়েরই কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০ তারিখে নিবেদিতা লেন থেকে স্ত্রী শোভনা দেবীকে একটি চিঠিতে তিনি লেখেন— "ভাঙ্গা থেকে পুলিশ রিপোর্ট খারাপ দিয়েছে। চাকরি আর রাখা গেল না। ওদের সিদ্ধান্ত ঠিক হয়ে গেছে। এখন যে- কোনওদিন নোটিশ দিয়ে দিলেই হয়। অন্য খোঁজখবর করছি। চাকরি একটা জুটবে,যখনই হোক। তবে মাঝখানে আবার হয় তো কিছুদিন চলবে সেই বেকার জীবন। কলকাতার রৌদ্রতপ্ত পদপথ, ক্ষয়িষ্ণু শুকতলা আর সস্তা রেস্টুরেন্টের হাফ কাপ চা।"[১৫] অতএব দেখা যাচ্ছে ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও নরেন্দ্রনাথের জীবন সংগ্রাম অন্তত চল্লিশের দশকে পাশাপাশিই চলে ছিল। এই সময়ের উত্তাল অবস্থা, বিক্ষোভ,আন্দোলন ,ধর্মঘট— অন্যান্য সকলের মত কাল-সচেতন তাকেও স্পর্শ ও প্রভাবিত করেছিল। তার ব্যক্তিগত পত্রে এই সময়ের স্পর্শ বর্তমান — "... শুনেছ

বোধহয়, কলকাতায় ট্রাম শ্রমিকদের ধর্মঘট চলছে। অফিসে হেঁটেই যাতায়াত করতে হয়।... ভিড়ের জন্য বাসে ওঠা যায়না।... আজ থেকে বাস ধর্মঘটও শুরু হলো।"[১৬]

নরেন্দ্রনাথের নিজের মন মানসিকতা ছিল রোম্যান্টিক কিন্তু তৎকালীন দেশের উত্তেজক অবস্থা তাকে ভীষণভাবেই প্রভাবিত করেছিল। তিনি মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেননি এই সংকটজনক অবস্থা থেকে। দেশের অবস্থা তাঁকেও ভাবিত করে তুলেছিল আর বিচ্যুত করেছিল তাঁর নিজের মানসিক জগত থেকে। স্ত্রীকে লেখা পত্রে তাঁর উদ্বেগ সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে— ".... ফুল আর ছন্দ থেকে মনটা স্বভাবতই বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে। নোয়াখালীর কথা খবরের কাগজে পাচ্ছ। আজ গুজব শুনলাম মাদারীপুর অঞ্চলেও দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে। অবশ্য কিছুটা খোঁজখবর নেওয়ার পর খবরটা মিথ্যা গুজবই মনে হচ্ছে। সত্য হওয়াও বিচিত্র নয়। দেশব্যাপী এই মূঢ়তার কথা স্মরণ ক'রে মন অত্যন্ত ব্যাকুল এবং উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছে।" (কলকাতা, ৪ কার্ত্তিক ১৩৫৩, সন্ধ্যা সাতটা)

এই দাঙ্গার চিত্র ঠিক প্রত্যক্ষভাবে না হলেও অনেকটা বাস্তবতাতেই ' পতাকা' গল্পে ব্যবহৃত হয়েছে। 'পতাকা' গল্পে প্রবীণ কংগ্রেসকর্মী শচীবিলাস যখন স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের দিন গ্রামের মুসলমান জনগনের কাছ থেকে জাতীয় পতাকা উত্তোলনে বাধা পেয়েছেন তখন সেই সাম্প্রদায়িক বিষ-বাষ্পময় পরিবেশে শচীবিলাসের কলকাতা আর নোয়াখালির দাঙ্গার কথা মনে হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পূর্বের সেই স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের দিনে শচীবিলাসের আত্মভাষণে উঠে এসেছে সেই সময়কার চিত্র— "কলকাতা আর নোয়াখালির দাঙ্গার সময় গ্রামের হিন্দু মুসলমানদের চাঞ্চল্য তিনি লক্ষ্য করেছেন। মুসলমান যুবকেরা হিন্দুদের লক্ষ্য করে নানা রকম বক্রোক্তি করেছে। আস্ফালন করেছে আড়ালে আবডালে। হিন্দুরা সংখ্যালঘু হওয়ায় মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়েছে, গোপনে গোপনে আত্মরক্ষার জন্য তৈরি হতে চেষ্টা করেছে। আর যাঁরা সম্পন্ন ধনী গৃহস্থ তাঁরা দালানে তালাচাবি দিয়ে গৃহলক্ষ্মী আর লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিয়ে নেপালী দারোয়ান পাহারায় রেখে সাময়িক ভাবে দেশ ত্যাগ করেছেন। এমন অনেক মুহূর্ত এসেছে যখন শচীবিলাসের মনে হয়েছে দাঙ্গার সংক্রামক মহামারী থেকে এ গাঁকেও রক্ষা করা গেল না। হিন্দু মুসলমানের মারাত্মক হানাহানি এখানেও বেঁধে উঠল বলে। কিন্তু তিনি আর ইন্দিরা রাত দিন সর্তক রয়েছেন। একবার গেছেন হিন্দুদের পাড়ায় আর একবার ঘুরেছেন মুসলমানদের বাড়িতে বাড়িতে। এক হাতে থামিয়েছেন ভীত পলায়নপর হিন্দুদের আর এক হাতে উত্তেজিত মুসলমান সম্প্রদায়ের হাত ধরেছেন। যে জন্যই হোক দাঙ্গা শেষ পর্যন্ত এ অঞ্চলে লাগেনি। মারাত্মক সময়টা নির্বিঘ্নে অতিক্রান্ত হয়েছে। যারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে ছিল তারা ফের ফিরে আসতে শুরু করেছে। কৌতুকে কৌতূহলে ক্ষোভে আর আক্রোশে যে সব মুসলমান যুবক চঞ্চল হয়ে উঠেছিল তারা ফের শান্ত হয়ে গৃহস্থালিতে মন দিয়েছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা দিবসকে উপলক্ষ্য করে আবার হঠাৎ একি বিভ্রাট এলো। সংঘাতের আবার এ কোন সূচনা দেখা দিল

আজ।"[১৭]

অতএব দেখা যায় এই অধ্যায়ে ইতিহাসের বিস্তৃত আলোচনা একটি বিষয়কে অত্যন্ত সুস্পষ্ট রূপে সপ্রমান করে যে, নরেন্দ্রনাথ এক উত্তাল আন্দোলনের কালে জন্মগ্রণন করেন এবং নিজের বাল্য, কৈশোর ও প্রাক্ যৌবনকাল অতিবাহিত করেন। পরশুরামের গল্পসমগ্রের ভূমিকায় শ্রী প্রমথনাথ বিশী লেখেন— "লেখকের শৈশব বা বড়জোর বাল্যকালের কয়েকবছর তাকে গঠন করে তোলে।"[১৮] এই অধ্যায়ের ইতিহাস পর্যালোচনা থেকে আমরা সহজেই কল্পনা করতে পারি যে নরেন্দ্রনাথের বাল্য ও শৈশবের কালে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিটি কেমন ছিল। ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা শহরের নিকটবর্তী সদরদি গ্রামে সেই রাজনৈতিক আন্দোলনের ঢেউ কতটা প্রভাব ফেলেছিল সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থাকলেও কিছুটা বড় হবার পর বিশেষত শহর কলকাতার অধিবাসী হবার পর নরেন্দ্রনাথের মননে যে এই রাজনৈতিক আন্দোলন তার প্রত্যক্ষতার কারণেই বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় তাঁর রচিত পত্রসমূহ ও ছোটগল্পগুলি থেকেই। সমালোচক বলেন— "নরেন্দ্রনাথের গল্প সাহিত্যের বিশ্লেষণে মনে হয় যে প্রখর কালসচেতন গল্পকার হওয়া সত্ত্বেও সমকাল চেতনা নরেন্দ্রনাথের ছোটগল্পের প্রধান লক্ষণ নয়।"[১৯]

একথা হয়ত সর্বাংশে মিথ্যে নয় কারণ 'পতাকা', 'শোক', 'বিষাদযোগ', প্রভৃতি কয়েকটি হাতে গোনা গল্প ছাড়া রাজনৈতিক ঘটনা বা সংঘাতের গল্প তাঁর সুবিশাল ছোটগল্পের ভাণ্ডারে স্থান লাভ করেনি। এক বিক্ষুব্ধ সময়ে অবস্থান করে তিনি তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'মূক' – এ বিষয় হিসেবে চয়ন করেছেন রোম্যান্টিক মনের মাধুরীকে। প্রেমাস্পদের সামনে দাঁড়িয়ে এক বাক্যহারা প্রেমিকের হৃদয়ানুভূতিকে প্রকাশ করেছেন কবিতায়। এ থেকে তাঁর হৃদয়ের অন্তর্লীন রোম্যান্টিক মানসিকতার পরিচয়ই পরিস্ফুট। কিন্তু সমকাল তাঁর কবিতার মূল বা একমাত্র বিষয় না হয়ে উঠলেও সমকালচেতনার পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাঁর ছোটগল্পের ছত্রে ছত্রে। অনেকক্ষেত্রেই তা সোচ্চার নয় কিন্তু মনোযোগী পাঠকের তা দৃষ্টি এড়ায় না। দেশভাগ এই কারণে তাঁর অনেক গল্পের পটভূমিকে রচনা করেছে, গল্পের চরিত্রদের প্রভাবিত করেছে। 'হেডমাস্টার', 'কাঠগোলাপ', 'দ্বিচারিণী' প্রভৃতি গল্পের কথা এখানে এ কারণে বিশেষ উল্লেখ্য। আবার আরও গভীরতর উপলব্ধিতে 'চোর' গল্পটির কথাও এখানে উল্লেখ করা যায়। যেখানে গল্পের বিষয় বা মূল ঘটনাধারায় সমকাল হয়তো ছায়াপাত করেছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় না কিন্তু গল্পের মূল চরিত্র অমূল্য যে এই সময়ের ফসল তা মরমী পাঠকের উপলব্ধিতে ধরা পড়ে। এমনকি তার যোগ্য সহধর্মিনী হয়ে উঠবার পথে তার পত্নী রেণুর যে পরিবর্তন তাও এক অবক্ষয়িত সময়ের অবশ্যম্ভাবী ফল। তাই আলোচক লেখেন— "অমূল্য তার সময়ের শিকার। সে সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ – সমকালীন অবক্ষয়িত পরিবার ও সমাজের, বুর্জোয়া অর্থনীতি ব্যবস্থার পঙ্গু পরিবেশে চিহ্নিত।

... স্পষ্টত রেণু যুদ্ধ–সমকালের ক্রমিক অবক্ষয়ে আক্রান্ত হওয়ার উপযোগী এক সাংসারিক বধূ শ্রেণীর চরিত্র।"[২০] প্রকৃতপক্ষে নরেন্দ্রনাথের গল্পের প্রধানতম শর্তই হল সমাজ–বাস্তবতা। কিন্তু যেহেতু সেই বাস্তবতা মানবিকতার রসে জারিত তাই তাঁর গল্পের সমকালচেতনা আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। কিন্তু তিনি যে তাঁর সমকাল সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন, তা তাঁর ছোটগল্পে কীভাবে সময়কে তুলে এনেছেন, সময়ের সমস্যা ও তদ্‌জনিত প্রতিক্রিয়াকে রূপদান করেছেন তা বিশ্লেষণ করলেই সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যায়। এই কারণেই সমালোচক বলেন, — "বিশ শতকের চল্লিশের দশক ধরে নরেন্দ্রনাথ মিত্র যতগুলি গল্প লিখেছেন, দেশকালের দাবিকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। তাঁর গল্পকার – ব্যক্তিত্ব এমন সময়ের কালো ছায়া নিয়েই ছোটগল্পগুলিতে ধরা পড়ে।"[২১]

উল্লেখপঞ্জি

১. বুদ্ধদেব বসু ঃ 'অতি আধুনিক বাঙলা সাহিত্য', 'কল্লোল' চৈত্র ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ। 'প্রগতি' মাসিকপত্র থেকে 'কল্লোল' পত্রিকায় সংগ্রহকৃত।

২. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী ঃ 'দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ২০০০, পৃষ্ঠা-১৬

৩. 'রিজলির পত্র' — 'The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908', Sumit Sarkar, People's Publishing House, March 1977, Page-17,18.

৪. সূত্র— রামেশ্বর শ ঃ 'আধুনিক বাংলা উপন্যাস' (১ম খণ্ড), পৃষ্ঠা-৬০

৫. ভাস্বতী চক্রবর্তী (লাহিড়ী) ঃ 'সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষপেটে বাংলা ছোটগল্প (১৯৪০-৫০),' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-১৮

৬. গিগ্রোরি কতোভ্স্কি ঃ 'সাম্প্রতিক ইতিহাস', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', কোকা আন্তোনভা, গ্রিগোরি বোন্গার্দ-লেভিন, গ্রিগোরি কতোভ্স্কি, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯৮৬, অনুবাদক-দ্বিজেন শর্মা, পৃষ্ঠা-৬০৪.

৭. 'প্রণয় পত্রাবলী', শারদীয়া, দেশ ১৪০৩, পৃষ্ঠা-৪৩১.

৮. 'প্রণয় পত্রাবলী', শারদীয়া, দেশ ১৪০৩, পৃষ্ঠা-৪৩১.

৯. 'প্রণয় পত্রাবলী', শারদীয়া, দেশ ১৪০৩, পৃষ্ঠা-৪৩২.

১০. 'রসাভাস'- 'গল্পমালা-৪' আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৫৬.

১১. 'আবরণ'- 'গল্পমালা-৩' আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ, পৃষ্ঠা-৩২.

১২. গ্রিগোরি কতোভ্স্কি ঃ 'সাম্প্রতিক ইতিহাস', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', কোকা আন্তোনর্ভা, গ্রিগোরি বোন্গার্দ- লেভিন, গ্রিগোরি কতোভ্স্কি, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯৮৬, অনুবাদক-দ্বিজেন শর্মা, পৃষ্ঠা-৬০৪.

১৩. 'ক্রৌঞ্চমিথুন', গল্পমালা-৫, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-১৭.

১৪. তদেব , পৃষ্ঠা-১৭.

১৫. 'প্রণয় পত্রাবলী', শারদীয়া দেশ, ১৪০৩, পৃষ্ঠা-৪৩৩.

NBU. DARJEELING LIBRARY

220129

26 JUL 2010

১৬. 'প্রণয় পত্রাবলী', শারদীয়া দেশ, ১৪০৩, পৃষ্ঠা-৪৩৪.

১৭. 'পতাকা'- 'গল্পমালা-৩', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৪৪-৪৫.

১৮. প্রমথ নাথ বিশী ঃ ভূমিকা-'পরশুরামের গল্পসমগ্র', এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, ১৯৯২, পৃষ্ঠা-১১

১৯. মঞ্জুরী চৌধুরী ঃ 'ছোটগল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্র', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৫৬.

২০. বীরেন্দ্র দত্ত ঃ'বাংলা ছোটগল্পঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ' (দ্বিতীয় খণ্ড), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ, জুলাই, ২০০৪, পৃষ্ঠা - ১৫৬.

২১. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫৯.

।। দ্বিতীয় অধ্যায় ।।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সংক্ষিপ্ত জীবনভাষ্য

লেখকের মনোধর্মের ছাপ পড়ে তাঁর রচনায় আর তাঁর মনোধর্ম গঠিত হয় তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে। জন্মভূমি থেকে জন্মকাল, বিচরণভূমি ও বিচরণকাল, কর্মভূমি ও কর্মকাল, এ সকলই গঠন করে তাঁর মানসধর্মকে। এই কারণেই এই অধ্যায়ে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ব্যক্তি জীবনে আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে নরেন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত ব্যক্তি জীবন বর্ণনার উদ্দেশ্য মানুষটির কিছু ব্যক্তিগত পরিচয় নেওয়া তো বটেই, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য সেই সকল ঘটনার উল্লেখ করা যা তাঁর জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, অর্থাৎ সেই সকল ঘটনা কীভাবে নরেন্দ্রনাথের মতো ছোটগল্পকারের জীবনচেতনাটি গড়ে তুলেছিল তার খোঁজ করা। জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই লেখক গল্প রচনা করেন কিন্তু তাতে থাকে কল্পনার আস্তরণ, চোখে দেখা চরিত্রের উপরে আপন মনের মাধুরীর প্রলেপে তৈরি হয় গল্পের ভুবন। সুতরাং মূলের সেই চোখে দেখা জিনিসটি কী ভাবে সাহিত্যের বিশ্ব নির্মাণে ক্রিয়াশীল তা অনুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষাই প্রেরিত করে লেখকের ব্যক্তিজীবনের বর্ণনায়। 'কবিরে পাবেনা তার জীবনচরিতে' - এ কথা সত্য কিন্তু সমগ্র কবিসত্তায় ব্যক্তিজীবন ও তার অভিজ্ঞতার মূল্যকেও তো কোন ভাবে অস্বীকার করা যায় না। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বহু গল্পের বিষয় সৃষ্টি কিংবা রূপ নির্মাণে প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়াশীল তাঁর ব্যক্তি জীবনের বহু ঘটনা ও অভিজ্ঞতা। যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি সামরিক অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে সৈনিকদের সরবরাহের জিনিসপত্র পরীক্ষার কাজ পেয়েছিলেন। সেই 'বালতি টেপা'র ঘটনাই প্রত্যক্ষভাবে উঠে এসেছে তার 'নেতা' গল্পে। এ ছাড়াও বহু গল্পে তাঁর ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ ছায়াপাত ঘটেছে। এমনকি তাঁর উপন্যাসের ক্ষেত্রেও একথা সমান ভাবে সত্য। 'দ্বীপপুঞ্জ' বা 'দেহমন' উপন্যাসের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। তাই নরেন্দ্রনাথের জীবনকাহিনির অনুপুঙ্খতা নয়, গভীরতার সন্ধানেই তৎপর তাঁর জীবনকথা বর্ণনা।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জন্ম ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০ শে জানুয়ারি, বাংলা ১৬ ই মাঘ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ। জন্মস্থান পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলায়। ফরিদপুর শহর থেকে বাইশ মাইল দক্ষিণে সদরদি গ্রাম। এই সদরদি গ্রাম নরেন্দ্রনাথের জন্মস্থান। সদরদি গ্রামের কাছাকাছি শহর ভাঙ্গা। মহকুমা শহর না হলেও জমজমাট ভাঙ্গা শহরে হাটবাজার, হাইস্কুল এবং মুনসেফি আদালত ছিল। এই মুনসেফি আদালতেই নরেন্দ্রনাথের বাবা মহেন্দ্রনাথ মিত্র এবং কাকা, যাকে নরেন্দ্রনাথ মণিকাকা বলতেন, এই দু'জন দুই উকিলের সেরেস্তায় মুহুরীর কাজ করতেন। নরেন্দ্রনাথ ছোটভাই ধীরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'আমাদের কথা' রচনা থেকে তাদের সদরদি বাড়ির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লেখেন —

"অনেকটা জায়গা নিয়ে বাড়ি। চারপোতায় চারখানা বড়ো টিনের ঘর। ভিতর বাড়ি, বার বাড়ির বড়ো বড়ো দুটো উঠোন। বাড়ির পিছনে একটা বাঁশঝাড়। পূর্ব দিকে পুকুর। পুকুরের চারপাশে ঘিরে কয়েকটা খেজুর গাছ ছিল। বাড়ি থেকে খানিকটা হেঁটে গেলেই কুমার নদী। বর্ষার সময় কুমারের জল খাল বেয়ে বাড়ির কাছে চ'লে আসত। তখন নৌকা ছাড়া যাতায়াতের কোন উপায় থাকত না।'[১]

এই জন্মস্থান নরেন্দ্রনাথের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কুমার নদীর সৌন্দর্য, কুমার নদীর নামের শ্রুতিমাধুর্য, পূর্ববাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা সহজ সরল মানুষের সরল জীবনযাত্রা ও জটিল জীবন সংগ্রামকে তিনি সহজ সাবলীলতায় প্রকাশ করেছেন। এই জন্মভূমি ও জন্মস্থানের প্রভাব নরেন্দ্রনাথের উপর ক্রিয়াশীল ছিল এবং তার সর্বাধিক পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাঁর প্রথম দিকের ছোটগল্পগুলিতে, যেখানে গল্পের পরিবেশ ও প্রতিবেশ রচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে পূর্ববঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের পল্লীপ্রকৃতি। এই বক্তব্যের সমর্থনে 'চাঁদমিঞা' (১৩৫৩), 'রস' (১৩৫৪), 'পালঙ্ক' (১৩৫৯) প্রভৃতি ছোটগল্পের নাম উল্লেখ করা যায়।

নরেন্দ্রনাথের নিজস্ব স্মৃতিচারণাতেও জন্মস্থান সদরদি গ্রামের চিত্র ফুটে উঠেছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অনুপুঙ্খতায়—

"..... পশ্চিম দিকে একটি ছোট নদী কুমার। ..... পশ্চিমে নদী আর পূর্বে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। সেই মাঠের ধার ঘেঁষে চাষী গৃহস্থদের বাড়ি। বাড়ির পরেই শস্য ক্ষেত। ধান পাটের সবুজ সমুদ্র। বর্ষায় এই মাঠও তলিয়ে যেত। প্রান্তর হয়ে যেত সায়র।"[২]

জন্মস্থানের এই পল্লীপ্রকৃতি নরেন্দ্রনাথের রচিত ছোটগল্পের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কিছু উপন্যাসেরও প্রতিবেশকে গঠন করেছে। তাঁর 'দ্বীপপুঞ্জ' উপন্যাসটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে। তবে এর পূর্বে এটি দেশ পত্রিকার পাতায় কার্তিক, ১৩৪৯ থেকে ফাল্গুন ১৩৪৯ এর মধ্যে 'হরিবংশ' নামে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপন্যাসের পটভূমি সম্পর্কে তিনি বলেন—

"হরিবংশে আমাদের সদরদি গ্রামের অনেকেই এসে ভিড় করেছিল। আমাদের মধ্যপাড়ার উত্তরে ছিল সাহাপাড়া। ..... আমাদের গ্রামের সাহা সম্প্রাদায়ের অনেকেরই দোকানপাট ছিল সেই ভাঙ্গা শহরে। কেউ বড় দোকানের মালিক, কারো দোকান ছোট ছোট। কারো বা দোকানঘর আছে, গুদাম ঘর আছে, কেউ বা বাজারের মধ্যেই চট বিছিয়ে বসে যায়। .... সেই সাহা পাড়ার অনেকেই এসে ভিড় করেছিলেন আমার প্রথম উপন্যাসে।"[৩]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় 'দ্বীপপুঞ্জে'র অন্যতম প্রধান চরিত্র সুবল সাহা, গঞ্জের মাটিতে চট বিছিয়ে হলুদ, শুকনো লঙ্কা বিক্রি করে। আবার গ্রামের মোড়লস্থানীয় নবদ্বীপ সাহা কুমারগঞ্জের বড় ব্যবসাদার। তামাকের বড় গুদাম আছে তার। তবে বাস্তবের ভাঙ্গা শহরের নাম উপন্যাসে হয়েছে কুমারগঞ্জ।

এই নামকরণেও সম্ভবত প্রভাব পড়েছে কুমার নদীর। নরেন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত কুমার নদীর তীরবর্তী বলেই হয়ত শহরের নাম কুমারগঞ্জ।

জন্মের কিছুকালের মধ্যেই নরেন্দ্রনাথের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। তাঁর মা বিরাজবালা নরেন্দ্রনাথের শিশু বয়সেই মারা যান এবং তিনি ও তাঁর ভাই ধীরেন্দ্রনাথ তাঁর 'বড়-মা'র কাছে পালিত হন। এই 'বড়-মা' হলেন জগৎমোহিনী দেবী। জগৎমোহিনী দেবী নরেন্দ্রনাথের পিতা মহেন্দ্রনাথের প্রথম পত্নী। তিনি পরপর ছয়টি কন্যা সন্তানের জন্মদান করেন। কিন্তু তারা কেউই এক-দেড় বছরের বেশি বেঁচে থাকেনি। এই কারণে মহেন্দ্রনাথকে দ্বিতীয়বার বিবাহ দেওয়া হয় বিরাজবালার সঙ্গে। এই বিষয়ে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের পুত্র অভিজিৎ মিত্রের লেখা 'বিরাজবালার উত্তরাধিকার' থেকে জানা যায়—

"আমার বাবার দুই মা। আমারা যে ঠাকুমাকে দেখেছি অর্থাৎ জগৎমোহিনী, তিনি ঠাকুরদার প্রথমা স্ত্রী। দুর্ভাগ্যবশত তিনি মৃতবৎসা হওয়ায় ঠাকুরদার ঠাকুরদা অর্থাৎ শ্রীনাথ মিত্র এবং ঠাকুরদার পিসি ঠাকুরদাকে দ্বিতীয় বিবাহ দেওয়ার জন্য আগ্রহী হন।"[৪]

শ্রীরামপুরে কাজের সূত্রে গেলে যে বাড়িতে মহেন্দ্রনাথ আতিথেয়তা গ্রহণ করতেন, সেই বাড়ির মালিকের ভাগনী ছিলেন বিরাজবালা। নরেন্দ্রনাথ ও ধীরেন্দ্রনাথ এই বিরাজবালার গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন। বিরাজবালা যখন অকালে মারা যান তখন নরেন্দ্রনাথ ও ধীরেন্দ্রনাথ খুবই ছোট ফলে তাদের মানুষ করবার ভার পরে জগৎমোহিনীর উপর এবং তিনিই তাদের মানুষ করেন। ধীরেন্দ্রনাথের রচনা অনুযায়ী বিরাজবালার মৃত্যুর সময় নরেন্দ্রনাথের বয়স চার বছর। 'আমাদের কথা' রচনায় ধীরেন্দ্রনাথ লেখেন—

"আমাদের আপন মা যখন মারা যান তখন আমরা খুব ছোট, দাদার তখন চার বছর বয়স। মার কথা দাদার কিছু কিছু মনে পড়ত, আমার কিছুই মনে নেই। আমরা বড়োমার কাছে মানুষ হয়েছি।"[৫]

অবশ্য নরেন্দ্রনাথের পুত্র অভিজিৎ মিত্র লেখেন— "বাবার দুবছর বয়সে বিরাজের মৃত্যু হয়।"[৬] নরেন্দ্রনাথের জন্মের পর বিরাজবালার একটি কন্যা ও একটি পুত্র সন্তান জন্মায় তারপর তিনি মারা যান। সেই হিসেবে বিরাজবালার মৃত্যুকালে নরেন্দ্রনাথের বয়স দুই বৎসর অপেক্ষা ধীরেন্দ্রনাথ কথিত চার বৎসর হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক।

বিরাজবালা নরেন্দ্রনাথ ও ধীরেন্দ্রনাথের গর্ভধারিণী হলেও সংসারে জগৎমোহিনী ও বিরাজবালার অধিকার সমান ছিল না। জগৎমোহিনীর পক্ষে তা ছিল 'বার আনা - চার আনি' ভাগ। "কিন্তু বিরাজ তা নিয়ে ঝগড়া বিবাদ তো দূরের কথা কোনদিন কোনো কথা বলেননি।"[৭] জগৎমোহিনীর কোলে বিরাজবালার মৃত্যু ঘটে। তাদের বাড়িতে বিরাজবালার কোনো চিহ্ন বা ছবি কিছুই ছিল না। নরেন্দ্রনাথ ও ধীরেন্দ্রনাথ বাল্যকালে জগৎমোহিনীকেই মা বলে জানতেন।

নরেন্দ্রনাথের জীবনে তাঁর বাবার প্রভাব অত্যন্ত অধিক পরিমাণে পড়েছিল। তাঁর পিতা দীর্ঘকায় স্বাস্থ্যবান পুরুষ মহেন্দ্রনাথ কেবল বিষয়ী ছিলেন তাই নয়, অন্যান্য অনেক বিষয়ে তিনি দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। অতি অল্পবয়সেই তিনি বৃহৎ সংসারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন। এই দায়িত্ব গ্রহণের জন্যই তার পড়াশুনো বেশি দূর এগোয়নি, তিনি উচ্চ প্রাইমারি পর্যন্ত পড়েছিলেন। তবে তিনি ভালো অঙ্ক জানতেন। নরেন্দ্রনাথের ম্যাট্রিকের অঙ্কও তিনি কষে দিতেন। এছাড়া তিনি ছিলেন শিল্পরসিক, প্রথাগত শিক্ষা না থাকলেও মার্গসঙ্গীতে তাঁর দখল ছিল; রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদের গানও তিনি গাইতেন। তিনি অভিনয়ও করতে পারতেন। সাহিত্যপ্রিয় এই মানুষটির প্রিয় লেখক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র। এছাড়া বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী থেকেও তিনি রসাস্বাদন করতেন।

মহেন্দ্রনাথ ভাঙ্গা শহরে এক উকিলের সেরেস্তায় মুহুরীর কাজ করতেন। চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজের মুসাবিদায় তিনি ছিলেন পারদর্শী। তাঁর সেরেস্তার উকিলেরাও তাঁর উপরে অনেকাংশে নির্ভর করতেন। এই রকম বহুকর্মা পিতা নরেন্দ্রনাথের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ লেখেন — "সবচেয়ে জীবন্ত প্রাণবান পুরুষ ছিলেন আমার বাবা। এমন পুরুষ মূর্তি আমি আর জীবনে দেখিনি।"[৮] কিন্তু নরেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর পিতার থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির। এই নিয়ে পিতা-পুত্র উভয়েরই দুঃখের অন্ত ছিল না। 'আত্মকথা'য় নরেন্দ্রনাথ লেখেন — "আমি বাবার মত হইনি এ সম্বন্ধে ছেলেবেলা থেকেই আমি সচেতন ছিলাম। আমার চারিদিকের উচ্চারিত অনুচ্চারিত মন্তব্য আর মনোভাব আমাকে সচেতন করে তুলেছিল। বাবা ছিলেন আটপিঠে মানুষ। দরকার হলে যেমন কোদাল কুড়ুল চালাতে পারতেন তেমনি কলম চালাতেও তাঁর ক্লান্তি ছিল না। কিন্তু গায়ের ছেলে হয়েও আমি না পারি গাছে উঠতে। না পারি নৌকা বাইতে।"[৯] পিতা ও পুত্রের এই বৈপরীত্য সম্পর্কে তিনি নিজে যেমন সচেতন ছিলেন, তেমনি পরিবারের অন্যান্যরাও এ বিষয়ে অবগত ছিলেন। নরেন্দ্রনাথের মামীমা একবার নরেন্দ্রনাথের পিতাকে নরেন্দ্রনাথের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের কথা বলায় মহেন্দ্রনাথ অন্তরে কষ্ট পেয়েছিলেন। নরেন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণে এই ঘটনার উল্লেখ আছে—"শুনে বাবার মুখখানি মুহূর্তের জন্য ম্লান হয়ে গিয়েছিল। পরক্ষণেই তিনি হেসে বলেছিলেন, 'বউঠান একজন কি আর একজনের মত হয়?' "[১০]

নরেন্দ্রনাথ যেমন পিতার গৌরবে গৌরব বোধ করতেন তেমনি পিতাও তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তবে তিনি নিজে পিতার মতো নন বলে নরেন্দ্রনাথের আফশোষ থেকে গেছে চিরকাল। তাঁর নিজের ভাষায়—

"এই কোমল কঠিনে গড়া একই সঙ্গে বিষয়বুদ্ধি আর শিল্পবুদ্ধিতে সমৃদ্ধ বহুকর্মা পুরুষটির প্রায় কিছুই আমি পাইনি। না তাঁর আকার না তাঁর প্রকৃতি। শুধু সাহিত্য প্রীতি, শুধু যৎসামান্য লেখার শক্তি। শুধু নিজের যন্ত্রণাকে ভাষায় ব্যক্ত করবার কথঞ্চিৎ ক্ষমতা। এই আমার উত্তরাধিকার।"[১১]

বাল্যকালে নরেন্দ্রনাথের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল আরেকজন কীর্তিমান পুরুষ, তিনি মহেন্দ্রনাথের সম্পর্কিত মামা - নরেন্দ্রনাথ যাকে ডাকতেন 'চাকলাদার ঠাকুরদা'। তার পুরো নাম অবিনাশচন্দ্র চাকলাদার। নরেন্দ্রনাথের বাল্যকালেই এই ঠাকুরদা সপরিবারে তাঁদের পরিবারভুক্ত হন। প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনীয় বহু বিষয়ে তাঁর দক্ষতা ছিল। বহু বিষয়ে দক্ষতা থাকলেও তার বিষয়বুদ্ধি ছিল না। সংসারের আর পাঁচজনের সঙ্গে তাঁকে মেলানো যেত না বলেই এই ঠকুরদার প্রতি ছিল নরেন্দ্রনাথের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ ও অন্তরঙ্গ সহানুভূতি। 'কিশোর গল্প সমগ্র' গ্রন্থে সংকলিত গল্প গুলিতে নরেন্দ্রনাথ এই ঠাকুরদাকে অমর করে রেখেছেন। এছাড়া অন্যান্য অনেক গল্পেই এই চরিত্রের ছায়াপাত ঘটেছে। এই চাকলাদার ঠাকুরদার কাঠের বাক্সের থেকে পাওয়া রামায়ণ, মহাভারত, বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' এবং আরও প্রচুর গ্রন্থ কিশোর নরেন্দ্রনাথকে ছোটবেলায় সাহিত্যরস আস্বাদনের সুযোগ করে দিয়েছিল এবং এইসব গ্রন্থপাঠ করেই নরেন্দ্রনাথ কিশোর বয়সে সাহিত্য রচনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। চাকলাদার ঠাকুরদার এই গ্রন্থগুলি নিয়ে তিনি প্রথম তাঁদের বাড়িতে একটি লাইব্রেরি তৈরি করেন। এই গ্রন্থাগার প্রীতি নরেন্দ্রনাথের আমৃত্যু ছিল। জীবনের শেষ বেলায় এসেও তিনি তাঁদের পাড়ার সুহৃদ-সংঘ লাইব্রেরিকে গড়ে তোলার জন্য পরিশ্রম করেছেন। এই চাকলাদার ঠাকুরদার কাঠের বাক্সে 'গয়াসুরের হরিপাদপদ্ম লাভ' নামে আদি-অন্ত খণ্ডিত একটি পৌরাণিক নাটক নরেন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন। এই নাটকের অনুসরণে তিনি একটি নাটক লিখতে শুরু করেছিলেন। অতএব স্পষ্টতই বলা যায় নরেন্দ্রনাথের লেখক হয়ে উঠার পিছনে চাকলাদার ঠাকুরদার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়ে গেছে।

নরেন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোরকালে তাঁর থেকে কুড়ি বছরের বড় জ্যাঠতুতো দাদা বিরূপাক্ষ তাঁকে সাহিত্য রচনায় উৎসাহিত করেছিলেন। বংশের প্রথম ম্যাট্রিকুলেট বড়দা বিরূপাক্ষই নরেন্দ্রনাথ ও ধীরেন্দ্রনাথকে সাহিত্যের প্রথম পাঠ দেন। ধীরেন্দ্রনাথ লেখেন—"বড়দার কাছেই আমাদের সাহিত্যের প্রথম পাঠ।"[১২] ছুটিতে বড়দা বাড়িতে আসলে তাঁর কাছে নরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের গান, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, শরৎচন্দ্রের রচনা শুনতেন। বিরূপাক্ষ ছিলেন বিদেশি উপন্যাসের ভক্ত, তিনি ভাইদের বিদেশি উপন্যাসের কাহিনি মুখে মুখে শোনাতেন। ধীরেন্দ্রনাথের লেখা থেকে জানা যায় এই বড়দার মুখেই তাঁরা দস্তয়েভস্কির 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট' উপন্যাসের গল্প শুনেছিলেন। পত্রবিলাসী বড়দা নরেন্দ্রনাথকে উৎসাহিত করতেন সাহিত্য রচনার প্রতি। বলেছিলেন — "আমি শুধু চিঠিতেই সাহিত্যচর্চা করে গেলাম। তার বেশি আর এগোল না। তুমি লিখছ। আরো লিখবে, তুমি হবে আমাদের বংশের প্রথম লেখক।"[১৩] নরেন্দ্রনাথ যখন ক্লাশ এইটে পড়েন তখন এই বড়দা যৌথ পরিবার থেকে পৃথক হয়ে যান। এই সময় এই ঘটনাকে ঘিরে বাড়িতে একটু বাদ বিসংবাদের সৃষ্টি হয়। এই সময়কার দৈনন্দিন বাদ-প্রতিবাদের বিবরণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে লিপিবদ্ধ করবার প্রয়াস করেছিলেন নরেন্দ্রনাথ। এই প্রচেষ্টাও তাঁর লেখক হয়ে ওঠার

পথকে সুগম করেছিল বলে তিনি মনে করতেন। পারিবারিক আবহের আনুকূল্য ও পারিবারের সদস্যদের প্রেরণা— এই যুগপৎ দিকই তাকে লেখক হয়ে উঠতে উৎসাহিত করেছিল, শুধু তাই নয় তিনি তাঁর কৈশোর গল্পের চরিত্রের সন্ধানও করেছিলেন পরিবারের গণ্ডির মধ্যে। নরেন্দ্রনাথের এক জ্যাঠতুতো দিদি ছিলেন, তার স্বামী স্বদেশী করতেন। এই দিদি ও জামাইবাবুকে নিয়েই নরেন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন তাঁর প্রথম গল্প।[১৪]

নরেন্দ্রনাথের বাল্যশিক্ষার শুরু অক্ষয়কুমার শীলের কাছে। সদালাপী ও কীর্তন গানে পটু এই বাল্যশিক্ষকের রূঢ়তাকে বর্জন ক'রে তিনি 'দ্বীপপুঞ্জ' উপন্যাসের বিনোদ চরিত্র অঙ্কন করেছেন। আত্মভোলা কীর্তনীয়া বিনোদকে রূপ লাবণ্যময় ক'রে গড়ে তিনি কুরূপ বাল্যশিক্ষককে গুরুদক্ষিণা দিয়েছিলেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে, নরেন্দ্রনাথের সাহিত্য রচনার সূত্রপাত বাল্যকালেই। অমুদ্রিত এই প্রস্তুতি পর্বে তাঁর একজন সাহিত্য সঙ্গী ছিলেন তাঁদের প্রতিবেশী দিগিন্দ্রনাথ রাহা। বয়সে অনেক বড় হলেও সাহিত্য অনুরাগী এই দিগেনকাকা, নরেন্দ্রনাথের সমমনস্ক ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লেখেন—

"বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী থেকে পছন্দমত অংশগুলি তিনি পড়ে পড়ে শোনাতেন। পঠিত বিষয় নিয়ে আলাপ করতেন আলোচনা করতেন। চাকলাদার ঠাকুরদা আর আমি সেই আলোচনায় সাগ্রহে যোগ দিতাম।"[১৫]

ভাঙ্গা হাইস্কুলে নবম শ্রেণিতে পড়বার সময় বন্ধুদের সঙ্গে মিলে নরেন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছিলেন হাতে লেখা পত্রিকা 'আহ্বান'। এই পত্রিকার পাতাতেই তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন ধারাবাহিক উপন্যাস 'মুক্তার হার'। কাগজের পঞ্চত্ব প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই 'মুক্তার হার'ও হারিয়ে যায়। একই সময়ে ভাই ধীরেন্দ্রনাথ, খুড়তুতো ভাই হেমেন্দ্র ও বন্ধু কৃষ্ণদাস বৈরাগীকে নিয়ে প্রকাশ করেছিলেন আরেকটি হাতে লেখা পত্রিকা 'মাসিক মুকুল'। নরেন্দ্রনাথ স্বয়ং ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক। বাল্যকালের এই সব আপাত অকিঞ্চিৎকর অথচ লেখক হিসেবে গড়ে উঠবার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যপ্রচেষ্টাগুলি আরও পরিণতি ও গভীরতা লাভ করে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে পড়বার সময় সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে সমবয়স্ক বন্ধু ও সাহিত্যসঙ্গী হিসেবে লাভ ক'রে।

কবিপ্রাণতা ও শিল্পিমানসিকতা নরেন্দ্রনাথের বাল্যকাল থেকেই ছিল। শিল্পি মানুষদের সঙ্গে তিনি একাত্মতা অনুভব করতেন এবং এই মানুষেরা অনেকেই তাঁর রচিত ছোটগল্পের চরিত্র হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে তাঁর স্বীকারোক্তি এই রকম— "সেই অল্প বয়স থেকেই গ্রামের যারা নানা মাধ্যমের শিল্পী তাদের সঙ্গে আমি এক ধরনের আত্মীয়তা বোধ করতাম। তাদের আমি সমাদর করতাম। তাদের সঙ্গ আমার ভালো লাগত। সবাইকে পারিনি কিন্তু তাদের কাউকে আমি লেখার মধ্যে ধরে রাখতে চেষ্টা

করেছি।"[১৬]

১৯৩৩ সালে ফার্স্ট ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে নরেন্দ্রনাথ ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে ভর্ত্তি হন। এখানেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। রেসিডেন্সিয়াল টিউশনি ক'রে ফরিদপুরে নরেন্দ্রনাথ থাকতেন। তবে টিউশনিতে তিনি সুনাম অর্জন করতে পারেননি। কোমল স্বভাবের জন্য তিনি ছাত্রদের মান্যতা পেতেন না, তাছাড়া অন্যের বাড়িতে ছাত্র পড়িয়ে বাস করবার গ্লানি তাকে স্পর্শ করতো। তাঁর স্মৃতিচারণা ও রচনাতে ফরিদপুরের স্মৃতি হয়তো এই কারণেই আশ্চর্যরকম কম বা স্পষ্টত নেই। তবে এই ফরিদপুরে কলেজে পড়বার সময়ই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিলিত ভাবে একটি হাতে লেখা মাসিক পত্র প্রকাশ করেছিলেন। এই পত্রিকার নাম ছিল 'জয়যাত্রা'। এই পত্রিকায় 'নিখিলের চিঠি' নামে একটি পত্রোপন্যাস রচনা শুরু করেন নরেন্দ্রনাথ। এ বিষয়ে সমালোচক লেখেন—

"অল্প বয়সেই অভিনব শিল্পরীতির দিকে লেখকের আকর্ষণ গড়ে উঠেছিল এই পত্রোপন্যাসই তার প্রমাণ।"[১৭]

'জয়যাত্রা' ব্যতীত, ফরিদপুরে কলেজে পড়বার সময়েই সত্যেন্দ্রনাথ রায়, অচ্যুত গোস্বামী, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, রণেন মজুমদার,শান্তিপ্রিয় ঘোষ প্রমুখের সঙ্গে মিলিতভাবে আরেকটি হাতে লেখা কাগজ তিনি প্রকাশ করেছিলেন এই পত্রিকার নাম ছিল 'অভিসার'। বন্ধুবর্গের মধ্যে বয়জ্যেষ্ঠ শান্তিপ্রিয় বাবু ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক। সম্পাদক মহাশয় 'শ্যামলী সেন' নামে এক 'কল্পিতা সঙ্গিনীকে'ও তাদের গোষ্ঠীভুক্ত করেছিলেন। দু'তিন সংখ্যার বেশি প্রকাশিত না হলেও এই 'অভিসার' পত্রিকায় নরেন্দ্রনাথেরা সাহসী সব লেখা প্রকাশ করতেন। নরেন্দ্রনাথের ভাষায়— "সেই অভিসার পত্রিকায় আমাদের সব দুঃসাহসিক লেখা বেরোত। আর সমালোচনাও হত তীব্র রকমের। আমরা উপভোগ করতাম।"[১৮]

মোটামুটিভাবে এ হল নরেন্দ্রনাথের সাহিত্য জীবনের 'অমুদ্রিত প্রস্তুতিপর্ব'। ১৯৩৫ সালে ফরিদপুর থেকে নরেন্দ্রনাথ প্রথম বিভাগে আইন পাশ করেন, এরপর তিনি বি.এ. পড়তে কলকাতায় এসে বঙ্গবাসী কলেজে ভর্ত্তি হন। ফরিদপুর তার মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল বলে মনে হয়না, ফরিদপুরের স্মৃতি তার পরবর্তী সাহিত্য জীবনে নেই বললেই চলে। এ বক্তব্যের সমর্থনও পাওয়া যায় তাঁর ভাই ধীরেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখায়— "...ফরিদপুর দাদার মনের ওপর বেশি ছাপ ফেলতে পারেনি। তাঁর লেখায় সদরদি, ভাঙার কথা যতটা এসেছে, সে তুলনায় ফরিদপুরের কথা কিছুই আসেনি।"[১৯]

বঙ্গবাসী কলেজে বি.এ. ক্লাশে পড়বার সময় তার লেখা প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৩৬ সালে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত এই লেখাটি একটি কবিতা, নাম— 'মূক'। যদিও আমাদের আলোচনার বিষয় নরেন্দ্রনাথের ছোটগল্প তথাপি তাঁর এই কবিতা সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যেতে পারে, কারণ

ছোটগল্পকার হিসেবে লেখকের মেজাজটি বুঝে নিতে এই লেখাটি সহায়তা করে। কবিতা সম্পর্কে তিনি বলেন— "কবিতা যতই দুর্বল, আর সমকালের তুলনায় রীতির দিক থেকে পুরাকালের হোক না তার মধ্যে ব্যক্তিসত্তাকে যেভাবে ঢেলে দেওয়া যায় তেমন আর কোন রচনায় যায় না।"[২০] তাঁর এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, নিজের কবিতার রীতি যে সমকালীন ধারা অপেক্ষা একটু পশ্চাদানুসারী সে সম্পর্কে তিনি সচেতন। অন্যদিকে আরেকটি বিষয় এ থেকে জানা যায় যে তিনি কবিতায় নিজের ব্যক্তিসত্তাকে ঢেলে দিতে স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন। এখন তাঁর প্রথম মুদ্রিত 'মূক' কবিতা থেকে দুটি চরণ উদ্ধার করা যাক। এই কবিতার শেষ দুটি চরণ এই রকম-

"শুধু কি ভালোবাসা পাবে না কভু ভাষা
গুমরি মরি যাবে আপন হৃদিমাঝে ?"

ভাষা ও ছন্দগত দিক থেকে এ কবিতা যে আধুনিকতার পরিচয়বাহী নয় তা স্পষ্টই অনুভব করা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ রীতি তার নিজস্বতাকে প্রকাশ করে। যে সময় এই কবিতাটি লেখা হয়েছে অর্থাৎ ১৯৩৪ সাল (প্রকাশ ১৯৩৬) সে সময়ে কবিতার জগৎটি বর্তমানের মত ছিলনা। গদ্যছন্দের ব্যবহার ও অন্যান্য আধুনিকতার ছোঁয়া তখন কবিতার গায়ে লাগতে শুরু করেছে। সমালোচকের ভাষায়— "বাংলা কবিতায় তখন বাজারচলতি ফ্যাশান হল নজরুল ইসলামের দ্রোহবাদ, মোহিতলাল মজুমদারের দেহবাদ, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের দুঃখবাদ।"[২১] অতএব স্বাভাবিক ভাবেই দেখা যায় নরেন্দ্রনাথ প্রচলিত কাউকে অনুসরণ করেননি, আধুনিকতার ছোঁয়া হয়ত তিনি কবিতায় দিতে পারেননি কিন্তু নিজের মানসিকতার বিপরীতে গিয়ে সেই বাজার চলতি ফ্যাশানকেও গ্রহণ করেননি। তিনি নিজের পথ নিজেই খোঁজার চেষ্টা করেছেন, তাঁর কবিতা ভাল কি মন্দ, আধুনিক কি অনাধুনিক তা বিচারে না গিয়েই বলা যায় তাঁর কবিতার রীতি তাঁর নিজস্ব। এই নিজস্বতাই হয়ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়কে উৎসাহিত করেছিল নরেন্দ্রনাথের কবিতা প্রকাশে। যদিও বিজয়লালের নিজের কবি মানসিকতার সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের কবি মেজাজের মিল ছিলনা। নরেন্দ্রনাথের কবিতার নির্বাচক 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক বিজয়লালের নিজের কবিতার বই 'সর্বহারার গান' ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল রাজদ্রোহের অপরাধে। অথচ এই বিজয়লালই নরেন্দ্রনাথের কবিতা পছন্দ করতেন। এর সমর্থন পাওয়া যায় নরেন্দ্রনাথের নিজের লেখায়—"তখন বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় দেশের কবিতা বিভাগের সম্পাদনা করতেন। তিনি পরপর আমার আরো অনেক কবিতা ছেপেছিলেন। তাঁর কবিতার মেজাজের সঙ্গে আমার কবিতার মিল ছিলনা। তবু তিনি আমার কবিতা পছন্দ করতেন। আলাপ পরিচয় হওয়ার পর সে-কথা আমাকে বলেছিলেন।"[২২]

এবার দেখা যাক তাঁর লেখা কবিতার বিষয়ভাবনার ক্ষেত্রে কোন মৌলিক দিকটির সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর লেখা প্রথম কবিতার বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি লেখেন— "কবি যে মেয়েটিকে

ভালোবাসে, তার কাছে বার বার যায়, কিন্তু বলি বলি করেও মনের কথা বলতে পারে না, এই ছিল কবিতাটির বিষয়বস্তু।"[২৩]— এই বিষয়টি যে একটি আধুনিক কবিতার বিষয়বস্তু অপেক্ষা অনেক বেশি একটি ছোটগল্পের বিষয়বস্তু এ সম্পর্কে বোধ করি সকলেই একমত হবেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু ক'রে বহু ছোটগল্পকার এই বিষয়কে অবলম্বন করে গল্পরচনা করেছেন; নরেন্দ্রনাথের গল্পের ভাণ্ডারেও এই বিষয়কে নিয়ে লেখা গল্পের অভাব নেই। 'চিলেকোঠা' গল্পটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। যদিও তিনি বলেছেন— "যাঁরা কবিতা আর গদ্য দুই-ই লেখেন, তাঁরাই জানেন কবিতা লেখায় আনন্দ কত বেশি।"[২৪] কিন্তু তাঁর কবিতা পড়লে দেখা যায় সেই কবিতাগুলি যেন একটু গল্পের আভাস যুক্ত। অনায়াসেই সেই কবিতাগুলি একটি ক'রে ছোটগল্প হতে পারত। কবিতা ও ছোটগল্পের মাঝখানে যেন তারা দোদুল্যমান হয়ে আছে। নরেন্দ্রনাথ যাই লিখে থাকুন তাঁর প্রবণতা ও প্রতিভা যে আদর্শ ছোটগল্পের সে কথা তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা থেকেই আন্দাজ করা যায়।

যাইহোক 'মূক' প্রকাশিত হবার বছরই অর্থাৎ ১৯৩৬ সালে 'মৃত্যু ও জীবন' বলে একটি গল্প 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই গল্পটিই তাঁর প্রথম মুদ্রিত ছোটগল্প। এরপর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য এই দুই বন্ধুর সঙ্গে একত্রিত ভাবে 'জোনাকি' নামে তাঁর একটি ক্ষুদ্র কাব্য সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। কবি হিসেবে তিনি পরিচিত না হলেও ১৯৫৩ সালেও একক ভাবে তাঁর 'নিরিবিলি' নামে আর একটি কাব্যগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল। তবে এর মধ্যে নরেন্দ্রনাথের জীবনে একটি বড় পরিবর্তন হয়েছে তা হল তাঁর বিবাহ। সংসারে ঢুকতে ভয় থাকলেও পিতার আদেশে ১৯৩৮ সালে সদরদি গ্রামের পার্শ্ববর্তী চোমড়দি গ্রামের অবিনাশচন্দ্র ঘোষের জ্যেষ্ঠা কন্যা শোভনা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

১৯৩৯ সাল পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথ কলকাতায় একাই থাকতেন। ১৯৩৯ সালে ভাই ধীরেন্দ্রনাথ আই এ পাশ করলে নরেন্দ্রনাথ ভাইকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। এর পূর্বেই তিনি ৬৬ নম্বরের শোভাবাজার স্ট্রিটের মেসে চলে এসেছেন। এর আগে তিনি রেসিডেন্সিয়াল টিউশনি করেই কলকাতায় বাস করতেন। ধীরেন্দ্রনাথ কলকাতায় এসে দাদাকে আনন্দিতই দেখেছিলেন। কলকাতার নাগরিক জীবন তাঁর ভাল লাগত, ধীরেন্দ্রনাথের লেখায় তার সমর্থন পাওয়া যায়— "কলকাতা দাদার ভালো লাগত। দাদা রহস্য করে বলত, 'বেঁচে থাকতে হলে এক জায়গায় তো থাকতেই হবে। তার জন্যে কলকাতাই সবচেয়ে ভালো জায়গা'।"[২৫] কলকাতায় নগর জীবনকে এই ভালো লাগা থেকেই মনে হয় নরেন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পের পটভূমি হিসেবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কলকাতায় নগর জীবনকে বেছে নিয়েছেন। নাগরিক মধ্যবিত্ত মানুষই তাঁর গল্পের প্রধান চরিত্র আর তাদের সুখ-দুঃখময় জীবনকাহিনি তাঁর গল্পের প্রধান উপাদান।

এই সময় কলকাতায় তিনি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার লড়াইয়ে রত, লেখালেখির সঙ্গে সঙ্গে চাকরির

চেষ্টা করে যাচ্ছেন। 'দেশ' পত্রিকার পর রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে 'সংসার' গল্প প্রকাশিত হবার পর তিনি সম্পাদক মন্মথ সান্যাল মহাশয়ের প্রশংসাবাক্য লাভ করেন।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতেই নরেন্দ্রনাথ অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে সৈন্যদের ব্যবহার্য জিনিস পরীক্ষার কাজ পেলেন। কাজের ফাঁকে তিনি সংগ্রহ করতেন গল্প লেখার উপাদান। এই অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি থেকেই তিনি তাঁর 'নেতা গল্পের চরিত্রদের সংগ্রহ করেছিলেন। এরপর তিনি দ্বিতীয় চাকরিও পান যুদ্ধের অফিসেই, পারচেজ ডিপার্টমেন্টে কেরাণির চাকরি। এরপর কলকাতায় বোমা পড়লে নরেন্দ্রনাথ ভাইকে নিয়ে দেশে অর্থাৎ সদরদি চলে যান।

১৯৪২ সালে নরেন্দ্রনাথের পিতার মৃত্যুর পর আর্থিক দায়ভার সবটাই তাঁর উপর পড়ায় নরেন্দ্রনাথের জীবনসংগ্রাম কঠোরতর হয়। ৪ নম্বর রামশেঠ রোডের দুখানা ঘরের ভাড়াবাড়িতে তিনি সংসার পাতেন। এই সময় ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে কাজ করবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'প্রত্যহ' নামে একটি ছোটো কাগজের অফিসেও পার্ট টাইম কাজ করতেন, তবু ভাই, স্ত্রী ও দুই শিশু পুত্রকে নিয়ে ছোট্ট সংসারের দারিদ্র্য দূর করা তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হয়ে উঠত না। এতদ্‌সত্ত্বেও নরেন্দ্রনাথ তাঁর লেখার অভ্যাস বজায় রেখেছিলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দ্বীপপুঞ্জ' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে। কিন্তু এই বইটিই 'হরিবংশ' নামে ১৯৪২-৪৩ এ 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপন্যাসে তাঁর সদরদি গ্রামের অভিজ্ঞতা ও অনেক চরিত্র স্থান লাভ করেছিল আর এই সময়ের অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষভাবে স্থান পেয়েছে তাঁর বহু গল্পে, যেখানে তিনি উদ্বাস্তু অথবা মধ্যবিত্ত শ্রেণির কঠোর জীবনসংগ্রামের চিত্র অঙ্কন করেছেন, 'কাঠগোলাপ', 'পালঙ্ক' প্রভৃতি গল্পগুলির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ব্যাঙ্ক থেকে নরেন্দ্রনাথ জব্বলপুরে বদলি হলে শোভনাদেবী পুনরায় ভাঙ্গা চলে যান। জব্বলপুরের অভিজ্ঞতা অর্থাৎ বাংলাদেশের বাইরের পটভূমি নরেন্দ্রনাথের 'সহৃদয়া' উপন্যাসে কিছু ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া 'রত্নাবাঈ' গল্পটিতেও মধ্যপ্রদেশের পটভূমি ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যাঙ্কে কাজ করবার অভিজ্ঞতা তিনি তাঁর যে ছোটগল্প গুলিতে ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে 'চেক' ও 'হেডমাস্টার' গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৭ সালে ব্যাঙ্কে ভুলবশত একটি জালচেক পাস করবার দায়ে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়। বছর খানেক মামলা চলার পর তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে পুনরায় চাকরিতে যোগদান করেই পদত্যাগ করেন। এই সময় তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাশ তাঁকে সাহায্য করেন। তাঁর আত্মকথায় এই বিষয়ের উল্লেখ না থাকলেও এই সময় যে অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সঙ্গে তাঁকে কাটাতে হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 'বিজয়ী' গল্পের শ্রীবিলাস উকিলের চরিত্রটি হয়তো সেই সময়ের অভিজ্ঞতাজাত।

এই সময় নরেন্দ্রনাথের প্রথম গল্পসংকলন 'অসমতল' (১৯৪৫) প্রকাশিত হয়ে গেছে এবং একজন শক্তিশালী গল্পকারের আর্বিভাব সম্পর্কে পাঠককুল নিঃসংশয় হয়েছে। তবু নরেন্দ্রনাথের জীবনসংগ্রাম সমাপ্ত হয়নি 'কৃষক', 'স্বরাজ' প্রভৃতি কাগজের অফিসে চাকরি ও লেখালেখির দ্বারা জীবিকা অর্জনের চেষ্টায় তিনি তখনও সংঘর্ষ করছেন আর এই সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতা থেকে নিজের লেখার উপাদান সংগ্রহ করছেন। যেমন নিবেদিতা লেনে তাঁর মামাশ্বশুর ও মেসোশ্বশুরেরা একত্রে বসবাস করতেন, কিছুটা সেই পরিবারের আদলেই তাঁর 'চেনামহল' উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। এছাড়া লিনটন স্ট্রিটের বস্তি বাড়িতে বসবাস কালে তাঁদের সহ ভাড়াটে ছিল দুই বোন। এদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক মধুর ছিল না, এদের বড় বোনকেই 'দেহমন' উপন্যাসে প্রধান চরিত্র 'রুবি'র ভূমিকায় তিনি অঙ্কন করেছেন।

১৯৫১ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় চাকরি পান নরেন্দ্রনাথ, তারপর ১৯৫৩ সালে পাইক পাড়ায় স্থায়ী ভাবে বসতি স্থাপন করেন। অর্থনৈতিক ভাবে সুস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় স্থায়ী আশ্রয়ও লাভ করেন এবং আমৃত্যু সাহিত্য সাধনা করতে থাকেন। ১৯৭৫ এর ১৪ই সেপ্টেম্বর রাতে হৃৎ-যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁর মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর দিন সকালেও তিনি 'মিনিবাস' নামে একটি ছোটগল্প পত্রিকার অফিসে নিজে দিয়ে এসে ছিলেন। উনষাট বছরের জীবৎকালে তিনি লিখে গেছেন পঁয়ত্রিশটি উপন্যাস ও চার শতাধিক ছোটগল্প যা বাংলা সাহিত্যের অমূল্য রত্নরাজি বলে বিবেচিত।

এই অধ্যায়ে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে নরেন্দ্রনাথের জীবনভাষ্যটি আলোচনা করা হল। এই জীবনভাষ্যটি কীভাবে নরেন্দ্রনাথের মতো একজন সংবেদনশীল ছোটগল্পকারের জীবনবীক্ষাটি নির্মাণ করেছিল তা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখানো হবে।

উল্লেখপঞ্জি

১. ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'আমাদের কথা', 'প্রসঙ্গ ঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র', সম্পাদনা - সমীর বসু, পদক্ষেপ সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০১, পৃষ্ঠা - ৩.

২. নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'আত্মকথা', 'গল্পমালা - ২', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ, মার্চ ২০০০, পৃষ্ঠা - ৭.

৩. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫

৪. অভিজিৎ মিত্র ঃ 'বিরাজবালার উত্তরাধিকার', 'প্রসঙ্গ ঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র', সম্পাদনা -সমীর বসু,পদক্ষেপ সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০১, পৃষ্ঠা - ২৫.

৫. ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'আমাদের কথা', 'প্রসঙ্গ ঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র', সম্পাদনা - সমীর বসু, পদক্ষেপ সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০১, পৃষ্ঠা - ৪.

৬. অভিজিৎ মিত্র ঃ 'বিরাজবালার উত্তরাধিকার', 'প্রসঙ্গ ঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র', সম্পাদনা-সমীর বসু, পদক্ষেপ সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০১, পৃষ্ঠা - ২৫.

৭. তদেব, পৃষ্ঠা - ২৫

৮. নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'আত্মকথা', 'গল্পমালা - ২', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ, মার্চ ২০০০, পৃষ্ঠা - ৮.

৯. তদেব, পৃষ্ঠা - ৮

১০. তদেব, পৃষ্ঠা - ৮

১১. তদেব, পৃষ্ঠা - ৮

১২. ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'আমাদের কথা', 'প্রসঙ্গ ঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র', সম্পাদনা - সমীর বসু, পদক্ষেপ সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০১, পৃষ্ঠা - ৪.

১৩. নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'আত্মকথা', 'গল্পমালা - ২', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, মার্চ ২০০০, পৃষ্ঠা - ১২.

১৪. সূত্র— ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'আমাদের কথা', 'প্রসঙ্গ ঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র', সম্পাদনা - সমীর বসু, পদক্ষেপ সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০১, পৃষ্ঠা - ৪

১৫. তদেব, পৃষ্ঠা - ১২

১৬. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৩

১৭. অঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য ঃ 'নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ জীবন ও সাহিত্য', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা - ৪.

১৮. নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'আত্মকথা', 'গল্পমালা - ২', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, মার্চ ২০০০, পৃষ্ঠা - ১৪.

১৯. ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'আমাদের কথা', 'প্রসঙ্গ ঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র', সম্পাদনা - সমীর বসু, পদক্ষেপ সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০১, পৃষ্ঠা - ৬.

২০. নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'আত্মকথা', 'গল্পমালা - ২', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, মার্চ ২০০০, পৃষ্ঠা - ১৫.

২১. সমীর সেনগুপ্ত ঃ 'নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কবিতা', 'প্রসঙ্গ ঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র', সম্পাদনা - সমীর বসু, পদক্ষেপ সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০১, পৃষ্ঠা - ১২৭.

২২. নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'আত্মকথা', 'গল্পমালা - ২', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, মার্চ ২০০০, পৃষ্ঠা - ১৫.

২৩. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫

২৪. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫

২৫. ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'আমাদের কথা', 'প্রসঙ্গ ঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র', সম্পাদনা - সমীর বসু, পদক্ষেপ সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০১, পৃষ্ঠা - ৬.

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্প থেকে যে সকল পংক্তি উদ্ধার করা হয়েছে সে সকল অভিজিৎ মিত্র সম্পাদিত ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পমালা ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কিশোর গল্প সমগ্র থেকে গৃহিত।

।। তৃতীয় অধ্যায় ।।

ছোটগল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জীবনবীক্ষা

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক বলেন— "নরেন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাস ও গল্প রচনার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ পরিমণ্ডলের মধ্যেই যেন বরাবর নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন।... একটি বিশেষ ছকের বাইরে এসে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোকে কখনো ক্রিয়াশীল হতে দেখা যায়নি।"[১] — এই বক্তব্যের সত্যতা অস্বীকার না করেও বলা যায় যে নরেন্দ্রনাথের গল্পে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অসমতল' (১৩৫২) প্রকাশিত হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পর, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের অগ্নিগর্ভ সময়ে। বিক্ষোভ- বিদ্রোহের মধ্যে মানুষ হবার ফলে যুদ্ধ সমকালের অভিজ্ঞতা যেমন তাঁর অন্তরে জাগ্রত ছিল তেমনি যুদ্ধোত্তরকালে সমাজের বিপর্যয়, মানসিক অবক্ষয়, মধ্যবিত্ত জীবনের স্থিতিহীনতা ও ছিন্নমূল মানুষের অসহায়তাও তিনি প্রত্যক্ষ করেন এবং তা থেকে তিনি মুখ ঘুরিয়ে থাকেননি। ফলে তাঁর রচনায় এই বিষয়গুলি স্থান লাভ করেছে এবং এই সব বিষয় তাঁর রোম্যান্টিক সৌন্দর্যপ্রিয়তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁর গল্পে বিষয়গত বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে। তিনি নিজে ছিলেন ছিন্নমূল উদ্বাস্তু এর ফলে দেশবিভাগের পরবর্তী সময়ে ছিন্নমূল মানুষের জীবনসংগ্রাম তাঁর রচনায় বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। দেশবিভাগ ও তৎপরবর্তী ভারতবর্ষে চলে আসা উদ্বাস্তু মানুষের কাহিনি ও দেশবিভাগের পর দেশেই থেকে যাওয়া মানুষের মানসিক যন্ত্রণা উভয়ই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন সমান দক্ষতায়। এরসঙ্গে যুক্ত হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানে অতিবাহিত করা বাল্যকালের স্মৃতি। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও তাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে অনুপুঙ্খ অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল, ফলে নরেন্দ্রনাথের গল্পে মুসলিম সমাজ ও চরিত্র উঠে এসেছে সহজ বাস্তবতায়। এই কারণে সমালোচক বলেন—

" একমাত্র অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ছাড়া আর কোন লেখক নরেন্দ্রনাথের মতো মুসলমান জীবনের পটভূমিকায় এতো বেশি গল্প লেখেননি।"[২]

নরেন্দ্রনাথের গল্পের এই বিষয়গত বৈচিত্র্য থাকলেও তাঁর গল্পের মূল সুর রোম্যান্টিকতা। ১৯৬৮ সালের মে মাসে 'ধ্বনি' পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন—

"সমাজে শঠতা আছে, ক্রূরতা আছে, তা আমি জানি। হিংসা বিদ্বেষেরও অভাব নেই। কিন্তু সমাজ জীবনের এই অন্ধকার দিকের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় কম। কারণ, আমার লেখায় জীবনের এই সকল দিক খুব বড় হয়ে দেখা দেয়নি। যতদূর মনে হয়, শান্তি মধুর ভাবই আমার রচনায় বেশি। মানুষের স্খলন, পতন, ত্রুটি অবশ্যই আছে। কিন্তু তা আমাদের গর্বের বস্তু নয়। যেখানে আমরা মহৎ,

শক্তিমান, সেখানে যেন আমাদের যথার্থ পরিচয় আছে। ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে পাপ আমাকে আকর্ষণ করে না। জীবনের পঙ্কিল অথবা ক্লেদাক্ত দিকে আমার নিজস্ব বাস্তব অভিজ্ঞতা তেমন কিছু নেই। আমার মেজাজ রোমান্টিক সৌন্দর্যপ্রিয়।তাই মহত্ত্বই আমায় আকর্ষণ করে বেশি। কোন তারুণ্য বা যৌবনের স্পর্শ আমার ভাল লাগে। এবং ভাল লাগার সূত্র ধরে তাদের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ হতে চাই। সখ্যপ্রীতির সম্পর্ক আমায় আনন্দ দেয়। আমি সচেতনভাবে সযত্নে সেই সম্পর্কের অনুশীলন করি। আমার কাছে এই সম্পর্কও একটি শিল্প।"

তাঁর এই মানসিকতা তাঁর গল্পের চরিত্র ও বিষয়কে উগ্র বা বিক্ষুব্ধ করে তোলেনি। হৃদয়ের উত্তাপের উষ্ণতা তাঁর গল্পে অনুভব করা যায় কিন্তু সেই উত্তাপ গল্পকে নির্মম করে তোলেনি। এই বিষয়টি সমকালীন অন্যান্য ছোটগল্পকার যেমন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ ও নব্যেন্দু ঘোষের রচনা থেকে নরেন্দ্রনাথের রচনাকে একটি ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। তাঁর গল্পের মূল সুর রোম্যান্টিকতা হলেও এই রোম্যান্টিকতা তাঁর গল্পকে বৈচিত্র্যহীন করে তোলেনি। এই বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁর চারশোরও বেশি জনপ্রিয় গল্পকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতেই পারে। তবে এই বর্গীকরণ যে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ তা নয়, কারণ আধুনিক জটিল জীবনযাত্রায় বহুমাত্রিক মানুষের কাহিনিকে একটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট পরিচয়ে আবদ্ধ করা যায় না। এই কারণে রাজনৈতিক সংঘাতের গল্পেও লুকিয়ে থাকে মনস্তাত্ত্বিক গল্পের উপাদান আবার দেশবিভাগ যে গল্পের কেন্দ্রিয় বিষয় সেখানেও রয়ে যায় মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্র। তবুও ছোটগল্প যেহেতু জীবনের একটি নির্দিষ্ট দিক বা মুহূর্তকেই আলোকিত করতে চায় সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই গল্পগুলিকে কয়েকটি বিভাগ ও উপবিভাগে বিভক্ত করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর প্রাধান্য বিচারে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্প গুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়—

১. মনস্তাত্ত্বিক ছোটগল্প বা মানব মনস্তত্ত্বের নিপুণ বিশ্লেষণ মূলক গল্প।

২. নরনারীর পারস্পরিক আকর্ষণ বা প্রেমের গল্প।

৩. রাজনৈতিক মতাদর্শ ও সংঘাতের গল্প।

৪. দেশবিভাগ পরবর্তী জীবন সংগ্রামের গল্প। এই শ্রেণির গল্প গুলিকে আবার ২টি উপবিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা—

ক. দেশবিভাগের পর ভারতবর্ষে চলে আসা উদ্বাস্তু মানুষের কাহিনি অবলম্বনে লেখা গল্প এবং

খ. দেশবিভাগের পর দেশেই থেকে যাওয়া মানুষকে নিয়ে রচিত গল্প।

৫. সমাজসমস্যামূলক ছোটগল্প।

৬. ব্যক্তি জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ গল্প ও কিশোর গল্প।

৭. মৃত্যুচেতনা প্রকাশক গল্প।

এছাড়াও এমন কিছু ছোটগল্প নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনা করেছেন যাদের উপরোক্ত কোনো শ্রেণিতে যথাযথ ভাবে স্থান দেওয়া যায়না । এই নানা শ্রেণির গল্পগুলি পর্যালোচনা করলে ছোটগল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জীবনবীক্ষা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মানবমনস্তত্ত্ব-বীক্ষা ঃ

সমালোচক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—"আপাত শান্ত বৈচিত্র্যহীন মধ্যবিত্ত জীবনে যে এত রহস্য ছিল তা নরেন্দ্রনাথ না উদ্‌ঘাটন করে দিলে আমরা জানতেই পারতাম না। মানব মনের দুর্জ্ঞেয় রহস্য উন্মোচনে তিনি নির্মম নিপুণ।"[৩]

প্রকৃতই নরেন্দ্রনাথ তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণশক্তি, নিবিড় উপলব্ধি ও অনুভূতিময়তা নিয়ে ডুব দিয়েছেন মানুষের মনের গভীরে এবং সেখান থেকে তুলে এনেছেন তাদের 'আতেঁর কথা' আর সেই 'কথা'কে তাঁর ছোটগল্পে প্রকাশ করেছেন অনায়াস দক্ষতায়। মানব মনস্তত্ত্বের সুনিপুণ রূপকার নরেন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা 'রস'। বহু আলোচিত ও চলচ্চিত্রে চিত্রায়িত 'রস' গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায়। মুসলমান সমাজ জীবনের পটভূমিকায় রচিত এই গল্পটি আলোচনা প্রসঙ্গে সমালোচকের একটি উক্তিকে উদ্ধার করা যেতে পারে"— নরেন্দ্রনাথ প্রধানত মনের কারবারি। নানা ঘটনার পিছনে মানুষের মনে যে বিচিত্র ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় নরেন্দ্রনাথের গল্পে আছে তারই প্রাধান্য।"[৪]

প্রকৃতই বিভিন্ন ঘটনার পিছনে মানব মনের বিচিত্র ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এক অপরূপ রূপ লাভ করেছে 'রস' গল্পে। গল্পের প্রধান চরিত্র তিনটি। যথা— মোতালেফ, মাজুখাতুন ও ফুলবানু। এই তিনটি চরিত্রের পূর্ববর্তী জীবন, তাদের একাধিক বিবাহের কথা কাহিনিকে দীর্ঘ করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে জটিলও করেছে। কিন্তু গল্পের অনিবার্য গতি এর ফলে ব্যাহত হয়নি। একদিকে এ গল্পে যেমন মুসলমান সমাজে প্রচলিত রীতি পদ্ধতির বর্ণনা আছে তেমনি খেজুর গাছ থেকে দক্ষ 'গাছি'র দ্বারা খেজুরের রস আহরণ এবং সেই রস থেকে গুড় তৈরির পদ্ধতিরও বিস্তৃত বর্ণনা আছে। গ্রামজীবন সম্পর্কে লেখকের অনুপুঙ্খ অভিজ্ঞতা গল্পটিকে একটি পৃথক মাত্রা দান করেছে। কিন্তু গল্পে এতসব বিষয় থাকলেও প্রধান হয়ে উঠেছে চরিত্রদের মানসিক বিশ্লেষণ এবং তাতেই গল্পের রসনিস্পত্তি ঘটেছে। খেজুরের রসকে নিয়ে রচিত এই রসের গল্পের একদিকে রয়েছে রূপের প্রতি মোহ অন্যদিকে রয়েছে কর্মের প্রতি আকর্ষণ।

গল্পের নায়ক মোতালেফ পচিশ ছাব্বিশ বছরের এক শক্ত সমর্থ পুরুষ। সে খেজুর গাছ থেকে

রস বের করবার কাজে সুদক্ষ এক 'গাছি'। খেজুর গাছ থেকে রস বের করবার বিদ্যা তাকে শিখিয়েছিল রাজেক মৃধা। এই রাজেক মৃধার বিধবা মাজু খাতুনকে সহসা একদিন বিয়ে করে ঘরে নিয়ে আসে মোতালেফ। খেজুরের রস থেকে গুড় ও পাটালি তৈরির দক্ষতা মাজু খাতুনের অসাধারণ। মাজু খাতুনের দক্ষতায় ও পরিশ্রমে মোতালেফের পরিশ্রম ও সাধনা সফল হয়। মোতালেফের সংগৃহীত রস থেকে মাজু খাতুন কঠোর পরিশ্রমে উপাদেয় গুড় তৈরি করে। বাজারে সেই গুড় সুখ্যাতি পায় আর প্রচুর আর্থিক লাভ হয় মোতালেফের। এরপরই মিথ্যা অভিযোগে মাজু খাতুনকে তালাক দেয় মোতালেফ এবং বিয়ে করে ঘরে আনে তার পূর্বেই পছন্দ করা পাত্রী চরকান্দার এলেম সেখের মেয়ে ফুলবানুকে। ফুলবানুকে বিয়ে করার জন্য প্রয়োজনীয় পণ-এর টাকা উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে মাজু খাতুনকে নিষ্ঠুরভাবে ব্যবহার করে মোতালেফ। তাই মাজু খাতুন বলে—" তোমার গতরই কেবল সোন্দর মোতিমিঞা, ভিতর সোন্দর না। এত শয়তানি, এত ছলচাতুরী তোমার মনে?" ভর্ৎসনা লাভ করলেও কিন্তু মোতালেফের উদ্দেশ্য পরিপূরিত হয়েছে, ব্যবহৃত- পরিত্যক্ত মাজুখাতুনকে তার আর প্রয়োজন নেই। রূপসী ফুলবানুর সঙ্গে স্ফূর্তির জোয়ারে ভেসে যায় মোতালেফ।" শীতের পরে এল বসন্ত, মাজুখাতুনের পর এল ফুলবানু। ফুলের মতই মুখ। ফুলের গন্ধ তার নিঃশ্বাসে। পাড়াপড়শী বলল, " এবার মানাইছে, এবার সাঁচাই বাহার খোলছে ঘরের।" কিন্তু সময় থেমে থাকে না। আবার আসে শীত। পুনরায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে মোতালেফ। কারণ "রসের দিন মোতালেফের বতরের দিন।" গ্রামের সেরা গাছি মোতালেফ আগের বছর থেকে আরও কুড়িদেড়েক গাছ বেশি বন্দোবস্ত নেয়।

কিন্তু এক্ষেত্রে খেজুরের রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরিতে ফুলবানু মাজুখাতুনের ভূমিকা নিতে পরে না। অনেক কষ্টে সে চলনসই মতো গুড় তৈরি করা শিখে নেয় কিন্তু তাতে "দর ওঠে না গতবারের মত, খদ্দেররা তেমন খুশি হয় না দেখে।" মোতালেফ অন্তরে কষ্ট পায়, ফুলবানুকে তিরস্কারও করে, কিন্তু তার কিছু করার থাকে না। পুরো শীতের মরসুম সে অসহায় ভাবে কাটাতে বাধ্য হয়। "প্রয়োজন ছাপিয়ে ওঠে প্রণয়ের বিলাসকে, জবুরি হয়ে ওঠে অর্থ; আর সেখানে ফুলবানুর ভূমিকা শুধু অকর্মণ্য বিলাসিনীর।"[৫]

মোতালেফের তখন মনে পড়েছে মাজুখাতুনকে। কিন্তু মাজুখাতুন ততদিনে পুনরায় বিবাহ করেছে। সে এখন নাদির শেখের স্ত্রী। কিন্তু পুরো শীতের মরসুমে এক ছটাকও মনের মতো গুড় মোতালেফ তৈরি করতে পারেনি যা বিক্রি করে সে খদ্দেরদের সন্তুষ্ট করতে পারে । তাই খেজুর রসের অভিজ্ঞ রসিক—গুড় অন্তপ্রাণ মোতালেফ থাকতে পারেনি। দুই হাঁড়ি রস নিয়ে সে গেছে মাজু খাতুনের কাছে,ভিখারির মতো আবেদন করেছে সে মাজু খাতুনকে, সেই রস থেকে জ্বাল দিয়ে দুই সের পছন্দসই গুড় তৈরি করে দেবার জন্য। এই গুড় তার সমস্ত মরসুমের ব্যর্থতার গ্লানি ভুলিয়ে দেবে।

সমস্ত শীতকালের পরিশ্রম সফল ক'রে তাকে মানসিক শান্তি এনে দেবে। গল্পের শেষে নাদির শেখ যখন মোতালফের হুঁকোর আগুন নিভে গেছে কিনা জিজ্ঞাসা করেছে তখন তার উত্তরে মোতালেফ বলে—'না মিঞাভাই, নেবে নাই।' তার এই উক্তি যেন হুঁকোর আগুনের মতো মাজু খাতুনের সঙ্গে তার সম্পর্কের উষ্ণতাকেই ব্যঞ্জিত করেছে।

গল্পের কাহিনি অংশ এখানেই শেষ কিন্তু এরই মধ্যে অতীতের ঘটনার ফ্ল্যাশব্যাকে কাহিনি ব্যাপ্তি লাভ করেছে।চরিত্রদের পূর্বজীবন, তাদের একাধিক বিবাহ, খেজুর রস সংগ্রহ, জ্বালানি সংগ্রহ, খেজুর রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরির বিস্তারিত বর্ণনা গল্পে আছে যা গল্পকে দীর্ঘ করেছে এবং গল্পের জটিলতা বৃদ্ধি করেছে। গ্রামীণ জীবন বিশেষত গ্রামীণ মুসলিম সমাজের নিখুঁত চিত্রও স্বল্প পরিসরে নিখুঁত পরিস্ফুট হয়েছে এই গল্পে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও গল্পের মূল প্রোথিত মোতালেফ- মাজু খাতুনের মনের গভীরে। এ গল্প এক মানবিক অনুভূতির গল্প।" খেজুর রসকে অবলম্বন করে রূপাসক্তির সঙ্গে জীবিকার সংঘাত।"[৬]—এ কথা বলে 'রস' গল্পের বিষয়কে সরলীকৃত করা যায় না। মোতালেফ ফুলবানুকে বিবাহ করবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করেছে মাজু খাতুনের গুড় তৈরির দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে। এই প্রয়োজনকে সিদ্ধ করতে সে মাজু খাতুনকে বিবাহ করেছে। ফুলবানুকে বিবাহ করার প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের পর সে মাজু খাতুনকে তালাক দিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে তার নীতিহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। মোতালেফের এই ন্যায়নীতি বিগর্হিত অমানবিক আচরণ ও সকল ত্রুটি সত্ত্বেও সে যে তার স্ব-ক্ষেত্রে একজন প্রকৃত গুণী বা শিল্পি মানুষ সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আর তার স্ব-ক্ষেত্র হল খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহের কাজ। লেখক কাহিনির বর্ণনার অংশে খেজুর গাছের সঙ্গে মোতালেফের একাত্মতাকে বহুভাবে প্রকাশ করেছেন। খেজুর গাছ থেকে মোতালেফের রস সংগ্রহের পদ্ধতি বর্ণনায় সেই একাত্মতাই পরিস্ফুট—" যে ধারালো ছ্যান একটু চামড়ায় লাগলেই ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে মানুষের গা থেকে, হাতের গুণে সেই ছ্যানের ছোঁয়ায় খেজুর গাছর ভিতর থেকে মিষ্টি রস চুঁইয়ে পড়ে। এতো আর ধানকাটা নয়, পাটকাটা নয় যে, কাচির পোঁচে গাছের গোড়াসুদ্ধ কেটে নিলেই হল। এর নাম খেজুর গাছ কাটা। কাটতেও হবে আবার হাত বুলোতেও হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন ব্যথা না পায়, যেন কোন ক্ষতি না হয় গাছের। একটু এদিক ওদিক হলে বছর ঘুরতে না ঘুরতে গাছের দফা রফা হয়ে যাবে, মরা মুখ দেখতে হবে গাছের। সে গাছের গুড়িতে খাটের পৈঠা হবে ঘরের পৈঠা হবে, কিন্তু ফোঁটায় ফোঁটায় সে গাছ থেকে হাঁড়ির মধ্যে রস ঝরবে না রাত ভরে।" খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করবার পেশা মোতালেফকে খেজুর গাছের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কে যুক্ত করেছে। এই অন্তরের সম্পর্ক মোতালেফকে রসের মরসুমে ফুলবানুর প্রেমকেও ভুলিয়ে দিয়েছিল। তাই শীতের রাতে ফুলবানুর মনে হয়—" মানুষকে নয়, যেন আস্ত একটা গাছকে জড়িয়ে ধরেছে।" সে নিজে যেমন

শিল্পি তেমনি মাজু খাতুনের দক্ষতাকেও সে শ্রদ্ধা করে। অপরদিকে ফুলবানুর রূপেরও সে পূজারী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার জীবনে রূপাসক্তি ও দেহসম্ভোগ বাসনা যে জয়ী হতে পারেনি তার মূলেও রয়েছে খেজুর গাছ ও তার রস। সে ফুলবানুকেও খেজুর রস থেকে গুড় তৈরির শিল্পি তৈরি করতে চেয়েছে কিন্তু ফুলবানুর ব্যর্থতাই তাকে ফুলবানুর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এই মানসিক বিচ্ছিন্নতার কারণেই তার স্মরণে এসেছে মাজু খাতুনের কথা। কারণ মাজু খাতুনের সঙ্গে তার সম্পর্কেরও অনেকাংশ জুড়ে ছিল খেজুরের রস—" হঠাৎ মোতালেফের মনে পড়ে গেল মাজু খাতুনের কথা। রাত্রে শুয়ে শুয়ে রস আর গুড়ের কত আলোচনা করেছে তার সঙ্গে মোতালেফ। মাজু খাতুন এমন ক'রে মুখ ঝামটা দেয়নি, অস্বস্তি জানায়নি ঘুমের ব্যাঘাতের জন্যে ; সাগ্রহে শুনেছে, সানন্দে কথা বলেছে।"— এই খেজুর রস অর্থাৎ কর্মের সম্পর্ক, শুধু কর্মই বা বলা যায় কি করে, বলা যেতে পারে ধর্ম—এই ধর্ম মোতালেফ ও মাজু খাতুনের অন্তরের সম্পর্ক রচনার প্রধান উপাদান। তাই যখন অন্যের স্ত্রী হয়ে মাজু খাতুন মোতালেফকে ভর্ৎসনা করে তখন সেই কঠিন ও রূঢ় তিরস্কারও মোতালেফকে ক্রুদ্ধ করেনি। বরং এই ভর্ৎসনার মধ্য দিয়ে মাজু খাতুনের বঞ্চিত নারী হৃদয়ের অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠই তার কানে বেজেছে। মোতালেফের মনে হয়েছে যেন—" ছ্যানের খোঁচায় নলের ভিতর দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে রস।" খেজুর রসের এতবড় শিল্পি মোতালেফের অসহায়তা, মনমতো গুড় বিক্রি করতে না পারার বেদনা অপর শিল্পি মাজু খাতুনকেও স্পর্শ করেছে। তাই মাজু খাতুনের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে। লেখক বলেন—"বাখাঁরির বেড়ার ফাঁকে চোখ পড়ল কালো বড় বড় আর দুটি চোখ ছল ছল করে উঠেছে।" এইখানেই একজনের মনের বেদনা, মানবিক আবেদন অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েছে আর 'রস' গল্পটিকে অসাধারণ মানবিক মহিমা দান করেছে। লেখকের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দক্ষতা গল্পটিকে শ্রেষ্ঠত্বের সীমালগ্ন করেছে। সমালোচক যথার্থই বলেন—" এই শ্রম ও প্রেমে বাঁধা যে যৌথ জীবন বোধের আর্তি— তাতেই গল্পে জড়িয়ে যায় মোতালেফ ও মাজু খাতুন।"[৭]

নরেন্দ্রনাথের মনস্তাত্ত্বিক চেতনাটি উপলব্ধি করা যায় তাঁর 'অভিন্নহৃদয়' গল্পটি বিশ্লেষণ করলে। 'অভিন্নহৃদয়' প্রকাশিত হয় ১৩৮২ বঙ্গাব্দে আনন্দবাজার পত্রিকার পূজা সংখ্যায়। মাঝারি আয়তনের এই ছোটগল্পটি ৯টি পাতায় সীমায়িত। অসিত, দোলা ও প্রণব এই তিনটি প্রধান চরিত্রকে কেন্দ্র করে রচিত এই গল্পের মূল সুর বা বিষয়বস্তুকে তুলে ধরতে গল্পেরই একটি পংক্তিকে উদ্ধার করা যেতে পারে, আর তা হল—" বিশ্বাস স্থাপন বিশ্বাস ভঙ্গ আর তার জন্যে অনুশোচনার পীড়ন।" গল্পের মধ্যে একটি ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনি থাকলেও সেই কাহিনি গল্পের পশ্চাদ্‌ভূমি বা পটভূমি রচনা করেছে মাত্র, গল্পের মূল বিষয় হয়ে উঠতে পারেনি। প্রেমের গল্পটি তাই রয়ে গেছে পেছনের সারিতে, প্রধান হয়ে উঠেছে চরিত্রদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, তাদের মানসিকতার পরিস্ফুটন। তবে ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতিতে

দুটি স্বল্পাকার অনুচ্ছেদে ব্যক্ত হয়েছে প্রেমের কাহিনিটি। গল্পের মূল বিষয় প্রণব-দোলা ও অসিতের পূর্ব সম্পর্ক, সেই সম্পর্কের ভাঙন ও তার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মানসিক অবস্থার বিবর্তন। একদা দোলাকে কেন্দ্র করে প্রণব ও অসিত এই দুই বন্ধুর বন্ধুত্বে যে ফাটল ধরেছিল, যে ফাটলকে একসময় মনে হয়েছিল দুর্লঙ্ঘ্য, তাই কালের প্রহারে অতি সামান্য, অতি নগণ্য বস্তুতে রূপান্তরিত হয়েছে। মাত্র আট বছরের ব্যবধান তাদের সম্পর্কের তিক্ততাকে অনেকাংশে প্রশমিত করে দিয়েছে। অতীত স্মৃতি দুজনকেই হয়তো তাড়িত করেছে কিন্তু তা তীব্র হয়ে পরস্পরকে অভিভূত করে ফেলেনি। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যবহারও হয়তো তারা পরস্পরের প্রতি করতে পারেনি আর তা খুব অস্বাভাবিকও নয়। কিন্তু ভালোবাসা, ক্রোধ, রাগ বা ঘৃণা কোনো অনুভূতিকেই যে মানুষ, বিশেষ করে আধুনিক মানুষ চিরকাল সমানভাবে ধরে রাখে না, ধরে রাখতে পারেনা সেই সত্যই ব্যক্ত হয়েছে গল্পের মধ্যে। দোলার কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে প্রণব গেছিল ডুয়ার্সে চাকরি করতে কিন্তু বন্ধুর অনুপস্থিতির সুযোগে অসিত দোলাকে বিবাহ করে এবং তা ঘটে দোলার সম্মতিতেই। বন্ধু ও প্রেমিকার এই বিশ্বাসঘাতকতায় আহত হয়ে প্রণব কিছুকাল বিবাগী বাউণ্ডুলে জীবন কাটানোর পরে ধাতস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে পদার্পণ করেছে। জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে বিবাহ করেছে প্রণব এবং যমজ সন্তানের পিতাও হয়েছে। দুই বন্ধুর বন্ধুত্ব দোলার বিবাহের পর শত্রুতায় পর্যবসিত হয়েছিল, দেখা হলে প্রবল বিতৃষ্ণায় তারা পরস্পরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে । কিন্তু এই বিরূপতাকে তারা ধরে রাখতে পারেনি,তাই অসিত পূর্বের বন্ধুত্ব লাভ করবার জন্য এগিয়ে এসেছে প্রণবের দিকে, আর প্রণবও প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে সেই ডাকে সারা দিয়েছে। পূর্বস্মৃতি তাড়িত করলেও আধুনিক সুসভ্য পরিশীলিত মানুষ তাকে দাবিয়ে রেখে সৌজন্য ও ভদ্রতাবোধকে জয়ী করেছে। কারণ বর্তমান যুগে— "সেই প্যাশন্ আর কোন কিছুর মধ্যে নেই। না প্রেমে না বন্ধুত্বে না হিংস্র শত্রুতায়।" কারণ— "আলস্য, ঔদাস্য আর জড়তা সব ঢেকে দিয়েছে।" কোনো অনুভূতি কোনো সংরাগকেই মানুষ তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন বলে আর টেনে নিয়ে যেতে পারছেনা। তাকে আলস্য গ্রাস করছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে মানুষ সব কিছু ভুলে গেছে। তাই প্রণব নিমন্ত্রিত হয়েও সময়মতো অসিতের বাড়িতে আসছে না দেখে—" অসিতের ছটফটানির শেষ নেই।" যখন অসিত জানতে পেরেছে প্রণব অভিমান বা পূর্বের প্রতারণাকে বিস্মৃত হতে না পারার কারণে নয় বরং শারীরিক অসুস্থতার জন্যই আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেনি, তখন সে মানসিকভাবে শান্তি লাভ করেছে— " কারো অসুখ হয়েছিল শুনে এত সুখী অসিত বোধ হয় আর কখনো হয়নি।'

তাই পূর্বস্মৃতির তাড়না আছে, পূর্ব অভিজ্ঞতার অস্বস্তিকর অনুভূতি আছে কিন্তু সেই পূর্ব আবেগের তীব্রতা নেই, পূর্ব অনুভূতির উন্মাদনা নেই। তাই— " তখনকার মধুর আর তিক্ত মৃদু আর

তীব্র অনুভূতিগুলিও যেন তেমনি এক অপরিচয়ের আবরণে আচ্ছন্ন।" মানুষগুলিও যেন সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে পৃথক মানুষে পরিণত হয়েছে, মনে এবং মানসিকতায়। তাই অসিতের মনে হয়েছে, যে দোলা তার গৃহিণী, সে যেন সেই পূর্বেকার দোলা নয়, সে নিজেও যেন আগের সেই অসিত নয়। শুধু অসিত নয়, অসিত ও প্রণব উভয় বন্ধুই এই একই মানসিকতার অধিকারী। প্রকৃতপক্ষে কেবল অসিত ও প্রণব নয় বর্তমান বিশ্বের সকল মানুষই এই উদাসীনতার শিকার। অসিত ও প্রণবের ভাবনা ও চিন্তা একই দিকে ধাবিত হয়েছে আর সেই সূত্রে গল্পের নামকরণ 'অভিন্নহৃদয়'ও সার্থক হয়ে উঠে। গল্পের শেষাংশে একটি সংলাপে এই আচ্ছন্ন কালের বৈশিষ্ট্য যেমন সার্থক ভাবে ফুটে উঠেছে তেমনি গল্পের মনস্তত্ত্বটিকেও প্রকাশ করেছে—

" 'তখন বোধহয় তুই আমাকে খুন করে ফেলতে পারতিস।'

প্রণব অন্যমনস্কের মত বলল, তা পারতাম।'

অসিত বলল, ' আর এখন?'

প্রণব বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল। তারপর হেসে বলল, ' এখন পিনের খোঁচা দিতেও আলস্য লাগে।' "

নরেন্দ্রনাথের মনস্তাত্ত্বিক গল্পের ধারায় 'জৈব' গল্পটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে পৌষ সংখ্যা 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এর পূর্বে আলোচিত দুটি গল্পের সঙ্গে এ গল্পের কথনরীতির পার্থক্য আছে।এই গল্পটি উত্তম পুরুষ কথনরীতির, আর এই গল্পের কথক চরিত্রটি কাহিনির একজন চরিত্র বটে কিন্তু ঠিক অন্তর্বৃত বা Involved চরিত্র নয় বরং সাক্ষীচরিত্র ফলে গল্পের প্রধান দুটি চরিত্রের মন-মনস্তত্ত্বের অন্তরঙ্গ ব্যাখ্যান গল্পে নেই কিন্তু চরিত্রদের বাহ্যিক আচরণ ও সামান্য সংলাপই তাদের জটিল মনস্তাত্ত্বিক সংকটটি আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত করে।

গল্পের সূচনা হয়েছে একটু অদ্ভুত ভাবে। রেডিওতে প্রচারিত একটি বক্তৃতার অংশবিশেষ শুনে লেখকের বন্ধু ডাক্তার বাসব একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন এবং সেই বক্তৃতা শুনে বক্তৃতাকারীর স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া আন্দাজ করে দুঃখ পেয়েছেন। ডাক্তারবাবুর এই প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে একটি গল্প শোনাবার পরিবেশ গড়ে উঠেছে এবং গল্পের মূল কাহিনি এই ডাক্তারবাবুর জবানিতে উঠে এসেছে।

দেশভাগ-পরবর্তী ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট স্কলার ও কলেজের অধ্যাপক মৃগাঙ্ক মজুমদারের স্ত্রী লাহোরে আত্মীয় বাড়িতে ছিলেন। সেখানেই দাঙ্গার সময় দুষ্কৃতিরা তাকে নিগ্রহ করে। দীর্ঘ তিনমাস পরে তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়, কিন্তু শারীরিক নিগ্রহের ফলে তিনি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ও অবাঞ্ছিত গর্ভ সঞ্চারের ফলে এক তীব্র অশুচিতার অনুভূতি মৃগাঙ্কবাবুর স্ত্রী সুদত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। যে কোনো মূল্যে তিনি তার এই গর্ভস্থ শিশুকে

জন্মদান থেকে বিরত থাকতে চান। যে মাতৃত্ব-যে কোনো মায়ের কাছে গর্ব ও কাঙ্ক্ষিত বস্তু সেই মাতৃত্বের কারণে সুদত্তা মানসিক রোগী বা ' আধা- হিষ্টেরিক' অবস্থায় পৌঁছে গেছেন, যেহেতু এ মাতৃত্ব কাঙ্ক্ষিত নয়, দুষ্কৃতীদের দুষ্কর্মের ফল। চার মাসের গর্ভাবস্থা থাকায় কোনো ডাক্তার সুদত্তাকে এই অবস্থা থেকে মুক্তি দান করতে সম্মত হয়নি, কিন্তু সুদত্তা বেপরোয়া হয়ে গেছে, এমনকি মৃত্যুও তার কাছে এই মাতৃত্ব অপেক্ষা অধিক কাঙ্ক্ষিত বলে বোধ হয়েছে। লেখক সুদত্তার মানসিক অবস্থাকে বর্ণনা করেছেন এই ভাবে— " 'জীবনের Risk' যেন অসহায় ভাবে আর্তনাদ করে উঠলেন সুদত্তা,' আপনি তো জানেন না প্রতিমুহূর্তে পলে পলে আমি কি ভাবে দগ্ধ হয়ে মরছি। সব সময়ের জন্য গা ঘিন ঘিন করছে আমার, গা বমি বমি করছে। খেতে শুতে উঠতে বসতে কাঁটার মত বিঁধছে আমাকে। আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছিনা, কিছুতেই না। দয়া ক'রে আপনি আমাকে বাঁচান। অশুচিতার হাত থেকে রক্ষা করুন। চিরকালের জন্য কতৃজ্ঞ হয়ে থাকব আপনার কাছে।"

নিজের নারীত্বের চূড়ান্ত অপমানের সাক্ষীহিসেবে সুদত্তা মনে করেছে তার গর্ভস্থ শিশুকে। ডাক্তারী শাস্ত্রে কিছু সুবিধে না হওয়ায় সে নিজের শরীরের উপর চরম অনিয়ম ও নিপীড়ন করেছে। ডাক্তারের কাছে নিজের ঘৃণা, বিতৃষ্নাকে প্রকাশ করেছে এমনকি যেনতেন প্রকারে ভ্রূণ হত্যার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অজ্ঞান পিসী শাশুড়ী যখন সুদত্তার সাধের আয়োজন করেছেন, তখন সুদত্তা অনুষ্ঠানের সকল উপকরণ সবার অলক্ষে নর্দমায় ছুড়ে ফেলেছে, এই অনুষ্ঠান তার কাছে নিজের অপমান বলে বোধ হয়েছে। সকল প্রচেষ্টার পরেও যখন সুদত্তা তার সেই অবাঞ্ছিত শিশুকে জন্ম দিতে বাধ্য হয়েছে তখন জন্মাবার পরেই সেই নবজাতককে পরিত্যাগ করবার বন্দোবস্ত করেছে সে, নার্সদের টাকা দিয়ে সেই শিশুকে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেছে।

কিন্তু মানুষের মনস্তত্ত্ব যে অতীব জটিল, কোনো সহজ সূত্র যে সেই মনস্তত্ত্বকে ব্যাখ্যা দিতে পারেনা সেই কথা পুনরায় প্রমাণিত হয়ে গেছে । যে সন্তান সুদত্তার কাছে ছিল মূর্তিমান বিভীষিকার মত, সেই সন্তানের জন্মের পর সুদত্তা স্বাভাবিক মাতৃত্বের অনুভূতিই লাভ করেছে, ঘৃণা রূপান্তরিত হয়েছে বাৎসল্য রসে, অপমানের বোধ রূপান্তরিত হয়েছে গর্বিত মায়ের উপলব্ধিতে। লেখক সুদত্তার এই মানসিক পরিবর্তনকে বর্ণনা করেছেন এই ভাবে— " ... সুদত্তা অপলকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন সন্তানকে। তাঁর চোখে ঘৃণা নেই, দ্বেষ নেই, অস্বস্তি অশান্তির চিহ্ন মাত্র নেই। গভীর শান্তি আর পরিতৃপ্তিতে সুদত্তার মুখ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, সুন্দর আর প্রশান্ত।" মৃগাঙ্কবাবুরও মনে হয়েছে এই সন্তান গ্রহণে কোনো জটিলতা নেই কারণ—"মাতৃত্ব সব চেয়ে সহজ, সব চেয়ে প্রাঞ্জল।"কাহিনির এই পর্যন্ত এসে দেখা যায় যে মাতৃত্বের অনুভূতি ও মুক্তিতে নারীর মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু শুধু এই কারণেই গল্পটির মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার দিকটি সমাপ্ত হয়নি বরং এর পরেই গল্পের প্রকৃত জটিলতায়

গ্রন্থি পড়েছে। সন্তান জন্ম নিয়ে সুদত্তার এতদিনের অস্বস্তির অবসান ঘটছে আর এই সন্তান জন্মাবার পর শিশুটিকে নিয়ে মৃগাঙ্ক মজুমদার আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। এখানে তার ভূমিকা স্নেহময় পিতার নয় বরং নির্মোহ বৈজ্ঞানিকের। এখন গল্পের সূচনায় যে বক্তৃতাটি মৃগাঙ্ক মজুমদার রেডিওতে বলেছেন তা উদ্ধার করা যেতে পারে— "... সুতরাং হেরেডিটি বা বংশানুক্রমণ সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে যে প্রচলিত ধারণা আছে তার ভিত্তি এবং সত্যতা আমাদের বিচার ক'রে দেখতে হবে। প্রকৃতপক্ষে পিতা মাতা এবং ঊর্ধতন পিতৃকুল মাতৃকুলের শারীরিক গঠন বিন্যাস থেকে শুরু ক'রে মানসিক গুণাগুণ, বৃদ্ধি-প্রবৃত্তির কতখানি অংশ বংশানুক্রমের সূত্রে উত্তরপুরুষে এসে পৌঁছতে পারে, আবার পারিপার্শ্বিক প্রভাব—মানে প্রাকৃতিক আবহাওয়া, পারিবারিক শিক্ষা-দীক্ষা, রীতি-নীতি, বন্ধু-বান্ধবের সাহচর্যই বা সেই বংশানুক্রম ও মানুষের জীবনযাত্রাকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে ..."— এই বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলার, কলেজের প্রফেসর মৃগাঙ্কবাবু প্রকৃত পক্ষে অনুসন্ধান করেছেন মানুষের মধ্যে তার বংশানুক্রম ও পারিপার্শ্বিক কোনটির প্রভাব অধিক সেই বিষয়টি। এই বিষয়ে তার গবেষণার সামগ্রী আর কেউ নয় তারই স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান, যার মা সুদত্তা কিন্তু পিতা অন্য কেউ, আর সেই অজ্ঞাত পিতার বংশানুক্রমকে সুদত্তার গর্ভজাত সন্তান কী প্রকারে বহন করে চলেছে সেইটিই মৃগাঙ্কের আগ্রহের বিষয়। সুদত্তার সন্তান বিশু বা বিশ্বেশ্বরের প্রতি মৃগাঙ্ক কোনো অবহেলা করেননা, পিতার সকল দায়িত্ব পালন করেন, দিনে তিন চার বার তার খোঁজ নেন, কোলে ক'রে আদর করেন, চুম্বন করেন। দামি পোষাক, দামি খাদ্য, দামি খেলনা কোন কিছুরই অভাব রাখেননি তিনি। কিন্তু এত কিছুর পরেও বিশ্বেশ্বর তার কাছে গবেষণার উপাদান মাত্র, সন্তানের বাৎসল্য অপেক্ষা বিশুর প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশি এক বৈজ্ঞানিকের। বৈজ্ঞানিক যেমন গিনিপিগের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন, তেমনি বিশুও তার কাছে এক গিনিপিগ বিশেষ। তাই বিশুকে আদর করেন আর তার পরেই বিশুকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ ক'রে পকেটবুকে নোট করেন। সুদত্তা মৃগাঙ্কের এই মানসিকতাকে সহ্য করতে পারেন না। পিতা যেই হোক না কেন সুদত্তা বিশুর মা আর মা হয়ে নিজের সন্তানকে অন্যের পরীক্ষা নিরীক্ষার উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হতে দিতে তার প্রবল আপত্তি। এই মানসিকতা থেকেই পুনরায় গর্ভবতী সুদত্তা তার গর্ভকে বিনষ্ট করতে চেয়েছে। এবার সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে কোন জটিলতা নেই, কোন অশুচিতার ভাব নেই কিন্তু এই সন্তান জন্ম নিলে সেই সন্তানও হবে মৃগাঙ্কের পরীক্ষার উপাদান। সুদত্তার আশঙ্কা এই সন্তান ও বিশুকে নিয়ে তুলনামূলক নিরীক্ষায় মাতবে মৃগাঙ্ক আর সুদত্তা সমস্ত জেনেশুনে তার বৈজ্ঞানিক স্বামীকে 'কম্প্যারেটিভ স্টাডির মেটেরিয়াল জোগাতে' চায় না।

এই ভাবে দেখা যায় গল্পে মৃগাঙ্কের বিচিত্র মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে।গল্পের কুশীলবদের নির্মাণের মধ্য দিয়ে লেখকের মানব মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে গভীর বোধেরই পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি গ্রামের

নিম্ন শ্রেণির মানুষ কিংবা দরিদ্র মুসলমান চরিত্রের সূক্ষ্ম মানসিকতা সম্পর্কে যেমন জ্ঞাত ছিলেন, তেমনই নগরবাসী মধ্যবিত্তশ্রেণির মানুষের মনের গহন- গভীর দিক, তার দ্বন্দ্ব জটিলতার নানা মাত্রা সম্পর্কেও ছিলেন অবহিত।

ছোটগল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রেমচেতনা ঃ

নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর 'গল্পলেখার গল্প' - এর শেষে বলেছেন— "নিজের স্বভাবকে বুঝে নিয়ে, নিজের প্রবৃত্তি আর প্রবণতাকে স্বীকার করে আমি সারা জীবন শুধু ভালোবাসার গল্পই লিখেছি। সে ভালোবাসা হয়তো সঙ্কীর্ণ অর্থে ভালোবাসা, সীমিত অর্থে ভালোবাসা। তবু তা ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু নয়।"[৮] তাঁর এই প্রেমচেতনার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর নরনারীর পারস্পরিক আকর্ষণ প্রকাশক গল্পে বা এক কথায় তাঁর রচিত প্রেমের গল্পগুলিতে।

এই শ্রেণির গল্পগুলির মধ্যে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হল 'চাঁদমিঞা' গল্পটি। 'দিগন্ত' পত্রিকায় ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের বার্ষিক সংখ্যায় গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়। সর্বজ্ঞ রীতিতে রচিত এই গল্পটির কাহিনি অংশের কথক লেখকের বন্ধু মসিয়র। একদিন রেঁস্তোরায় জলখাবার খেতে খেতে মসিয়র তাঁর বাবার আপন চাচা জমিদার নশরৎ আলী মৃধার জীবনের একটি কাহিনি লেখককে শোনান— এই ভাবে অন্য একটি চরিত্রের জবানিতে কথকতার ভঙ্গিতে গল্পের কাহিনি অংশের সূচনা।

এই গল্পে যে প্রেম সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তাতে প্রধান স্থান নশরৎ আলীর নয় বরং তার জন্য গল্পটিতে ত্রিকোণ প্রেমের বাতাবরণ গড়ে উঠেছে। মীরপুর ও তার আশেপাশের পাঁচ-সাতটি গ্রামের জমিদার নশরৎ আলীর একমাত্র অভাব ছিল সন্তানের। ধন-দৌলৎ, লোক-লস্কর, পাইক-পেয়াদা পরিপূর্ণ জমিদারিতে এই একটি মাত্র শূন্যতা সর্বগ্রাসী আকার নিয়ে জমিদারকে গ্রাস করেছিল। কিন্তু এই অপ্রাপ্তির বেদনাকে দূর করবার জন্য নশরৎ আলীর প্রচেষ্টার অভাব ছিলনা। একের পর এক বিবি তিনি ঘরে এনেছেন কিন্তু ইপ্সিত ফল লাভ হয়নি।— " ছেলে তো ভালো, একটি কানা মেয়ের মুখ পর্যন্ত মৃধা সাহেব দেখতে পারেন নি।" ক্রমে কেবল ফকির দরবেশদের কেরামতির উপরই নয় স্বয়ং খোদার অস্তিত্বের উপরই আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন বৃদ্ধ নশরৎ আলী। কিন্তু সহসা সেই বিশ্বাসের পুনঃজাগরণ ঘটেছে তার অন্তরে আর এই জাগরণের কারণ এক ফকির। কিন্তু এই আইনুদ্দিন ফকিরের কোনো মন্ত্রতন্ত্রের কেরামতি এতে জড়িত নেই। এই আস্থা ফিরিয়ে দিয়েছে তার অষ্টাদশী কন্যা রাবেয়া। অপরূপ সুন্দরী রাবেয়াকে আইনুদ্দিন ফকিরের জীর্ণ কুটিরে নামাজ পড়তে দেখে নশরৎ আলী মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাকে মুগ্ধ করেছিল রাবেয়ার রূপ-সৌন্দর্য ও তার অপরূপ আত্মনিবেদনের ভঙ্গিমাটি। রাবেয়ার আন্তরিক সম্মতি ছাড়াই বৃদ্ধ বয়সে তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন নশরৎ আলী। কিন্তু

রাবেয়ার দুর্জ্ঞেয় মনের নিশানা বৃদ্ধ নশরৎ আলী খুঁজে পাননি। রাবেয়ার দেহের রূপ, কণ্ঠের মাধুর্য, স্পর্শের আবিলতা সমস্ত কিছুই মূল্যহীন হয়ে গেছে তার হৃদয়ে নশরৎ এর স্থান না পাবার জন্য। কিন্তু নশরৎ আলী রাবেয়ার মন পেতে চেষ্টার ত্রুটি করেননি। তার সমস্ত সম্পদকে তিনি উজার করে দিয়েছেন রাবেয়ার পায়ের কাছে। নশরতের সমস্ত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও একদিন রাবেয়ার মন "বেহেস্ত থেকে একেবারে ধূলামাটির দুনিয়ায় নেমে এসেছে।" তার মুখে হাসি দেখা দিয়েছে,সে নিজে চুন হলুদ-গরম করে আহত ব্যক্তির সেবা করেছে কিন্তু সে আহত ব্যক্তি নশরৎ আলী নন বরং তারই ঘোড়ার যুবা ও সুপুরুষ সহিস চাঁদমিঞা। সেই চাঁদমিঞা নশরৎ আলীর প্রাসাদের জানালায় দাঁড়ানো রাবেয়াকে দেখে, তার রূপের ছটায় বিহ্বল হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গেছে। এই প্রথম দর্শনেই উভয়ের মধ্যে প্রণয়ের সঞ্চার হয়েছে এবং যার ফল হয়েছে মারাত্মক। যখন নশরৎ আলী অনুভব করেছেন যে,তার সামর্থ্য, তার খ্যাতি, তার ঐশ্বর্য, তার সম্পদ রাবেয়াকে মুগ্ধ করতে পারেনি, তার চোখকে ঝলসে দিতে পারেনি, বরং তাকে মুগ্ধ করেছে,"তারই দীনাতিদীন অনুচরের দেহসৌষ্ঠব", তখন তা তিনি সহ্য করেননি। রাবেয়ার প্রতি অনুরক্ত চাঁদমিঞা ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় জিতে ঘুমন্ত ঘোড়াকে প্রেমাবশে 'রাবেয়া রাবেয়া' বলে ডাকছিল। তীব্র অসূয়াআক্রান্ত নশরৎ আলী সেই অপরাধে চাঁদমিঞার সর্বাঙ্গ চাবুকের নির্মম আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছেন। বিশেষ করে তার অনিন্দ্য সুন্দর মুখশ্রীকে চাবুকের উপর্যুপরি আঘাতে করে তুলেছেন বীভৎস-কদাকার। এই করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, চাঁদমিঞাকে তিনি গুপ্ত কুঠুরিতে আটকে রেখেছেন। রাবেয়ার প্রতিও তীব্র প্রতিহিংসাবশত নশরৎ আলী তাকে নিয়ে গেছেন চাঁদমিঞার কাছে, তার ক্ষতচিহ্ন দেখাবার জন্য। চাঁদমিঞার বিকৃত মুখশ্রী দেখে শিহরিত হয়েছে রাবেয়া। কিন্তু প্রেমের শক্তি, অত্যাচার পীড়ন বা দম্ভের সামনে মাথা নোয়ায়নি।তাই রাবেয়া নশরৎ আলীর অলক্ষে একা ঔষধের ঝাঁপি নিয়ে নেমে গেছে চাঁদমিঞার অন্ধকার কুঠুরিতে। রাবেয়া চাঁদমিঞার ক্ষতস্থানে ঔষধ লাগিয়ে দিয়েছে, শুধু তাই নয়, নিজের হাতের অঙ্গুরীয় চাঁদমিঞার আঙুলে পড়িয়ে দিয়ে তার প্রণয়ের স্বীকৃতি জানিয়েছে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি, নশরৎ আলী এই দৃশ্য দেখে ফেলেছেন এবং স্বাভাবিক ভাবেই তা কোনোমতেই সহ্য করেননি। নিজহাতে তিনি রাবেয়াকে হত্যা করেছেন এবং পরদিন নিজের প্রভাব প্রতিপত্তির বলে হৃদযন্ত্র স্তব্ধ হয়ে রাবেয়ার মৃত্যু হয়েছে বলে প্রচার করে তাকে কবরস্থ করেছেন।

এইখানে গল্পটি সমাপ্ত হতে পারত, কিন্তু মানুষের মৃত্যুতেও যে প্রেমের মৃত্যু হয় না—এই বাণীই যেন গল্পকার ঘোষণা করতে চেয়েছেন। তাই গল্পটি নিছক একটি প্রেমের গল্প হয়ে থাকেনি বা জরার উপর যৌবনের জয়গান রচনা করেই সমাপ্ত হয়নি বরং কিছুটা দৈবিক মহিমা লাভ করেছে। রাবেয়াকে নিজের হাতে হত্যা করার পর চাঁদমিঞাকে হত্যা করতে কৃতসংকল্প হলেও শেষ পর্যন্ত

নশরৎ আলী চাঁদমিঞাকে হত্যা করতে পারেননি। আশ্চর্যের ব্যাপার হলেও শেষ জীবনে এই চাঁদমিঞাই হয়ে উঠেছিল নশরৎ আলীর সর্বাধিক প্রিয়পাত্র এবং তাদের প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কও মুছে গিয়ে এক "গভীর সৌহার্দের সৃষ্টি হয়েছিল"। একদা প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি প্রবল প্রতিহিংসা পরায়ণ নশরৎ আলীর এই ব্যবহার দুর্বোধ্য মনে হলেও কথক মসিয়র এই ব্যবহারের একটি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, চাঁদমিঞার হাতে রাবেয়া যে আংটি পড়িয়ে দিয়েছিল সেই আংটির দিকে তাকিয়েই নশরৎ আলী আর চাঁদমিঞাকে হত্যা করতে পারেননি। এই আংটি ছিল রাবেয়ার স্মৃতিচিহ্ন। এই স্মৃতিচিহ্নের ধারককে নশরৎ আলী হত্যা করেননি। এছাড়া চাবুকের আঘাতে বিকৃত চাঁদমিঞার ক্ষতস্থানের উপর রাবেয়া যেখানে তার নিজের হাতের স্নেহস্পর্শ রেখেছিল— সেই স্পর্শের শেষ উত্তাপটিও নশরৎ আলী চাঁদমিঞার মাধ্যমে রক্ষা করতে চেয়েছেন। ফলে তার প্রিয়তমার প্রিয়কে তিনি জীবনদান দিয়ে নিজের প্রিয়তমার স্মৃতিকেই অন্তরে চির জাগরূক করে রাখতে চেয়েছিলেন। মৃত রাবেয়ার জীবন্ত স্মৃতিচিহ্ন হ'ল চাঁদমিঞা, তাই সেই স্মৃতিকেই নশরৎ আলী আজীবন আঁকড়ে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। এইভাবে একটি পুরানো স্মৃতি রক্ষিত ভালোবাসা, প্রেম-মনস্তত্ত্বের অসামান্য রূপকার নরেন্দ্রনাথের হাতে দৈবী মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। প্রেমের শক্তি অলৌকিক আর এই অলৌকিকতাই বিশিষ্ট মহিমায় উজ্জ্বল করেছে 'চাঁদমিঞা' ছোটগল্পটিকে। প্রেম অপার্থিব এবং এই অপার্থিব সম্পদের কাছে পার্থিব সকল সম্পদই তুচ্ছ হয়ে যায়, এই বাণীটিই উচ্চারিত হয়েছে গল্পে। গল্পের থেকে কয়েকটি পংক্তি এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করা যেতে পারে। প্রথমেই নশরৎ আলীর কথা বলা যায়, যখন রাবেয়াকে তিনি দেখেন তারপর থেকে তার চরিত্রে পরিবর্তন দেখা যায়— "আল্লার দুনিয়াকে তিনি যেন নতুন চোখে দেখতে শুরু করলেন।" রাবেয়াকে বিবাহের পর তার মানসিকতার দুস্তর পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এতদিন তার একের পর এক বিবাহের উদ্দেশ্য ছিল সন্তান লাভ। কিন্তু রাবেয়াকে তিনি সত্য সত্যই ভালোবেসেছিলেন, তার রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন, প্রেমের অনির্বচনীয়তাকে অনুভব করেছিলেন। তাই রাবেয়াকে তিনি একদিন বলেন— "রাবেয়া, এতকাল ছেলে ছেলে ক'রে পাগল হয়ে বেড়িয়েছি। ভেবেছি স্বামীর কোলে ছেলে ধ'রে দিতে না পারলে স্ত্রীর রূপ বৃথা, তার যৌবন বৃথা, তার মেয়ে জন্মটাই অর্থহীন। কিন্তু তোমাকে দেখে আমার সে ভুল এতদিনে ভেঙেছে। শুধু তুমিই যথেষ্ট। তুমি যে আছ এই সব চেয়ে বড় লাভ, পুত্র লাভ এর কাছে তুচ্ছাতিতুচ্ছ। তোমার কাছে আলাদা ক'রে আমি কিছু চাই না, ছেলে নয়, মেয়ে নয়, আমি কেবল তোমাকেই চাই।" একই রকম ভাবে রাবেয়াও প্রেমের অলৌকিক শক্তির সাক্ষাৎ পেয়েছে। চাঁদমিঞা যে গোপন কুঠুরিতে যন্ত্রণাদীর্ণ অবস্থায় আবদ্ধ রয়েছে সেখানে ঔষধ রূপ গাছ গাছড়া নিয়ে যাবার সময় রাবেয়ার মানসিক অবস্থার বর্ণনায় লেখক সেই শক্তির পরিচয় দিয়েছেন—" আর কোন ভয় নেই, কোন শঙ্কা নেই, অদ্ভুত সাহস এসেছে রাবেয়ার মনে।

গাছড়ার ঝাঁপিতে হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন অলৌকিক দৈবশক্তি সে হাতে পেয়েছে। খোদার নির্দেশ শুনতে পেয়েছে হৃদয়ের মধ্যে সারারাত।"

—এই ভাবে 'চাঁদমিঞা' একটি সার্থক রোমান্টিক প্রেমের গল্প হয়ে উঠেছে। হয়তো এ গল্প বিয়োগান্তক কিন্তু এক ভিন্নতর অপার্থিব মিলনের ইঙ্গিতে উজ্জ্বল।

প্রেমের এমন অপার্থিব মহিমার পরিচয় আমরা এমনভাবেই পাই 'চেক' গল্পে। এই গল্পে সুবিমল ও সরসী দত্তের প্রেম সমস্ত সামাজিক ভ্রূকুটি ও অর্থের হাতছানিকে উপেক্ষা করে জয়যুক্ত হয়েছে। 'চাঁদমিঞা' গল্পের সঙ্গে এই গল্পের একটি সাদৃশ্যহল এর রচনাভঙ্গি। এখানেও লেখক ভিন্ন এক কথকের জবানিতে গল্পের কাহিনিকে উপস্থাপন করেছেন। তবে 'চাঁদমিঞা'র সঙ্গে এ গল্পের বৈসাদৃশ্যও প্রচুর, এই বৈসাদৃশ্যের মধ্যে অন্যতম হল এর কাহিনির পরিসমাপ্তি। এই পরিসমাপ্তি 'চাঁদমিঞা' গল্পের মতো বিয়োগান্তক নয় বরং মিলনান্তক। তবে গল্পের রচনাভঙ্গি ছাড়াও 'চাঁদমিঞা'এর সঙ্গে এ গল্পের মূল ও সবচেয়ে বড় সাদৃশ্য এর বিষয়বস্তুতে। এর বিষয়বস্তুর কেন্দ্রেও আছে প্রেম এবং যে প্রেম পার্থিব সকল বস্তুর আকর্ষণকে অগ্রাহ্য করে । একটি দশহাজার টাকার চেককে ছিঁড়ে ফেলে গল্পের নায়ক সুবিমল যেন গল্পের নায়িকা সরসীর অতীত পদস্খলনকেই ছিঁড়ে ফেলেছে এবং তারপর যুগল প্রেমের স্রোতে ভেসে গিয়েছে।

অনবদ্য এই প্রেমের গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে, 'দিগন্ত' পত্রিকার পূজা সংখ্যায়। লেখকের একটি চেক লেখার ঘটনায় গল্পকথক পরিতোষবাবুর আরেকটি চেকের গল্প মনে পড়েছে এবং সেই চেককে ঘিরেই এই রোম্যান্টিক গল্পের সূচনা। গল্পটির শ্রেণি নির্ণয়ে লেখকই সহায়তা করেছেন। গল্পের প্রথমেই তিনি গল্প কথককে জিজ্ঞাসা করেন—"রোম্যান্টিক কাহিনী- টাহিনী নাকি।" উত্তরে গল্প কথক পরিতোষবাবু বলেন—" না মশাই রীতিমতন রিয়্যালিস্টিক। অবশ্য শুরু হয়েছিল রোম্যান্টিক ধরনেই।" যে গল্পের সূচনা 'রোম্যান্টিক ধরনের' এবং কাহিনির শেষ অংশ রচিত হয়েছে নায়ক নায়িকার মিলন বর্ণনায় সে গল্প অবশ্যই প্রেমের গল্প এবং নরেন্দ্রনাথের রচনা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সে গল্প 'রিয়্যালিস্টিক'ও বটে।

'চেক' গল্পের নায়ক সুবিমল এক সদাগরী অফিসের চাকুরে, 'স্ত্রী ভূমিকা- বর্জিত' সেই অফিসে সহসা এক পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। এই পরিবর্তনে অফিসের সবার 'হৃদয় চঞ্চল' ও 'চক্ষুস্থির' হয়ে গেল। এর কারণ এক মহিলা টাইপিস্টের আগমন। অফিসের সকলে এই মহিলার আগমনে যতখানি চঞ্চল ও অধীর হ'ল, সুবিমল ততটা হ'ল না। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে দেখা গেল অফিসের সহকর্মীদের সমবেত গুঞ্জন ও কৌতূহলী দৃষ্টিকে দূরে সরিয়ে রেখে সুবিমল ও সেই মহিলা টাইপিস্ট সরসী দত্তের বাড়ি ফেরার পথটি ও বাহনটি এক হয়ে উঠেছে। যদিও উভয়ের বাড়ি ভিন্ন দিকে, ভিন্ন রাস্তায়।

কাহিনির এই অংশ পর্যন্ত গল্পটি একটি সাধারণ অফিস প্রেমের গল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে এবং কোন জটিলতার আভাস পাওয়া যায় নি। কিন্তু এর পরেই গল্পের গ্রন্থিতে গিঁট পড়েছে। সুবিমল ও সরসীর সম্পর্ক সুন্দর, স্বাভাবিক ও মধুর হয়ে উঠেছে, সুবিমলের মনে হয়েছে— "আগের চেয়ে অনেক সপ্রতিভ হয়েছে সরসী, অনেক প্রগলভা। দু'জনের কাছে কোথাও আর কিছু দুর্বোধ্য নেই। সব স্পষ্ট, সব প্রাঞ্জল। কোন জট নেই তার জীবনে, কোন জটিলতা নেই।" এইটুকু ভূমিকা করেই গল্পকার তাদের প্রেমের নিরবচ্ছিন্নভাবে গড়ে ওঠার দিকটি বর্ণনা করেছেন। এর পর সুবিমল ও সরসীর প্রেমের সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তির আগমন ঘটেছে। এই আগমনের ভূমিকাও গল্পকার করে রেখেছেন, কোন আকস্মিকতার চমক দেননি— "কিন্তু সুবিমলের ভুল হয়েছিল। জীবন কি সত্যই অত সহজ, অত সরল, অত প্রাঞ্জল ? আর জট কি জীবনে দু'একটি ? জট অসংখ্য। জীবনের এক জট খোলে, আর এক জট জড়ায়। হৃদয়ের এক পাট খোলে, আর এক পাট বন্ধ হয়।"

একদিন সরসী দত্তের সাক্ষাৎ হয় তাদের কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে। কাহিনিতে যখন সুবিমল ও সরসীর আর্বিভাব হয়েছে তখন তাদের চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। একইভাবে কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজারেরও বর্ণণা আছে তার আবির্ভাবলগ্নে। তার বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় চেহারায় বর্ণনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও দুটি চরণ, যেখানে বলা হয়েছে—"সুবিমলের চাইতে অনেক সুন্দর,অনেক স্বাস্থ্যবান।" এবং "এখনো বিয়ে করেননি,ফলে নানারকমের কানা ঘুষা মাঝে মাঝে কানে আসে।" অর্থাৎ প্রথম আর্বিভাবেই তাকে সুবিমলের সঙ্গে তুলনা করে ও চারিত্রিক অসংযমের ইঙ্গিত দিয়ে সুস্পষ্ট ভাবেই গল্পে কাঙ্ক্ষিত জটিলতা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন লেখক। ইনক্রিমেন্ট না পাওয়ার নালিশ জানাতে গিয়ে প্রথম সাক্ষাতের পর সরসী জেনারেল ম্যানেজার নবনী চ্যাটার্জীর ঘর থেকে বের হয়েছে হাসতে হাসতে। মাইনে বৃদ্ধির সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গে তার যে আরও কিছু প্রাপ্তি হয়েছে তারও প্রমাণ পাওয়া গেল কিছু দিনের মধ্যেই। এরপর থেকে সুবিমলের সঙ্গে সরসীর দূরত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে, আর একের পর এক প্রলোভন ও সুবিধা দানের দ্বারা নবনী চ্যাটার্জী গ্রাস করেছে সরসীকে। সরসীর চালচলনের সঙ্গে সঙ্গে তার পোষাক পরিচ্ছেদেরও পরিবর্তন ঘটেছে। সাধারণ খোলের শাড়ির বদলে শোভা পেয়েছে দামি শাড়ি। হাত, কান ও গলার আভরণ-শূন্য স্থান গুলিও আর নিরাভরণ থাকেনি। কিন্তু এই অবস্থা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি, একটি বছর গড়াতে না গড়াতে সরসী ও নবনী চ্যাটার্জীর সম্পর্ক ভেঙ্গে গেছে। সরসী দত্তকে যথাসাধ্য ব্যবহার করে নিয়ে নবনী পরিত্যাগ করেছে তাকে। নবনী চ্যাটার্জী বিবাহ করেছে অন্যত্র এবং সেখানে গুরুত্ব পেয়েছে স্ত্রী প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক,অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রাপ্তির ভাণ্ডার। সরসী দত্ত চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। সুবিমলও চাকরি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র কাজের চেষ্টা করেছে। সরসীর জন্য তার অন্তরে শুধু রয়ে গেছে, 'ঘৃণা, বিদ্বেষ, প্রতিশোধস্পৃহা'। কিন্তু

আপাতদৃষ্টিতে যার প্রতি সামান্য মমতা, সামান্য দুর্বলতাও অবশিষ্ট নেই বলে মনে হয়েছে, যার প্রতি সুবিমল সম্পূর্ণ নির্মম, সম্পূর্ণ নিস্পৃহ বলে ভেবেছে নিজেকে, শেষ পর্যন্ত তার চিঠির আহ্বানে সুবিমল নিশ্চুপ থাকতে পারেনি। নিজের মনে ভেবেছে এই সাড়া দেওয়া কেবল কৌতূহল নিবৃত্তির প্রচেষ্টা মাত্র, কিন্তু তা কেবল নিজের মনকে প্রবোধ দেবার ছল মাত্র। সরসী যখন সুবিমলের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেছে তখন সুবিমল চরম অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে এবং জানতে পেরেছে নবনী চ্যাটার্জী ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সরসী দত্তকে দশহাজার টাকার ব্যাঙ্কচেক দিয়েছে এবং সরসী দত্ত সুবিমলের নামে সেই চেক এনডোর্স করে রেখেছে। প্রকৃত প্রেম ক্ষণস্থায়ী চটকের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে ভ্রান্ত পথে যাত্রা করেছিল বটে কিন্তু সম্পূর্ণ পথ হারাতে পারেনি। মোহভঙ্গ হবার পর, নিজেকে অসাধারণ রূপে সবার চোখে প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্নপূরণের পর সরসী তার প্রকৃত প্রেমকে খুঁজে পেয়েছে। অপরদিকে যে প্রেম সকল পার্থিব প্রাপ্তিকে অস্বীকার করতে পারে, প্রেমাস্পদের সমস্ত স্খলন, পতন, ত্রুটিকে ক্ষমা করে দিতে পারে, মানুষের সাময়িক পদস্খলনের বিপরীতে তার সমগ্র সত্তার মহত্বকে চিনে নিতে পারে, সেই প্রেমচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সুবিমল নিজের হাতের মুঠোয় পাওয়া দশহাজার টাকাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। দশহাজার টাকার চেক ছিঁড়ে ফেলে সে যেন নিজে তার প্রেমাস্পদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করেছে এবং তাকে গ্রহণও করেছে। এই গল্পের অবয়ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এটি একটি প্রচলিত ধারার প্রেমের গল্প, যেখানে প্রথম অংশে নায়ক নায়িকার পূর্বরাগ ও অনুরাগের কাহিনি বর্ণিত, মধ্যে খলনায়কের আর্বিভাব আর শেষাংশে রয়েছে খলনায়কের বিদায় ও নায়ক নায়িকার পুনর্মিলন। এই প্রচলিত ছকের মধ্যে ঢুকে পড়েছে একটি দশহাজার টাকার চেক এবং এই চেকের ছিন্ন হয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে সর্বজয়ী প্রেমের মহিমাকে নরেন্দ্রনাথ রূপদান করতে চেয়েছেন।

নরেন্দ্রনাথের প্রেমের গল্পের শ্রেণিতে 'চাঁদমিঞা' ও 'চেক' গল্প দুটি বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে কেমন করে তিনি এই শ্রেণির গল্পে সর্বত্যাগী, সর্বংসহা ও সর্ববিজয়ী প্রেমের জয়গান রচনা করেছেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের এমন প্রেমের গল্পও আছে যেখানে বাস্তবতার চাপে, বস্তুবাদীতার চাপে প্রেমের অপমৃত্যু ঘটেছে। এমনই দুটি গল্প হল—'চিলেকোঠা' ও 'একটি নাগরিক প্রেমের উপাখ্যান', এই গল্প দুটিতে প্রেমের অপমৃত্যু ঘটেছে বলতে বোঝাতে চেয়েছি যে এই গল্পগুলিতে প্রেমাস্পদদের পারস্পরিক মিলন সম্ভব হয়নি এবং তার জন্য দায়ি বস্তুবাদীতা —অর্থাৎ হৃদয়ের উপর মস্তিষ্কের প্রাধান্য লাভ। কিন্তু তবুও এগুলি প্রেমের গল্প। লেখকের ভাষায়—" সে ভালোবাসা হয়তো সঙ্কীর্ণ অর্থে ভালবাসা। তবু তা ভালবাসা ছাড়া আর কিছু নয়।"('গল্পলেখার গল্প')

প্রথমে 'একটি নাগরিক প্রেমের উপাখ্যান' গল্পটির আলোচনা করা যেতে পারে। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৭১ বঙ্গাব্দে, আনন্দবাজার পত্রিকার দোলসংখ্যায়। গল্পের নামকরণে 'নাগরিক'

শব্দটির উপস্থিতি এবং গল্পের নায়ক নায়িকার ভাবনাচিন্তার প্রবাহ তথা গল্পের পরিণতি ও লেখকের স্বরন্যাস (tone), গল্পে 'নাগরিক' শব্দটিকে ভিন্নমাত্রা প্রদান করেছে। গরিব বামুনের ছেলে সুরজিৎ ও ধনীর দুলালী বিপাশার দীর্ঘ আট বছরের প্রেম পরিণয়ের কাঙ্ক্ষিত পরিণতিতে পৌঁছায়নি। সুরজিৎ কলেজে চাকরি পেয়েছে বটে কিন্তু কোনোদিনই বিপাশার জন্মগত ভাবে লব্ধ আভিজাত্য, অর্থকৌলীন্য, রুচি ও সৌন্দর্যের সমগোত্র হতে পারেনি। তার অশিক্ষিত মা, অর্ধশিক্ষিত দিদিদের সংসারে বিপাশাকে বেমানান বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। তাই সেই সম্ভাবনাকে বিপাশা সমূলে উৎপাটিত করতে চেয়েছে। কলেজে পড়বার সময় বহু ছেলে বন্ধুদের মধ্য থেকে সুরজিৎকে বিপাশা বেছে নিয়েছিল। তার কারণ ছিল সুরজিৎ-এর বিদ্যাবত্তা, সততা আর চরিত্রমাধুর্য। সুরজিৎ-এর আর্থিক অবস্থা, তার দারিদ্র্যের বিবরণ বিপাশার কাছে অজানা ছিলনা, কিন্তু বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি তার আনুগত্যের কারণে সে চেয়েছে এই অর্থনৈতিক বৈষম্যকে অস্বীকার করতে। সুরজিতের প্রতি তার আকর্ষণের অন্যতম কারণও ছিল এক বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের স্বপ্ন। লেখকের বিশ্লেষণ এই রকম — "সুরজিৎ লিখতে জানে না, গাইতে জানে না ,ছবি আঁকতে জানে না। কিন্তু স্বপ্ন দেখতে জানে। আদর্শের স্বপ্ন সামাজিক বৈষম্য বিলোপের স্বপ্ন, নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের উত্থানের সহায়তার সঙ্কল্প। বিপাশা দেখেছে, সুরজিৎ শিল্পী নয়,কিন্তু বিদ্রোহী। সেই বিদ্রোহ দাউ দাউ করে জ্বলে না, দীপশিখার মত জ্বলে। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে বড় হয়েছে সুরজিৎ। দারিদ্র্যের অভিশাপের কথা সে জানে। তার অবসান চায়। বিপাশা দেখেছে, সুরজিৎ শিল্পী নয়, কিন্তু সৎ। তার সততাই এক শিল্প। তার চরিত্রই শিল্পগুণে ভূষিত। সেই চরিত্র একই সঙ্গে অনমনীয় আর মধুর। সুরজিৎ চঞ্চল নয়, প্রগলভ নয়, সংযত মিতভাষী দায়িত্ববান যুবক।"

বিপাশা দত্তের মত সুন্দরী ও ধনীর কন্যার স্বামী হবার জন্য যখন এই গুণগুলিও বিপাশার আত্মীয় পরিজন বা পিতামাতার কাছে যথেষ্ট মনে হয়নি, তখন বিপাশা যুক্তি দিয়েছে—"চেহারাই কি সব? অর্থই কি সব? গাড়ি-বাড়ির সুখই কি একমাত্র সুখ?" ফলে উচ্চপদস্থ অনেক চাকুরে, সুরজিৎ অপেক্ষা সামাজিক দিক থেকে অনেক উচ্চ শাখায় বসবাসকারী পাণিপ্রার্থীরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে বিপাশার কাছ থেকে। অপরদিকে সুরজিৎও নিজের আর্থিক, সামাজিক অবস্থানকে ভুলে গিয়ে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছে বিপাশার কাছে। বিপাশা তার থেকে বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতায় ছোট জেনেও বিপাশার —"রূপ ও লাবণ্যের কাছে, তার দেহাধারের অলৌকিক রহস্যের কাছে" সুরজিৎ নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়েছিল আর এই নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া, তার কাছে মনে হয়েছিল—"যেমন দুঃসহ যন্ত্রণা তেমনি অপার্থিব অবিশ্বাস্য আনন্দ।" এই বিষামৃত সুরজিৎ দীর্ঘ আট বছর ধরে পান করেছে। কিন্তু এই প্রেমের উপাখ্যান খুব সাধারণ নয়, এ নাগরিক প্রেমের উপাখ্যান। তাই নাগরিক জীবনের অন্যান্য

ক্ষেত্রের মতো এখানেও প্রাধান্য পেয়েছে, হৃদয়বত্তা নয় বুদ্ধিবৃত্তি, প্রাধান্য পেয়েছে সারল্য নয় বৈদগ্ধ, প্রেম নয় প্রয়োজন। তাই সুরজিৎ-এর বিদ্রোহী রূপ, সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ কালের প্রবাহে আজ নির্বাপিত। সেও আজ আর সবার মত 'ক্যারিয়ারিস্ট', সংসারের পেষণে পীড়িত, উপার্জন বৃদ্ধির অতিপরিচিত পথের একজন সাধারণ পথিক। তাই— "এখন সুরজিতের বিশ্ব-বিপ্লব শুধু পরিজন-পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ।" নগর সভ্যতা তথা আধুনিক সভ্যতার চাপে সুরজিতের নিজের পরিবর্তন তার নিজের কাছে ধরা পড়েনি। বিপাশার সঙ্গে তার ক্রমবর্ধমান দূরত্ব যে কেবল বিপাশার বাস্তববুদ্ধির অনিবার্য পরিণতি নয় তা সে বুঝতে পারেনি। তার মনে হয়েছে—" মেয়ে মাত্রেই বস্তুবাদিনী। বিশেষ করে এ যুগের মেয়ে। এই যান্ত্রিক যুগ যেন শুধু বস্তুতন্ত্রই জানে। তার আর কোন তন্ত্রমন্ত্র নেই।" দীর্ঘ আট বছর তারা একসঙ্গে বেড়িয়েছে,ঘুরেছে, তর্ক করেছে, আবৃত্তি করেছে, হাজার বাধা বিঘ্নতেও ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ তাদের প্রেমের বন্যা আর আগের মত 'কুলপ্লাবিনী' নেই। তা এখন ক্ষীণস্রোতা নদীতে পরিণত; তাও স্বল্পসময়ের নদী। তাদের স্বপ্নের সৌধ যে আজ মাটির ধূলায় মিশে যাচ্ছে তার কারণ বিশ্লেষণে লেখক বলেন— " বিপাশার স্বপ্নভঙ্গের হেতু একান্ত বস্তুগত। এই পৃথিবীর ধুলোমাটির মধ্যে প্রোথিত।" বিপাশা অভিজাত শ্রেণির উচ্চ সামাজিক মর্যাদাকে পরিত্যাগ করে সুরজিতের মতন দরিদ্র পরিবারে আসতে দ্বিধাগ্রস্ত, ভীত, সন্ত্রস্ত। সুরজিৎকে ভালবাসলেও তার অশিক্ষিতা মা অর্ধশিক্ষিতা দিদির সান্নিধ্যকে সে ভয় পায়। বিয়ের পর যেহেতু মেয়েদের পূর্বতন অভ্যাস, পরিবার সকল কিছুকে ছেড়ে চলে আসতে হয়, কিন্তু পুরুষকে তা করতে হয় না তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিবাহের ক্ষেত্রে বিপাশার দ্বিধাই বেশি। তাদের সম্পর্কের এই পরিণতি বিপাশা অনেক আগেই উপলব্ধি করতে পেরেছে। সুরজিৎ যখন তাদের ছোট ফ্ল্যাট দেখিয়ে বিপাশাকে বলেছে যে একটিমাত্র ঘরেই তাদের স্থান সংকুলান হয়ে যাবে, তখন অন্তরে শিহরিত হয়ে উঠেও বিপাশা মনের কথাকে গোপন রেখে মিথ্যে করে সুরজিতের কাঙ্ক্ষিত উত্তর দিয়েছে। কিন্তু এই ছলনা ও আত্মপ্রতারণা দীর্ঘদিন চলেনি। একসময় তাদের সম্পর্কেরও ঘোষিত পরিসমাপ্তির সময় এসেছে। শেষ বিদায়ের বেলায় বিপাশা ধরা গলায় সুরজিতের কাঁধে মাথা রেখে অস্ফুট স্বরে সুরজিতকে অনুরোধ করেছে, সে যেন বিপাশাকে ভুল না বোঝে ; যেন সে তাকে অবিশ্বাস না করে। তাদের সম্পর্কের এই বিষাদময় পরিণতিতে সে দুঃখিত, ব্যথিত কিন্তু নিজের তুলনায় সুরজিতের অর্থ হীনতা, রুচির দীনতা, আর্থিক অবস্থার পার্থক্য, প্রকৃতগত অমিলকে অস্বীকার করে সে আর ফিরে আসতে পারে না। একসময় সহস্র বিরুদ্ধতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যারা ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছে, কালের প্রবাহে এমন দিন এসেছে, যখন তাদের নিজেদের মধ্যেই দেখা দিয়েছে সহস্র বাধা ও বিরুদ্ধতা। এইভাবে দেখা যায় একটি দীর্ঘ দিনের প্রেম সম্পর্কের অবসান দেখিয়েছেন গল্পকার। সমস্ত ঘটনাটিই গল্পে টুকরো টুকরো অতীত ঝলকের

মধ্য দিয়ে বর্ণিত এবং শোয়িং অংশ অপেক্ষা চরিত্রদের স্মৃতি প্রবাহকেই গল্পকার গল্পের মূল আধার করেছেন। আর এই টুকরো টুকরো ঝলকের মধ্য দিয়ে রচিত হয়েছে একটি সম্পূর্ণ চিত্র, যেখানে প্রকাশিত হয়েছে নাগরিক সভ্যতায়, বস্তুতন্ত্রের চাপে একটি প্রেম সম্পর্কের অপমৃত্যুর ছবি। নাগরিক মানুষ তার প্রাত্যহিক জীবন সংগ্রামের চাপে আর বুদ্ধি, বৈদগ্ধ ও বাস্তববুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হবার ফলে কেমন করে নিস্পাপ প্রেমের জগত থেকে নির্বাসিত হচ্ছে— তাই যেন লেখক ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। প্রেমের এই পরাজয়ের মধ্য দিয়ে নাগরিক সভ্যতাকেই হেয় করেছেন লেখক আর তাঁর নিজের প্রেমচেতনাটি গল্পের নামকরণ থেকেই আমাদের কাছে সুস্পষ্ট রূপে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

এমনই এক প্রেমের অসফল পরিণতির গল্প'চিলেকোঠা'। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৭০ বঙ্গাব্দে, আনন্দবাজার পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায়। এ গল্পে নায়ক নায়িকার মিলনে অন্যতম বাধা তাদের বয়সের পার্থক্য। নায়ক অমলেন্দুর বয়স চল্লিশ অথচ নায়িকা রীণা অষ্টাদশী। এছাড়া তাদের প্রেমের সম্পর্ক কেবলমাত্র উপলব্ধির স্তরেই আবদ্ধ, এই প্রেমের সরব ঘোষণা হয়নি কোন পক্ষ থেকেই। এই গল্পে প্রেমের সরব ঘোষণা নেই, স্বভাবতই প্রেমালাপও নেই এবং প্রেমের সফল পরিণতিও এখানে সম্ভব হয়নি, তবু এ গল্প প্রেমের গল্পই। গল্পের প্রধান পাত্রপাত্রী, উভয়েই উপলব্ধি করেছে পরস্পরের মানসিক অবস্থা, অনুভব করেছে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ কিন্তু সেই আকর্ষণ তথা প্রেমকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারেনি। সাধারণভাবে এ বিষয়ে প্রেমের সরব ঘোষণার জন্য পুরুষ হবার কারণেই যে সদর্থক মানসিকতার প্রয়োজন ছিল অমলেন্দুর, তা সে সঞ্চয় করতে পারেনি। বারবার অগগ্রমনের পথে গেছে অমলেন্দু কিন্তু তার জীবনের অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মতই পশ্চাদপসরণই ঘটেছে বেশি। অমলেন্দু সৎ,বিনয়ী, ভদ্র এবং অবিবাহিত। চল্লিশ বছর বয়সেও এই কৌমার্য বরণ কিন্তু সংসারের প্রতি অনাসক্তিবশত নয় বরং নিজে মুক্ত জীবনের সাধনা করবার জন্য। অমলেন্দু ভেবেছিল —" গার্হস্থ্য সুখের চেয়ে তার পক্ষে অগৃহীর নির্ঝঞ্ঝাট জীবন ভালো, শান্তি ভালো, স্বস্তি ভালো।" তাই তার মা-এর মৃত্যুর পরেও সে ভেবেছে এবং অনুভব করেছে যে মা মুক্তি দিয়ে গেলেন—"সমস্ত বন্ধন মুক্তি ঘটে গেল।" এ একপ্রকার সংসার থেকে পলায়ন এবং প্রকৃতির নিয়মের বিপরীত, তাই প্রকৃতিও এর শাস্তি দিয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে অনুভব করেছে যে, বন্ধনমুক্তি সহজ হয়না—"বন্ধন না থাকলেও একটি দুটি বন্ধনের তৃষ্ণাই যে সহস্র বন্ধনের বাড়া।" কিন্তু তবুও সে বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হয়নি, জীবনযাত্রায় সঙ্গিনী হতে কাউকে আহ্বান করেনি। মুখ ফুটে তা করেনি বলেই তা থেকে যায় অন্তরে —" অস্ফুট আহ্বান মনের মধ্যে নিরন্তর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।" তার মনে ক্ষীণ সাধ তবুও বজায় থেকেছে আর কারও আহ্বান পাবার জন্য। এই অস্ফুট আহ্বান মনের মধ্যে নিরন্তর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হবার গল্পই 'চিলেকোঠা'। যেখানে প্রেম, দুর্বলতার কারণে বাড়ির প্রধান ঘরে স্থান পায় না,

লুকিয়ে থাকে চিলেকোঠায়, যেখানে প্রেম হৃদয়ের গোপনে স্থান লাভ করলেও লুকিয়ে থাকে আরও হৃদয়াভ্যন্তরে চিলেকোঠায়।

কোলকাতা থেকে ২৪ পৌষ, ১৯৫৫ তারিখে স্ত্রী শোভনা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে নরেন্দ্রনাথ লেখেন — "আমার ভালো লাগে। আমার ভালো লাগে তোমাকে। কত কঠিন কত আয়াসসাধ্য এ কথা বলা। এ -কথাটি জানাতে কত আড়ম্বর সাজ-সজ্জারই না প্রয়োজন হয়। স্বর্ণের অলঙ্কার আর কাব্যের অলঙ্কারে মণ্ডিত করে তবে কথাটা তার কানে দেওয়া যায় যাকে আমার ভালো লাগে। শুধু এই কথাটা বলবার জন্য ধনী সংগ্রহ করেছেন হীরা আর মুক্তা, মণি আর মানিক্য; আর কবিরা গেঁথেছেন কথা আর কথা। তবু ক্ষোভ থেকে যায়, সংশয় থেকে যায় মনে, বলা হলো না, যা চেয়েছিলাম বলতে তার কিছুই যেন বলা হল না। সংশয় জাগে মনে, যাকে আমার ভালো লাগে তার কানে কথাটা ভালো করে পৌঁছল কিনা।"[৯]

— এমনই এক দ্বিধা দীর্ণ মানসিকতার শিকার যেন হয়েছে অমলেন্দু। এক্ষেত্রে সে প্রায় স্পষ্ট করেই বুঝেছে রীণার মন, রীণা তাকে ভালোবাসে। কিন্তু সামাজিক বাধা নিষেধকেও সে অমান্য করতে পারেনি। প্রেমে উদ্দাম হয়ে ওঠার যে বয়স, যে বয়সে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় সব বাধাকে ভেঙে চুরমার করে প্রেম এগিয়ে যেতে পারে, সেই উদ্দামতার বয়স অমলেন্দুর নেই। সে চল্লিশ বছর বয়স্ক। দেহে ও মনে সে এখনও সতেজ, কিন্তু এক অষ্টাদশীকে চিরকাল সুখী করার মত ক্ষমতা তার আছে কি না, কিংবা ক'দিন পরেই যখন তার বার্দ্ধক্য আসবে তখন তাদের সম্পর্ক টিকবে কিনা—এ সকল বিষয়ে তার মনে প্রশ্ন আছে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ঘোরতর সন্দেহ আছে। তার দ্বিধা দীর্ণ মানসিকতাকে উপলব্ধি করা যায় তার স্বগত ভাষণে — "অমলেন্দুর কি সেই ঐশ্বর্য আছে, সেই অপরিমিত খ্যাতি প্রতিপত্তি যাকে রীনা যৌবনের বিকল্প হিসাবে মনে করতে পারে ? যৌবনের কি সত্যই কোন বিকল্প আছে।"

প্রকৃতপক্ষে অমলেন্দু রীণার পিতামাতা বিনয়দা ও রেখা বউদির বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি। যদিও তাদের বয়স তার থেকে অনেক বেশি। রীণার জন্মের সময়েও অমলেন্দু তাদের বন্ধু ছিলেন। এই রীণা যখন অষ্টাদশী হয়ে উঠতে চলেছে তখন দীর্ঘদিনের অদর্শনের পর এই পরিবারটির সঙ্গে অমলেন্দুর সাক্ষাৎ ঘটেছে এবং পুনরায় অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এই সময়েই দীর্ঘ দেড় বছর ধরে ক্রমাগত সান্নিধ্য লাভ ও বাক্ বিনিময়ের মধ্য দিয়ে অমলেন্দু ও রীণার মধ্যে, দুই অসমবয়সী নারী পুরুষের মধ্যে গড়ে উঠেছে পারস্পরিক আকর্ষণের ক্ষেত্র। গল্পকার অমলেন্দুর ভাবনা ও চিন্তনের বর্ণনা ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই গল্পের অতি সামান্য কাহিনি অংশকে বর্ণনা করেছেন। অমলেন্দু দ্বিধায় পরিপূর্ণ কিন্তু রীণার প্রতি সে সুস্পষ্টভাবেই অনুরক্ত। রীণার কথাবার্তায় ও আচরণেও অমলেন্দুর প্রতি তার অনুরাগ গোপন

থাকেনি। কিন্তু মূল দ্বিধা অমলেন্দুর মনেই। সে রীণার মনকে সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারার গর্ব অনুভব করেও নিঃসংশয় হতে পারেনি। কখনও তার মনে হয়েছে — "এই যে রীণার কিছু বলে না ডাকা, অমলেন্দুকে দেখে উল্লসিত হয়ে ওঠা, আর সঙ্গে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করা, বেড়ানো, বয়সের ব্যবধান ডিঙিয়ে একেবারে সমবয়সী বন্ধু হয়ে যাওয়া — এসব কি একান্তই অর্থহীন ? এর মূলে কি আর কিছুই নেই? কিছুই আশা করবার মত নেই অমলেন্দুর ? নারী চরিত্র কি এতই দুর্জ্ঞেয়?" কিন্তু পরক্ষণেই সংশয় এসে গ্রাস করেছে তাকে — "..... একটি তরুণীর সাময়িক অবুঝ অনুরাগ আর সেই সর্বপ্লাবী, সর্বাত্মক প্রেম যে একার্থক তা অমলেন্দুকে কে বলল ?" অপরদিকে রীণা বারবার অপেক্ষা করেছে অমলেন্দুর দিক থেকে কোন সরব ও সুস্পষ্ট আহ্বানের। সে এই আহ্বানের জন্য অপেক্ষা করেছে এবং শেষ পর্যন্ত এই আহ্বানের অভাবে হতাশ হয়েছে। অমলেন্দুর এই সাহসহীনতার কারণে হয়তো তার প্রতি রীণার যে মনোভাব জাগ্রত হয়েছে, তাতে মিশে আছে — ব্যঙ্গ, কৌতুক, উপহাস ও পরিহাস। কিন্তু অমলেন্দু যখন শেষ সুযোগ পেয়েও রীণাকে প্রেম নিবেদন করতে পারেনি তখনও অমলেন্দুর মনে হয়েছে এই ভালো হয়েছে। বিনয়দা ও রেখা বউদির বিশ্বাসভঙ্গ তাকে করতে হ'ল না, রীণার যথোপযুক্ত পাত্রে বিয়ে হবার পর রীণা হয়তো এই ভীরুতার জন্যই অমলেন্দুকে একদিন ধন্যবাদ দেবে। নিজের উদ্দাম কামনা বাসনাকে সে ঢেকে দিয়েছে প্রীতি, স্নেহ, ভালোবাসার মোড়কে। এ হয়তো পৌরুষের অভাব, ভীরুতা, কাপুরুষতা, এতে প্রেমের অমর্যাদা হয়, কিন্তু অমলেন্দু কেবল নিজের সুখের জন্য, এক স্নেহের- এক ভালবাসার পাত্রীর ভবিষ্যতের অনিশ্চিত জীবনকে বাজি রাখতে পারে না। কারণ জৈব প্রবৃত্তির ঊর্দ্ধে ওঠা মানুষের পক্ষে সর্বদা সম্ভব হয়না। চল্লিশ বছরের অমলেন্দু যদিও দেহ মনে এখনও সতেজ কিন্তু অচিরেই জরা এসে তাকে আঁকড়ে ধরবে তখন রীণার মনে হয়তো অনুতাপ হবে এক অকৃতকার্য, অকিঞ্চিৎকর প্রৌঢ় পুরুষকে নিজের জীবনসঙ্গী চয়ন করবার জন্য। অমলেন্দু সৎ ও চিন্তাশীল তাই জীবনকে কেবল তাৎক্ষণিকতার মধ্য দিয়ে সে বিচার করতে পারেনি। অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দিয়ে জীবনকে জুয়ো বা লটারি বলে মনে করতে পারেনি সে। অমলেন্দু জানে বিপুল খ্যাতি, প্রতিপত্তি, অর্থসম্পদের আড়ালেও যৌবনের অভাবকে লুকিয়ে রাখা যায় না। এইভাবেই অমলেন্দুর আপাত ভীরুতা ও কাপুরুষতার আড়ালে তার প্রকৃত প্রেমের প্রকাশটি হয়তো ঢাকা পড়ে গেছে। কিন্তু যখন, প্রকৃত প্রেম কেবল প্রেমাস্পদকে কাছেই টানেনা দূরেও ঠেলে দেয় – – এই বিশ্বাসটিকে ধরে রাখা যায় তখন প্রেমের সফল পরিণতিহীন এই গল্পটিও সফল প্রেমের গল্পই হয়ে ওঠে। অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে জীবন বাস্তবতার নানা জটিলতা ধরা পড়ে,কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাঁর প্রেমচেতনায় ইতিবাচক দিকটি বার বার অনুভব করা যায়।

ছোটগল্পকার নরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনা ঃ

যে গল্পে রাজনৈতিক ঘটনা, কর্মকাণ্ড বা রাজনৈতিক আন্দোলন প্রধান স্থান অধিকার করে থাকে তাকে রাজনৈতিক গল্প বলা যেতে পারে। তবে গল্পে কেবল রাজনৈতিক ঘটনার উল্লেখ থাকলেই হবে না, গল্পের চরিত্রগুলিকেও হতে হবে রাজনৈতিক। সকল চরিত্রগুলি না হলেও অন্তত প্রধান চরিত্রগুলিকে হতেই হবে রাজনৈতিক, অর্থাৎ রাজনৈতিক কোনো নির্দিষ্ট মতাদর্শ হবে এই চরিত্রগুলির চালিকা শক্তি। এই সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে সংঘাত অথবা এই মতাদর্শ চরিত্রদের জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত তথা নিয়ন্ত্রণ করে তাই সাধারণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয় রাজনৈতিক গল্পে।

১৯৪৬ থেকে ১৯৪৮ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত কৃষিভিত্তিক 'তেভাগা' আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারানের নাতজামাই' বা মানুষের মনে অধিকার প্রতিষ্ঠার ও সংগ্রামী চেতনার জাগরণের ইতিবৃত্ত নিয়ে রচিত সমরেশ বসুর 'কিম্‌লিস' প্রভৃতি ছোটগল্প সার্থক রাজনৈতিক ছোটগল্পের উৎকৃষ্ট নির্দশন। তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা সমরেশ বসু যেভাবে একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সেই মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করবার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে রাজনৈতিক ছোটগল্প রচনা করেছেন, নরেন্দ্রনাথের রচনায় সেই রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রয়োগসঞ্জাত ছোটগল্প আশা করা যায় না। এর কারণ নরেন্দ্রনাথের মানসিকতা বা তার 'টেম্পারামেন্ট'। যদিও আলোচক জানান — "ব্যক্তিগত জীবনে বামপন্থার প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ৪২ নং ধর্মতলা স্ট্রীট -এ অবিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির অফিসে তিনি প্রায়ই যেতেন। রাজনীতি ঘনিষ্ঠ 'পরিচয়' পত্রিকা গোষ্ঠীর সঙ্গেও তাঁর অন্তরঙ্গ যোগ ছিল।"[১০] একই সঙ্গে আলোচক এও জানান — "কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে রাজনীতি তাঁকে কখনোই সেভাবে আকর্ষণ করেনি। ওইসব আড্ডায় যেতে প্রধানত আড্ডা দেবার মেজাজেই।"[১১]

একথা সত্য যে রাজনীতিকে জীবনের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে নরেন্দ্রনাথ ভাবতে পারতেন না। সেই অর্থে রাজনৈতিক চরিত্রও তিনি তাঁর গল্পের মধ্যে সৃষ্টি করেননি। তবে ব্যক্তিগত জীবনে বামপন্থার প্রতি তিনি আস্থাশীল ছিলেন এবং রাজনীতিকে তিনি দেখতেন অর্থনীতির সঙ্গে মিলিয়ে। তাঁর এই মানসিকতার পরিচয় তাঁর রচনার বিভিন্ন স্থানেই পাওয়া যায়। তাঁর 'পতাকা' গল্পের প্রধান চরিত্র শচীবিলাসের চিন্তায় আসলে প্রকাশিত হয়েছে তাঁরই চিন্তা চেতনা, যেখানে তিনি লেখেন — "এ যুগের রাজনীতি সর্বগ্রাসী। হতেই হবে। কারণ তা জীবননীতির সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন।" অতএব একথা বলাই যায় রাজনীতির সর্বগ্রাসীদিক ও জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অন্বয়কে তিনি পক্ষান্তরে স্বীকার করে নিয়েছেন। অপরদিকে রাজনীতিকে অর্থনীতির সঙ্গে মিলিয়ে যে তিনি দেখতেন তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর একটি চিঠিতে।

২রা পোষ, ১৯৪৭ তারিখে শোভাবাজার থেকে স্ত্রী শোভনা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি লেখেন—

"এই যে বেঁচে থাকা, খাওয়া, পরা, বাস করা নিয়ে যে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ, নানা সমস্যার উদ্ভব, তার আলোচনাই রাজনীতি আর অর্থনীতি। রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আগে রাজনীতি বলতে বুঝতুম রাজার নীতি। তখন রাজা ছিলেন সর্বপ্রধান। তিনি কীভাবে দেশ শাসন করেন, অন্য দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব না শত্রুতা কী রকম সম্পর্ক স্থাপন করেন, অন্যদেশ কীভাবে, কোন্ কৌশলে জয় করেন ইত্যাদিই ছিল রাজনীতি। এখনও দেশের শাসনতন্ত্র, বিদেশের সঙ্গে দেশের সম্বন্ধ ইত্যাদিই রাজনীতি (Polities) বলতে বোঝা যায়। অর্থনীতি (Economices ইকনমিকস) হ'ল কৃষি, শিল্প দেশের মধ্যে এবং বিদেশের সঙ্গে ব্যাবসা বাণিজ্য উৎপাদন ও বন্টন (মানে খাওয়া ও পরার জিনিস উৎপন্ন করা এবং দেশবাসীর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া) ইত্যাদির আলোচনা। এতেই বোঝা যায়, রাজনীতির সঙ্গে অর্থনীতির কী রকম ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আজকালকার রাজনৈতিক সমস্যার সবই অর্থনৈতিক সমস্যা। এই যে যুদ্ধ বেঁধেছে, এর মূলে আছে অর্থনৈতিক কারণ। অনেক দেশ ইংরাজদের দখলে থাকায় সেইসব দেশের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্যের সুবিধা, সেইসব দেশ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করবার সুবিধা ইংরাজরা বেশি পায়, জার্মানরা তেমন পায় না, কিন্তু চায়। তাই এই যুদ্ধ। আমাদের দেশে যে স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে, তাও এই খাওয়া-পরা সুখ-সুবিধার অভাব দূর করবার জন্য।"[১২]

চিঠির এই অংশে তিনি রাজনীতি কী তার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন এবং যুদ্ধের কারণ সম্পর্কেও নিজের একটি মতামত দান করেছেন। এই চিঠিটিরই পরবর্তী অংশে তিনি সমাজ ব্যবস্থা - সমাজতন্ত্র, মূলধন, মালিক-ধনতন্ত্র প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই রচনা থেকেই নরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনার অন্তর্নিহিত রূপটি কিছুটা স্পষ্ট হয় এবং তাঁর বামপন্থী মানসিকতাটিও উপলব্ধি করা যায় — "একটি কথা লক্ষ্য করেছ বোধ হয় যে, সকলে সমাজবদ্ধ হয়েছে — সকলে যাতে মিলেমিশে খাওয়া-পরা-থাকার সুবিধা পায় সেইজন্য। সমাজের মূলে সকলের সহযোগিতা (Co-Operation), প্রতিযোগিতা (Competition) নয়। (যেমন বনের পশুকে তাড়াবার জন্য সকলে একসঙ্গে মিলেছে, একজন আর একজনের সঙ্গে পাল্লা দেয়নি।) কিন্তু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করে দেখ। সকলেই কি খাওয়া, পরা, থাকার সুবিধা পাচ্ছে? একদল চরম সুখ-সুবিধা ভোগ করছে, আর এক দলের দিন কাটছে অর্ধ উপবাসে। অবশ্য এদের মধ্যে মাঝামাঝি একদলও আছে। এদের নাম মধ্যবিত্ত (Middle class)। একমুঠো চাল, কি একখানা কাপড় কিনবার মতো পয়সা একদলের নেই, আর বড় বড় বাড়ি, মোটর গাড়ি ইত্যাদি করেও বহু বাড়তি টাকা আর একদলের হাতে জমেছে। এই বাড়তি টাকার নাম Capital। যাদের এই টাকা আছে তাদের বলে capitalist। বর্তমান সমাজে এরাই প্রধান, এরাই

সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করছে বলে বর্তমান সমাজব্যবস্থার নাম হল Capitalism। বাংলায় এই তিনটি কথার নাম হ'ল যথাক্রমে, মূলধন, ধনী বা মালিক এবং ধনতন্ত্র।"[১৩]

অতএব দেখা যায় নরেন্দ্রনাথ রাজনীতিকে অর্থনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে অন্বিত বলে মনে করতেন এবং এই ভাবনা ভ্রান্তও নয়। তিনি ব্যক্তিগতভাবে কোনো নির্দিষ্ট মতাদর্শ দ্বারা চালিত হননি বা রাজনীতিকে তাঁর লেখনীর চালিকাশক্তি করে তোলেননি। কিন্তু জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজনীতির সর্বগ্রাসী প্রভাবকে অস্বীকার করেননি। তাঁর গল্পের মধ্যেও তাঁর এই উপলব্ধিটির প্রকাশ ঘটেছে। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে রচিত 'অপঘাত' গল্পে বেলা স্বামী সুধীরকে বলেছে— "রাজনীতি ফিতি কি ছাই আমারই ভালো লাগে, না সত্যিই কিছু ওর বুঝি। কিন্তু না বুঝেও তো জো নেই, না ভেবেও তো পারিনে। চালের কাঁকর হয়ে রাজনীতি যে ভাতের হাঁড়ির মধ্যে ঢুকেছে। প্রতি গ্রাসে কির কির করে। খাওয়ার সময় টের পাও না?" সুতরাং দেখা যায় নরেন্দ্রনাথের মন মানসিকতার সঙ্গে রাজনীতি যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ না হলেও তিনি বর্তমান রাজনীতি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং তার সর্বগ্রাসী প্রভাব সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন। এখন তাঁর রাজনৈতিক গল্পগুলি নিয়ে আলোচনা করলে এই বিশেষ রাজনৈতিক চেতনাটি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মানসিকতা ছিল রোম্যান্টিক এবং তিনি তাঁর গল্পের প্রধান উপজীব্য করে তুলেছেন মানুষের গহন গভীর মনের রাজ্যের রহস্য উন্মোচনকে । তাই তাঁর রাজনৈতিক গল্পগুলিতেও একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্র। তাঁর 'পতাকা' গল্পে রাজনৈতিক চরিত্র ও রাজনৈতিক পটভূমি বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করেছে। তবে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নরেন্দ্রনাথের অন্যান্য গল্পের মত এ গল্পেও রাজনীতি "জীবননীতিকে ছাপিয়ে যেতে পারেনি।"[১৪] 'পতাকা' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে। প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন ও সেই উদ্‌যাপনকে ঘিরে কংগ্রেসী ও মুসলিম লীগের সমর্থকদের বিরোধকে এই গল্পে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তাতে ভিন্নমাত্রা দান করেছে পারিবারিক প্রেক্ষাপট। স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই ১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথমদিকে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি ২৬ শে জানুয়ারি তারিখটিকে ভারতের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা ভারতবাসীর মনে সঞ্চারিত করা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৩০ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর ২৬ শে জানুয়ারি তারিখটিকেই ভারতবর্ষে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করা হত। এই স্বাধীনতা দিবসকে উপলক্ষ করেই একটি রাজনৈতিক পরিবারের মানসিক টানাপোড়েনকে লেখক আলোচ্য গল্পে তুলে ধরেছেন।

গল্পে দেখা যায় বৃদ্ধ শচীবিলাস কংগ্রেস পার্টির সক্রিয় সদস্য এবং দলে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন। অপরদিকে তার মাতৃহারা কন্যা ইন্দিরা বামপন্থী ও বিপ্লববাদী। উভয়ের জীবনেই

রাজনীতি গভীর শিকড় প্রোথিত করেছে। জীবনের অধিকাংশ সময় শচীবিলাস রাজনীতির কাজে ঘর ছেড়ে বাইরে বাইরে ঘুরেছেন, কখনো থেকেছেন অন্য জেলায়, কখনো বা জেলে। ইন্দিরাও তার পিতার থেকে ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে চলেছে স্বতন্ত্র পথে। এহেন রাজনৈতিক পরিবারের রাজনৈতিক একটি চরিত্র শচীবিলাস নিজের গ্রামে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। গ্রামের শিল্পি নীলকমল পালকে দিয়ে একখণ্ড সাদা ধবধবে খদ্দরের কাপড়ে চরকা ও হরিৎ হলুদের ঢেউ অঙ্কন করিয়ে তৈরি করে নিয়েছেন পতাকা। গগন ঘরামিকে দিয়ে বাঁশ কাটিয়ে প্রস্তুত করেছেন পতাকা দণ্ড । সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে সুষ্ঠুভাবে ও সুন্দরভাবে করবার জন্য তিনি পরিকল্পনা করেছেন। বেশ কয়েকজন কংগ্রেসকর্মী, সহযোগী বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, সারাদিনের অনুষ্ঠানসূচী স্থির করেছেন। পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করবার জন্য করণীয় সকল কিছু সম্পন্ন করেছেন। নিজের পরিকল্পনায় শচীবিলাসের নিজেরই বুক ভরে গিয়েছে, একই সঙ্গে হৃদয়ে জেগেছে গর্ব ও আনন্দের অনুভূতি। অপরদিকে মেয়ে ইন্দিরার সঙ্গে তার রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিরোধিতাতে তিনি অন্তরে বেদনা অনুভব করেছেন। এক সঙ্গে থাকতে থাকতে অনেক সময় নিজের কন্যার সঙ্গে তার বিরোধ ও তর্ক-বিতর্ক বেধে যায়, পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে। পিতা ও কন্যার মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়; রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির প্রভেদ বড় হয়ে ওঠে। পিতার প্রতি ইন্দিরার যাবতীয় কর্তব্য পালন সত্ত্বেও শচীবিলাসের মনে হয় —"ইন্দিরার কণ্ঠে তেমনি শাসনের ভঙ্গি, আবদারের মাধুর্য আজো তেমনি আছে। তবু কি যেন নেই। তার সম্বোধনে, তার আহ্বানে সমস্ত হৃদয় মন যেন আজকাল আর ঠিক আগের মত সাড়া দিয়ে ওঠে না শচীবিলাসের। মাঝে মাঝে সংশয় হয়। প্রশ্ন করেন দৈন্যটা কার। কার্পণ্য কোথায়, তা কি ইন্দিরার কণ্ঠে, না শচীবিলাসের অন্তরে?" এরপর এই দূরত্বের কারণ বিশ্লেষণে লেখক বলেন — "রাজনৈতিক আদর্শে, কর্মপদ্ধতিতে প্রভেদটা ক্রমেই বড় হয়ে উঠেছে মেয়ের সঙ্গে। মিলের চেয়ে অমিলই হয় বেশি। কথায় কথায় তর্ক বাঁধে। বার বার দুজনেরই ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে থাকে।" গল্পের সূচনায় পিতাপুত্রীর এই সম্পর্কের সংকট পরবর্তীতে ঘনীভূত হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা দিবসের পতাকা উত্তোলন উপলক্ষে মুসলিম সম্প্রদায়ের আপত্তিতে গল্পে বাহ্যিক সংকট ঘনীভূত হয়েছে। কিন্তু তারও পূর্বে শচীবিলাস ও ইন্দিরার রাজনৈতিক মতাদর্শগত ভিন্নতা গল্পের অন্তরঙ্গ বিরোধকে জন্ম দিয়েছে। এই বিরোধে শচীবিলাস আত্মভাষণে নিজের পক্ষাবলম্বন করেছেন — "রাজনীতি আর হৃদয়নীতি। কিন্তু শচীবিলাসের রাজনীতি তো কেবল মস্তিস্কে নয়, জ্ঞানমাত্র নয়, তা তাঁর হৃদয়ের অনুভূতির স্তরে স্তরে মিশে রয়েছে। শচীবিলাসের রাজনীতি মানে দেশ সেবা। বিজ্ঞান নয় ধর্ম। কল্পনার রঙে, অন্তরের রসে বার বার তা তাঁর চোখের সামনে মূর্তি ধরে ওঠে।" কিন্তু শচীবিলাসের এই উপলব্ধি ও ভাবনাকে ইন্দিরা মান্য করেনা, শ্রদ্ধাও করেনা। সে ভিন্নতর রাজনৈতিক মতবাদকে সমর্থন করে এবং পিতার রাজনীতি নামে ধর্মপালনকে, বিশেষত পৌত্তলিক ভাবনাকে ব্যঙ্গ করে। বলে—

রাজনীতি গভীর শিকড় প্রোথিত করেছে। জীবনের অধিকাংশ সময় শচীবিলাস রাজনীতির কাজে ঘর ছেড়ে বাইরে বাইরে ঘুরেছেন, কখনো থেকেছেন অন্য জেলায়, কখনো বা জেলে। ইন্দিরাও তার পিতার থেকে ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে চলেছে স্বতন্ত্র পথে। এহেন রাজনৈতিক পরিবারের রাজনৈতিক একটি চরিত্র শচীবিলাস নিজের গ্রামে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। গ্রামের শিল্পি নীলকমল পালকে দিয়ে একখণ্ড সাদা ধবধবে খদ্দরের কাপড়ে চরকা ও হরিৎ হলুদের ঢেউ অঙ্কন করিয়ে তৈরি করে নিয়েছেন পতাকা। গগন ঘরামিকে দিয়ে বাঁশ কাটিয়ে প্রস্তুত করেছেন পতাকা দণ্ড । সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে সুষ্ঠুভাবে ও সুন্দরভাবে করবার জন্য তিনি পরিকল্পনা করেছেন। বেশ কয়েকজন কংগ্রেসকর্মী, সহযোগী বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, সারাদিনের অনুষ্ঠানসূচী স্থির করেছেন। পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করবার জন্য করণীয় সকল কিছু সম্পন্ন করেছেন। নিজের পরিকল্পনায় শচীবিলাসের নিজেরই বুক ভরে গিয়েছে, একই সঙ্গে হৃদয়ে জেগেছে গর্ব ও আনন্দের অনুভূতি। অপরদিকে মেয়ে ইন্দিরার সঙ্গে তার রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিরোধিতাতে তিনি অন্তরে বেদনা অনুভব করেছেন। এক সঙ্গে থাকতে থাকতে অনেক সময় নিজের কন্যার সঙ্গে তার বিরোধ ও তর্ক-বিতর্ক বেধে যায়, পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে। পিতা ও কন্যার মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়; রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির প্রভেদ বড় হয়ে ওঠে। পিতার প্রতি ইন্দিরার যাবতীয় কর্তব্য পালন সত্ত্বেও শচীবিলাসের মনে হয় —"ইন্দিরার কণ্ঠে তেমনি শাসনের ভঙ্গি, আবদারের মাধুর্য আজো তেমনি আছে। তবু কি যেন নেই। তার সম্বোধনে, তার আহ্বানে সমস্ত হৃদয় মন যেন আজকাল আর ঠিক আগের মত সাড়া দিয়ে ওঠে না শচীবিলাসের। মাঝে মাঝে সংশয় হয়। প্রশ্ন করেন দৈন্যটা কার। কার্পণ্য কোথায়, তা কি ইন্দিরার কণ্ঠে, না শচীবিলাসের অন্তরে?" এরপর এই দূরত্বের কারণ বিশ্লেষণে লেখক বলেন — "রাজনৈতিক আদর্শে, কর্মপদ্ধতিতে প্রভেদটা ক্রমেই বড় হয়ে উঠেছে মেয়ের সঙ্গে। মিলের চেয়ে অমিলই হয় বেশি। কথায় কথায় তর্ক বাঁধে। বার বার দুজনেরই ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে থাকে।" গল্পের সূচনায় পিতাপুত্রীর এই সম্পর্কের সংকট পরবর্তীতে ঘনীভূত হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা দিবসের পতাকা উত্তোলন উপলক্ষে মুসলিম সম্প্রদায়ের আপত্তিতে গল্পে বাহ্যিক সংকট ঘনীভূত হয়েছে। কিন্তু তারও পূর্বে শচীবিলাস ও ইন্দিরার রাজনৈতিক মতাদর্শগত ভিন্নতা গল্পের অন্তরঙ্গ বিরোধকে জন্ম দিয়েছে। এই বিরোধে শচীবিলাস আত্মভাষণে নিজের পক্ষাবলম্বন করেছেন — "রাজনীতি আর হৃদয়নীতি। কিন্তু শচীবিলাসের রাজনীতি তো কেবল মস্তিস্কে নয়, জ্ঞানমাত্র নয়, তা তাঁর হৃদয়ের অনুভূতির স্তরে স্তরে মিশে রয়েছে। শচীবিলাসের রাজনীতি মানে দেশ সেবা। বিজ্ঞান নয় ধর্ম। কল্পনার রঙে, অন্তরের রসে বার বার তা তাঁর চোখের সামনে মূর্তি ধরে ওঠে।" কিন্তু শচীবিলাসের এই উপলব্ধি ও ভাবনাকে ইন্দিরা মান্য করেনা, শ্রদ্ধাও করেনা। সে ভিন্নতর রাজনৈতিক মতবাদকে সমর্থন করে এবং পিতার রাজনীতি নামে ধর্মপালনকে, বিশেষত পৌত্তলিক ভাবনাকে ব্যঙ্গ করে। বলে—

"এক হিসাবে তা ঠিক, দেশ আপনাদের কাছে প্রতিমা, দেশের লোক আপনাদের কাছে পুতুল। ভাবেন তাদের ইচ্ছামত ভাঙা যায় গড়া যায়। গায়ে তাদের রঙ লাগান আর অপছন্দ হলে মুছে ফেলেন। বলেন ভুল হয়েছে।" রাজনৈতিক মতাদর্শগত এই ভিন্নতা পিতা ও কন্যার মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ককে বিনষ্ট করেছে। পিতার প্রতি কন্যার আবদার, অভিমানের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে, অবশিষ্ট রয়ে গেছে শুধু শ্লেষ আর ব্যঙ্গের ভাষা।

সর্বগ্রাসী রাজনীতির দুরতিক্রম্য প্রভাব যে কেবল পিতা ও কন্যার পারস্পরিক সম্পর্ককে স্পর্শ করে তাই নয়, এই রাজনীতি যে "তরুণ তরুণীর পরস্পরের প্রতি দুটি অনুরক্ত হৃদয়কেও বিচ্ছিন্ন করে দেয়।"— তারও ইঙ্গিত আছে গল্পে। এই প্রসঙ্গে ইন্দিরার প্রণয়ী নিরুপমের উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতাদর্শের অতি সামান্য পার্থক্যও ইন্দিরা ও নিরুপম সহ্য করতে পারেনি। পরস্পর পরস্পরকে প্রত্যাখ্যান করেছে, উভয়ে উভয়ের সংস্পর্শ ত্যাগ করেছে। যদিও উভয়েই ছিল বামপন্থী এবং উভয়েই বিপ্লববাদী। অতএব দেখা যায় এই 'পতাকা' গল্পের সূচনায় রাজনৈতিক মতাদর্শ কী ভাবে মানুষকে প্রভাবিত করে, তার সুকুমার বৃত্তিকে বিনষ্ট করে বা ব্যক্তিগত সম্পর্ককে বিনষ্ট করে তার পরিচয় রয়েছে আর রয়েছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মেয়েদের দর্পিত বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ইতিবৃত্ত। তাই ইন্দিরার পিসি বয়স্থা চারুবালার মনে হয়েছে— "আমাদের আমলে মেয়েরা কেবল রাঁধত আর চুল বাঁধত, আর একালের মেয়েরা তার বদলে না হয় রাঁধে আর দল বাঁধে।"

এই মতাদর্শগত বিরোধের ছায়ায় পারিবারিক সম্পর্কের বিনষ্টির চিত্রই গল্পের মূল উপজীব্য নয়। পরিবারের এই অন্তর্নিহিত বিরোধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাহ্যিক বিরোধিতা। শচীবিলাসের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠানে পাথরপ্রতিম প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায়। হিন্দু মুসলমানের এক কালের সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান এখন সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে কলুষিত হয়ে উঠেছে। পারস্পরিক সম্মান, শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্যের স্থান নিয়েছে হিংসা, দ্বেষ ও পারস্পরিক অবিশ্বাস। এতদিন যে জমিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়েছে সে স্থানে আর পতাকা উত্তোলন করতে দেবে না মুসলমানেরা। তে-রঙা চরকা অঙ্কিত পতাকা মুসলমানেরা নিজেদের বলে মানতে চায়নি। তাদের মতে, "..... ও নিশান আমাদের নয়। আমাদের নিশান চাঁদ- মার্কা লীগের নিশান। আপনাদের ওই তে-রঙা উড়তে দেখলে আমাদের গুনাহ্ হয়। ও নিশান এখানে আমরা উড়াতে দিতে পারি না।"

এই সমবেত সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে দূর করবার প্রচেষ্টা করেছেন শচীবিলাস প্রাণপণে। বোঝাতে চেয়েছেন এই নিশান কেবল হিন্দুর নয়, এই নিশান হিন্দু মুসলমান সকলেরই। এই নিশান ভারতের জাতীয় পতাকা। কিন্তু তার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। অপরদিকে হিন্দুরা জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য এককাট্টা হয়েছে। ফলে উত্তেজনার পারদ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের

পথ অসম্ভব বলে মনে হয়েছে প্রবীণ শচীবিলাসের। তিনি হতোদ্যম হয়ে পড়েছেন। বহুবার এই স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করতে গিয়ে বাধা পেয়েছেন, পুলিশের মারে রক্তাক্ত হয়েছেন, কিন্তু এমন বাধা কোনোদিন পাননি। এ বাধা আইনের নয়, পুলিশের নয়, যারা বিরুদ্ধতা করছে তারা একটি শ্রেণি — "তারা দু'চার দশ জন নয়, দু'চার হাজারও নয়, অনেক অনেক বেশি। তারা পর নয়, নিতান্ত আপনার জন; তাদের ফেলে দেওয়া যায় না, ছেঁটে ফেলে যায় না, রাগে অভিমানে দূরে সরিয়ে রাখা যায়না তাদের। দেশের তারা অংশ, অঙ্গের তারা প্রত্যঙ্গ।" দেশের এই অবিচ্ছেদ্য অংশরাই আজ জাতীয় পতাকার অমর্যাদা করতে উদ্যত এবং এই পরিস্থিতি শচীবিলাসের কাছে হয়ে উঠেছে মর্মন্তুদ ও যন্ত্রণাদায়ক। ফলে তিনি নিরুৎসাহ ও নিরুদ্যম হয়ে পড়েছেন। কিন্তু এ অবস্থায় ইন্দিরা মুসলনমানদের কাছে গিয়ে তাদের বুঝিয়ে এ সংকটের একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ বের করেছে। সমাধানটি হল এই যে, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কোনো নিশানই উত্তোলিত হবে না, কোনো প্রতীকের প্রয়োজন নেই এবং তাতে সকলে যোগ দেবে। এই সমাধান অনেকেই সমর্থন করতে পারেননি। প্রতীকহীন অনাড়ম্বর স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের এই প্রস্তাবকে শচীবিলাস বেদনাতুর হৃদয়ে স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু এই দিবস উদ্‌যাপনের উৎসবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি পরিণামে গভীর প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি লাভ করেছেন। তার অন্তরের সকল ক্ষোভ ও বেদনা দূর হয়ে গেছে। তিনি অন্তরে উপলব্ধি করেছেন যে, কন্যার সঙ্গে রাজনৈতিক মতাদর্শগত ভিন্নতার কারণে তার যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল, জাতীয় পতাকার উত্তোলন বিষয়ে সেই কন্যার সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়ে তিনি যেন হারানো কন্যাকে পুনরায় ফিরে পেয়েছেন। তিনি কেবল সন্তানবাৎসল্যের কাছে পরাস্ত হননি, স্বজনবাৎসল্যের কাছেও নিজের কঠোর রাজনৈতিক আদর্শকে একটু নমনীয় করে তুলেছেন। ফলে যে শ্রেণি এতক্ষণ সমবেতভাবে বিরুদ্ধতা করেছিল, তাদেরও তিনি এক ছাতার নিচে মেলাতে পেরেছেন। যে রাজনৈতিক আদর্শগত অনৈক্য পিতা ও কন্যার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান রচনা করেছিল তা দূর হয়ে গিয়ে প্রফুল্ল আনন্দময় পরিস্থিতির সঞ্চার হয়েছে। রাজনীতির কারণে মন মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছিল আর পরিণামে মনের পরিবর্তনে রাজনীতির পরিবর্তন হয়েছে। শচীবিলাসের এই উপলব্ধির পরিবর্তনের ইঙ্গিত লেখক পূর্বেই দিয়ে রেখেছেন। সেখানে তিনি লেখেন — "রাজনীতিতে কাল যা বাম আজ তা দক্ষিণ। ডাইনে বাঁয়ে মুহূর্তে তা পাশ বদলায়। আর বদলায় মন। ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প সঙ্গে সঙ্গে বদলে চলে। এ যুগের রাজনীতি সর্বগ্রাসী। হতেই হবে। কারণ তা জীবননীতির সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন।"

এইভাবে 'পতাকা' গল্পে রাজনৈতিক সংঘাতের ছবি অঙ্কন করেছেন লেখক, আবার একই সঙ্গে পারিবারিক বিরোধের পটভূমিতে এই সংঘাতকে ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার এই সংঘাতের সমাধানের উপায় করে দিয়েছেন এই রাজনীতির মধ্য দিয়েই। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে এই গল্পের চরিত্রগুলি রাজনৈতিক, গল্পের মূল সংকট ঘনীভূত হয়েছে রাজনৈতিক মতাদর্শকে কেন্দ্র করেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে

মানবাত্মা, পিতার স্নেহশীলতা জয়ী হয়েছে, জয়ী হয়েছে শ্রেণিগত ও আদর্শগত ভিন্নতার উপর বাৎসল্য আর এই বিষয় গুলি সবই অরাজনৈতিক।

'পতাকা' গল্পটিকে চরিত্র ও ঘটনাগত দিক থেকে যে অর্থে রাজনৈতিক গল্প বলা যায় 'শোক' গল্পটি ঠিক সেই অর্থে রাজনৈতিক নয়। কিন্তু এ গল্পের অনেকখানি স্থান জুড়ে অবশ্যই আছে রাজনীতি। 'শোক' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে। প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের গণ- আন্দোলনের পটভূমিতে গল্পটির কাহিনি বিধৃত। তবে নরেন্দ্রনাথের সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এ গল্পেও প্রাধান্য পেয়েছে মানবের গভীর অন্তর্লোক, যেখানকার শোক, দুঃখ, বেদনা ও অভিমানের চিত্র অঙ্কনে নরেন্দ্রনাথের বিশেষ সিদ্ধি। প্রথম অধ্যায়ে নরেন্দ্রনাথের আবির্ভাব ও লেখক হিসেবে গড়ে উঠবার দেশকালের আলোচনায় বলা হয়েছে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন ভারতের গণ- আন্দোলন বা শ্রমিক আন্দোলনগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে রূপান্তরিত হয়েছিল। এই রকমই এক সংঘর্ষে গল্পের প্রধান চরিত্র মল্লিকার স্বামী শশধরের মৃত্যু হয়েছে। তবে এই শশধর বিপ্লবী বা স্বাধীনতাকামী জনগণের প্রতিনিধি নয়। সে প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরেজ সরকারের একনিষ্ঠ কর্মচারী — থানার দারোগা। উপরওয়ালার হুকুমে সে কালীবাড়ির মাঠে আয়োজিত ইংরেজ সরকার- বিরোধী সমাবেশকে ভেঙে দিতে রওনা হয়েছিল। কিন্তু তার উদ্দেশ্য সফল হয়নি। উন্মত্ত জনতা দেশের স্বাধীনতার পক্ষে অন্তরায় স্বরূপ এই সরকারী কর্মচারীকে তাদের শত্রু গণ্য করেছে এবং জনরোষ তাকে হত্যা করতেও দ্বিধা করেনি — "মাঠশুদ্ধ লোক তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার হাতের বন্দুক কেড়ে নিয়েছে। ভয়ে পালিয়ে এসেছে তার দলবল কনস্টেবলেরা। একটি লোককে মারবার জন্য দেশশুদ্ধ লোক না এনেছিল হেন অস্ত্র নেই। ইট, লাঠি, সোডার বোতল, সব কিছুর আঘাতই শশধরের মাথায় মুখে পিঠে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কানের পিঠ থেকে কাতলা মাছের রক্তের মত কয়েক ঘন্টা অবিরল রক্ত ঝরেছিল শশধরের।"

স্বামীর মৃত্যুতে মল্লিকা শোকে পাথর হয়ে গেছে, তার নিরালম্ব জীবনের একমাত্র সঙ্গী হয়েছে শশধরের স্মৃতি। অপরদিকে বিশ্বস্ত কর্মচারীর মৃত্যু সরকার সহজে ভোলেনি, সহ্যও করেনি। সশস্ত্র পুলিশ ও সৈন্য সাড়া শহরকে ঘিরে ফেলে শহরের সমস্ত দোকানপাটের দ্রব্যসামগ্রী ছড়িয়ে ফেলেছে রাস্তায় ধুলোয়। অশিক্ষিত গুন্ডা বদমাসদের লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল লুটপাটের জন্য। শহরের সম্মানিত ব্যক্তিদের স্ত্রী কন্যারাও একবস্ত্রে মান নিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। গহনাপত্রের সঙ্গে সঙ্গে অনেকের সম্ভ্রমও নষ্ট হয়েছে। লেখকের বর্ণনা এইরকম — "স্কুলের হেডমাস্টার আর ইতিহাসের মাস্টারকে দু'দিন দু'রাত অনাহারে আটকে রাখা হয়েছিল থানায়। শহরের অধিকাংশ যুবকদের নৃশংস নির্যাতনের পর হত্যার অপরাধে চালান দেওয়া হয়েছিল সদরে।" এইভাবে মল্লিকার স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে, কিন্তু মল্লিকার শোক তাতেও শান্তি পায়নি। বিয়ের দু'বছরের মধ্যে স্বামীহারা হয়ে মল্লিকার মনে

হয়েছে এই গোটা শহরকে ভেঙে গুড়িয়ে যদি নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া যেত তবে তার প্রাণে শান্তি হ'ত।

কিন্তু মল্লিকার স্বামীর প্রতি সহানুভূতি সকলের নেই। অধিকাংশ মানুষ মনে করে শশধর উচিত শিক্ষা পেয়েছে। শশধর ছিল দেশের শত্রু, স্বাধীনতার পথে প্রতিবন্ধকতা — এইসব নানারকম নিন্দাবাদ ও ধিক্কারের কথাও কানে আসে মল্লিকার। এছাড়া শশধরকে খুন করবার অপরাধে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট কাউকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেনি। দেশের সকলের সহানুভূতি ছিল আন্দোলনকারীদের পক্ষে। কলকাতার বড় বড় ব্যারিস্টার আসামীদের পক্ষ হয়ে আদালতে কেস লড়েছেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ সরকার যোগার করতে পারেনি। কয়েকজনের মাত্র ছ'মাস, এক'বছরের জেল হয়েছে। কেবল প্রবীণ বিপ্লবী সুরেশ্বর চৌধুরী জেল খাটছেন। এই একজন ব্যক্তির কঠোর শাস্তিতে মল্লিকা কিছুটা শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করেছে। যেন কিছুটা প্রতিহিংসা চরিতার্থতার মাধ্যমে শান্তির আশ্বাস লাভের চেষ্টা করেছে সে। কিন্তু সমগ্র শহরবাসীর সমবেদনা ও সহানুভূতি সুরেশ্বরবাবু লাভ করেছেন। সকলেই মনে করেন যে পুলিশ সুরেশ্বরবাবুকে মিথ্যে ফাঁসিয়েছে। পুরোনো আক্রোশে তার 'ঘাড়ে সব অপরাধ চাপিয়েছে'। শশধরের করুণ মৃত্যুর পরও শশধর মানুষের ন্যূনতম সহানুভূতি অর্জনে অসমর্থ হয়েছে।

শশধরের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীর দিন শশধরের স্মৃতিকে বুকে চেপে সকল প্রকার সামাজিক কর্তব্য মল্লিকা পালন করেছে এবং শশধরের ফটোতে মালা দেবার জন্য মালা গাঁথতে বসেছে। এমন সময়ে সে জানতে পেরেছে সুরেশ্বর বাবুকে সেদিনই জেল হাজত থেকে অসুস্থতার কারণে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। শহরের সকলের সমবেত জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে রুগ্ন, শীর্ণ, অশক্ত সুরেশ্বর বাবুকে নিয়ে শোভাযাত্রা এগিয়ে আসছে রাস্তা দিয়ে। মল্লিকা তখন আবিস্কার করে, তার পিতামাতা কন্যার শোকের সমব্যথী হলেও, তাদের হৃদয়ে সুরেশ্বর বাবুর স্থান অনেক উপরে। কন্যার স্বামীকে হত্যার দায়ে যে ব্যক্তি জেল খাটছেন, সেই ব্যক্তির প্রতি তারা অন্তরঙ্গতা অনুভব না করে থাকতে পারেননি। সুরেশ্বরবাবুর মুক্তির খবর তারা সবাই জানতেন কিন্তু কেবল মল্লিকার কাছ থেকে সযত্নে সেই সংবাদটি তারা গোপন রেখেছেন। মল্লিকা যখন তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছে কেন তিনি এই বিশেষ দিনটিতেই যে সুরেশ্বরবাবুও মুক্তি পাবার কথা তা কন্যার কাছে গোপন রেখেছেন, তখন বিপিনবাবু একটু অপরাধীর সুরেই বলেছেন যে, তিনি এ খবর নিশ্চিতভাবে জানতেন না। তবে এই সঙ্গে তিনি আরও বলেন — "কিন্তু শরীর একেবারে ভেঙে পড়ায় গভর্নমেন্ট আগেই ছেড়ে দিয়েছে। শুনেছি কিছুই নাকি নেই আর দেহের। একেবারে অস্থিচর্মসার হয়ে গেছে। যে কোন দিনই হয়ে যেতে পারে। গভর্নমেন্ট সেই জন্যই আর রাখতে সাহস পাননি।" — এই কথা বলার সময় বিপিনবাবুর কণ্ঠ সুরেশ্বরবাবুর জন্য বেদনায় আর্দ্র হয়ে উঠেছে। এরপর ঘটেছে মল্লিকার পক্ষে আরও হৃদয় বিদারক ঘটনা, যখন শশধরের মালা গাঁথার জন্য যে ফুল মল্লিকা সংগ্রহ করেছিল

সেগুলি মল্লিকার ছোটবোন অতসী আঁচলে তুলে নিয়ে গেছে এবং সুরেশ্বরবাবুর গলায় সেই ফুলের মালা পড়াবার জন্য ছুটে গিয়েছে। ছোট্ট অতসীও দেশব্যাপী স্বাধীনতা লাভের উন্মাদনায় অংশগ্রহণ করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। মল্লিকা তার ফুল নিয়ে নেওয়া থেকে অতসীকে বাধা দিয়েছে কিন্তু অতসীকে দমানো যায়নি। মল্লিকা লক্ষ করেছে অতসীর এই কাজে তার বাবা বিপিনবাবু ধমক দিচ্ছেন বটে, কিন্তু সেই ধমকে জোর নেই বরং রয়েছে প্রশ্রয়ের সুর। তখন মল্লিকা অনুভব করেছে যে সে একা হয়ে গেছে। শশধরের জন্য শোক কেবল তার একার, তার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের স্বাধীনতা, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য মানুষের শুভকামনা, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা এ সবের মাঝে তার মৃত স্বামী শশধরের কোনো স্থান নেই এবং তার নিজেরও স্থান নেই। তখন তার অনুভব হয়েছে শশধরের অসম্পূর্ণতা। যখন দেশের সকলে ব্রিটিশ সরকারকে উৎখাত করতে একত্রিত হয়েছে, বৃহত্তর জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে তখন শশধর ব্রিটিশ সরকারের অনুগত পুলিশ কর্মচারী হিসেবে নিজের দেশের লোকের বিরুদ্ধেই সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। ফলে সে দেশের সকল লোকের চোখে পরিণত হয়েছে দেশের শত্রুতে এবং সকলের নজরে নীচে নেমে গেছে। এই সত্য উপলব্ধিতে মল্লিকা অনুভব করেছে, শশধরের যে চাকুরির জন্য সে অন্তরে গর্ব অনুভব করতো, তার সেই গর্বের বস্তুটি আজ হয়ে উঠেছে তার চরম লজ্জা ও অপমানের স্থান। শশধরের এই দেশদ্রোহীতার জন্য সেও দুঃখিত হয়েছে এবং মৃত স্বামীর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে অনুযোগ করেছে, কেন শশধর সুরেশ্বরবাবুর মত দেশপ্রেমিক হ'ল না, কেন এমন হীনতার মৃত্যু তাকে গ্রহণ করতে হল। যদি শশধর দেশপ্রেমিক হ'ত তবে তার মৃত্যুবার্ষিকীতে তাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে মল্লিকাকেও অপমানিত হ'তে হ'ত না। মল্লিকা তাই কেঁদে বলেছে — "ওগো তোমার ফুলের মালা কি অতসী তাহলে অমন করে কেড়ে নিতে পারত?" অতএব দেখা যায় যে, মল্লিকার হৃদ্‌গত অনুভূতি ও সত্যোপলব্ধির যন্ত্রণায় গল্পের পরিসমাপ্তি কিন্তু যেহেতু গল্পের মূল সংকট রাজনীতির সঙ্গে অন্বিত, তাই এ গল্প মনস্তাত্ত্বিক স্পর্শ সহযোগেও রাজনৈতিক গল্প হয়ে উঠেছে।

নরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ছোটগল্পের ধারায় আর একটি বিশিষ্ট গল্প হ'ল 'অপঘাত'। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে। গল্পটি এই কারণে বিশিষ্ট যে, একটি অতি সাধারণ গৃহবধূ কেমন ক'রে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল এবং রাজনৈতিক মতাদর্শগত কারণে শেষ পর্যন্ত প্রাণদান করল — তারই ইতিবৃত্ত 'অপঘাত' গল্পের মূল উপজীব্য। নরেন্দ্রনাথের অনেক গল্পেই, নারীরা যে সাবলম্বী হয়ে উঠছে, পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে ও সমানতালে বাইরের কাজ করছে, বহুদিনের শৃঙ্খল ভেঙে ফেলে গৃহের বাইরের পথে পা বাড়িয়েছে, এমন চিত্র আমরা পেয়েছি। 'অপঘাত' গল্পে নারীর এই স্বাধীন চিত্ততার ও কর্মপ্রবণতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সচেতনতা। বাংলাদেশের প্রচলিত চিত্র এই যে, প্রাক্ বিবাহ পর্বে পিতা এবং বিবাহ পরবর্তীতে স্বামীর রাজনৈতিক মতাদর্শকে মেয়েরা

অন্ধভাবে অনুসরণ বা সমর্থন ক'রে থাকে। কিন্তু এই গল্পে এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ এবং প্রায় অশিক্ষিত গৃহবধূ পরিবারের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নিজেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং সেই মতাদর্শকে অন্তরে ও বাহ্যিক আচরণে গ্রহণ করেছে। এই গৃহবধূ বেলার স্বামী সুধীর রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে না বরং বেলাকে তার রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্য ব্যঙ্গ করে বলে, 'রাজনীতি রঙ্গিনী'। কিন্তু এই ব্যঙ্গ বেলা গায়ে মাখেনা বরং এই রাজনীতির মধ্যে নিজের প্রাণের মুক্তি খুঁজে পায়, কারণ সে নিজেও 'রাজনীতি-ফিতি' বোঝে না, কিন্তু, "সবাই মিলে ভালো খেতে চাই, পরতে চাই, লেখাপড়া শিখতে চাই, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে চাই" — বেলা এই প্রার্থনা করে । যেহেতু এই আপাত সহজ কথাগুলি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত তাই তার প্রভাব এড়াতে পারেনা বেলা। রাজনীতির সর্বগ্রাসী প্রভাবকেও তাই সে স্বীকার করে নেয়, এবং স্বামীর কাছে রাজনীতির এই ব্যাপ্তির কথা ঘোষণা করে বলে — "চালের কাঁকর হয়ে রাজনীতি যে ভাতের হাঁড়ির মধ্যে ঢুকেছে। প্রতি গ্রাসে কির কির করে। খাওয়ার সময় টের পাওনা।" বেলার কাছে রাজনীতির অর্থ "রাজার নীতি" নয়, বরং ভালোভাবে বাঁচার শক্তি সঞ্চয়ের ক্ষেত্র। তাই যখন সুধীর তাকে ঘর সংসারে মন দেবার কথা বলেছে, তখন সে বলে, রাজনীতি সে করেনা, রাজা মন্ত্রী যুদ্ধ বিগ্রহের ধার সে ধারেনা বরং— "সমিতির মেয়েদের অসুখ বিসুখে সেবা শুশ্রূষা করি, যারা লেখাপড়া জানে না, তাদের লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করি। যাদের সংসার চলে না তাদের সেলাইর কাজ যোগাই।"

এই ক্ষেত্রে দেখা যায় বেলা যে কেবল বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পা বাড়িয়েছে তাই নয়, নিজের সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে, দেশ ও দশের সম্পর্কে ভাবতে শিখেছে এবং অন্যকেও প্রভাবিত করার ক্ষমতা অর্জন করেছে। একজন সাধারণ গৃহবধূকে এই রাজনীতির অঙ্গনে যে নিয়ে এসেছে সেও একজন মহিলা — "লম্বা কালো মত চশমা পরা উনিশ কুড়ি বছরের একটি মেয়ে" — তার নাম শুক্তি রায়। এই শুক্তি রায় বেলাকে রাজনীতির অঙ্গনে মুক্তি দিয়েছে এবং মহিলা সমিতিতে যোগদান করতে অনুপ্রাণিত করেছে। যখন প্রথমে বেলা এই সমিতিতে যোগদান না করবার জন্য যুক্তি দেখিয়ে বলেছে যে, সে ঝাড়া হাত পা নয়, তার ঘর সংসার স্বামী পুত্র পরিজন রয়েছে ও তাদের প্রতি তার কর্তব্যও রয়েছে। এর উত্তরে শুক্তি রায় বিপরীত যুক্তি দিয়ে বলেছে — "..... সেই সঙ্গে তোমার আরো একটি নতুন জিনিস হবে — সমিতি। দেখবে তার সঙ্গেও তোমার এক নতুন আত্মীয়তা। ঠিক রক্তের সম্পর্ক নয়, আর এক ধরনের সম্পর্ক, কিন্তু তার মধ্যেও রস কম নেই, রঙ কম নেই, সে সম্পর্ক রক্তের সম্পর্ককে আরো জোরালো করে, আরো মধুর করে।" সে আরও বলেছে যে, এই সমিতি করার ফলে বেলার সংসার ভেসে যাবে না, সংসারের ক্ষতি হবে না বরং আরও সুদৃঢ় হবে আরও সমৃদ্ধ হবে — "সংসারকে ভালো করে বাঁচাবার জন্যই তো এই সব সমিতি। এতো ভাই সন্ন্যাসীদের মঠ নয়, যে সংসারের সঙ্গে এর কোন

সম্পর্ক থাকবে না, আমাদের মঠ সংসারের জন্যই। ঘর গৃহস্থালীকে আরো আঁটসাঁট মজবুত করে বাঁধবার জন্যই আমরা এই সন্ন্যাস নিয়েছি।" অতএব দেখা যায় 'পতাকা' গল্পের রাজনৈতিক চরিত্র ইন্দিরার সঙ্গে 'অপঘাত' গল্পের বেলাদেবীর মাত্রাগত পার্থক্য রয়েছে। ইন্দিরা রাজনীতির কারণে প্রায় সন্ন্যাসিনী। সে অধিকাংশ সময় বাড়ির বাইরে রাজনৈতিক কাজে ব্যস্ত থাকে। সংসার বা পরিবারের প্রতি দৃষ্টিপাতের সময় সে পায়না এমনকি রাজনৈতিক মতাদর্শগত সূক্ষ্ম ভিন্নতার কারণে নিজের প্রেম জীবনকেও নিজ হাতে সে বিনষ্ট করেছে। কিন্তু আলোচ্য গল্পের বেলা রাজনীতিকে জীবনের সঙ্গে অন্বিত করেছে। তার রাজনীতি জীবন সংরক্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির সাধারণ নারী চরিত্রের গন্ডিবদ্ধ জীবনকে অস্বীকারের মহিমায় উজ্জ্বল। রাজনীতির হাতধরে বেলা নিজের পরিচিত ছকেবাঁধা জীবনের ছককে ভেঙে বেড়িয়ে এসেছে এবং নিজের জীবনকে ভিন্ন এক মাত্রা প্রদান করেছে। যখন বেলার জীবন রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছে তখনই ঘটেছে এক অভাবনীয় দুর্ঘটনা। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, দেশব্যাপী দেখা দিল অর্ধাহার, অনাহার। লেখক স্বল্পপরিসরে বর্ণনা করেছেন সেই দুঃসময়ের দিনগুলিকে — "কিন্তু দেখতে দেখতে সেই কাঁকরওয়ালা চালও এ অঞ্চলে দুস্প্রাপ্য হয়ে উঠল। চল্লিশ টাকা ছাড়িয়ে গেল তার মণ। টাকাতেও মেলেনা এমন হল অবস্থা। ..... ঘরে ঘরে অর্ধাহার, স্বল্পাহার শুরু হল। শহরতলীর সমাজের তলাকার বাসিন্দাদের দু'একবেলা অনাহারে চলতে লাগল।" সরকার থেকে ঘোষণা করা হল যে এই অনটন বা অভাব দীর্ঘস্থায়ী হবেনা। খুব শীঘ্র দূরদেশ থেকে জাহাজে চাল আসছে — এই অবস্থার সুরাহা হবে খুব শিগগিরি। কিন্তু খবর যত শীঘ্র এল আহার এল তত দেরিতে। ফলে সমগ্রদেশ চঞ্চল হয়ে উঠল, খাদ্যের দাবীতে মানুষ উত্তাল হয়ে উঠল। ভুখা মিছিল বার করে সবাই মহকুমা হাকিমের আদালতে গিয়ে প্রতিবাদ জানাবার কথা স্থির করল। অপরদিকে গোলমালের আশংকায় সরকার একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করেছে। সকল প্রকার সভা সমিতি, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এই পরিস্থিতিতে বেলা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। একদিন যে ভাবত কেবল নিজেকে নিয়ে, নিজের পরিবারকে নিয়ে, কিন্তু নতুন রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ বেলা ভেবেছে সমগ্র দেশকে নিয়ে। নিছক ব্যক্তিগত দান-দক্ষিণা সমগ্র দেশব্যাপী এই ক্ষুধার রাজত্বকে দূর করতে পারবে না তা সে উপলব্ধি করেছে। তাই সে নিজের সাধ্যমত অন্যের ক্ষিদে মেটানোর চেষ্টা করেছে কিন্তু এও উপলব্ধি করেছে যে, তার এই উদ্যোগ সকল মানুষের দুঃখ দূর করতে পারবেনা । সে কেবল ক্ষুদ্র অংশে তার দৃষ্টিকে আবদ্ধ না রেখে বৃহত্তর ক্ষেত্রের কথা ভাবতে চেয়েছে; বলেছে — "একি শুধু দান খয়রাতের ব্যাপার। দান খয়রাতে কি সকলের অভাব মিটবে।" সুধীর নিজের পরিবারের জন্য কিছু চাল সংগ্রহ ক'রে এনেছে, কিন্তু কেবল নিজের পরিবারের অন্ন সংস্থানই বেলার একমাত্র অন্বিষ্ট নয়। সে চায় সকলের ক্ষুধার নিবৃত্তি। তাই তার অন্তরের দাহ শান্ত হয়নি। বেলার এই মানসিকতাকে উপলব্ধি করেছে সুধীর, কিন্তু তাকে শান্ত করতে পারেনি। তাই লেখক

বলেন — " .. বেলা যে জ্বালার কথা বলেছে তা তো শুধু তার নিজের আর ছেলেপুলেদের পেটের জ্বালা নয়, সে জ্বালা মিটায় সাধ্য কি সুধীরের।" বেলা দেশব্যাপী অনাহারের অবস্থার পরিবর্তন চেয়েছে, ভিক্ষে করে যাঞ্চা করে খাদ্য সংগ্রহ করতে চায়নি বরং সদম্ভে ঘোষণা করেছে — "জোর করে দাবী জানাব, জোর করে আদায় করে আনব চাল।" এই বলে বেলা প্রতিবাদ মিছিলে যোগদান করেছে, কেবল নিজের ক্ষুধা নিবৃত্তিতে সন্তুষ্ট হয়নি বরং দেশশুদ্ধ সকলের জন্য অন্ন সংগ্রহের সংগ্রামে নেমেছে এবং পরিণামে পুলিশের নির্বিচার লাঠির ঘায়ে আত্ম-বলিদানে শহীদ হয়েছে।

এইভাবে 'অপঘাত' গল্পটিতে লেখক দেখিয়েছেন কেমন করে রাজনৈতিক সচেতনতার ফলে দৃষ্টির প্রসারতা ঘটে। সর্বগ্রাসী রাজনীতির প্রভাব কেমন ক'রে এক অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহবধূকেও বিশ্বের বৃহত্তর অঙ্গনে মুক্তি দিয়েছে, কেমন ক'রে এক ভিন্নমাত্রা ও ভিন্ন উচ্চতা দান করেছে তা যথার্থ শিল্পমণ্ডিতভাবে লেখক এই গল্পে প্রকাশ করেছেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে নরেন্দ্রনাথের বিশেষ প্রবণতাই ছিল মানুষের মনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রতি, বিশেষত তাঁর রোম্যাটিক মনের অন্তরঙ্গ পরিচয় দানের দিকে। রাজনীতি তাঁর অন্বিষ্ট বিষয় কোনদিনই নয়। যদিও রাজনৈতিক চরিত্র বা রাজনৈতিক মতাদর্শ ও সংঘাতকে নিয়ে তিনি গল্প রচনা করেছেন। কিন্তু এই ধরণের গল্পের সংখ্যা যেমন স্বল্প তেমনই সেইসব গল্পে রাজনীতির প্রভাবও অনেকাংশে সীমিত। উপরের রাজনৈতিক গল্পগুলির আলোচনায় এই সত্য প্রকাশিত। রাজনীতি মানুষকে কেমন ক'রে প্রভাবিত করে তার পরিচয় পরিস্ফুট হয় এমন একটি গল্প আলোচনা করে ছোটগল্পকার নরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনার আলোচনা সমাপ্ত করবো। এমন একটি গল্প হল 'বিষাদযোগ'। গল্পটির গোত্র নির্ণয়ে একে হয়তো যথার্থ রাজনৈতিক গল্প বলা চলে না কিন্তু রাজনৈতিক মতাদর্শ মানুষকে, তার চিন্তা চেতনা, বাহ্যিক ও অন্তরঙ্গ আচরণকে এমন কি তার ব্যবহার ও কথাবার্তাকে কেমনভাবে প্রভাবিত করে 'বিষাদযোগ' গল্পটিতে তা চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে।

'বিষাদযোগ' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল পৌষ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দে, রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায়। গল্পে নকশাল আমলের উত্তাল দিনের পটভূমিকায় এক অরাজনৈতিক চরিত্র শুভেন্দুর অপর বন্ধু বিজু বা বিজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ঘটনা ও বিজুর বোনের জীবনের একটি ট্র্যাজেডির পরিচয় লাভের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। শুভেন্দুর বন্ধু বিজন বা বিজুর জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা এবং এই আপাদমস্তক রাজনৈতিক চরিত্রটিই গল্পের রাজনৈতিক স্পর্শকে প্রকাশ করেছে। নকশাল আমলের উত্তাল দিনের পরিচয় রয়েছে গল্পে তবে তা প্রত্যক্ষভাবে নয়। তা ফুটে উঠেছে গল্পের চরিত্রদের বিশেষ করে শুভেন্দু ও বিজনের কথোপথনে আর এই কথোপকথন বিজন চরিত্রটির বিশিষ্ট রাজনৈতিক দিকটিকেও পরিস্ফুট করতে সহায়ক হয়েছে। শুভেন্দু বিজনের মাকে বলেছে — "সত্যি

মাসীমা কলকাতায় এসে দেখছি না এলেই ভালো হত, বোমা-বারুদ, গুলি-গোলা লেগেই আছে। এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় যাওয়ার জো নেই। কখন কোথায় কি বিভ্রাট ঘটে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে কলকাতা যেন এক পাগলের দুঃস্বপ্ন।" কিন্তু বিজন এই বক্তব্য শুনে চুপ থাকেনি বরং 'ফোঁস' করে উঠে তীব্র কণ্ঠে বলেছে — "স্বপ্ন নয় শুভেন্দু, কঠোর বাস্তব। বলতে পার ভয়ঙ্কর বাস্তব। কাল যবে জাগে তাকে সভয়ে অকাল কহে সবে। বহুদিনের অবিচার অব্যবস্থা গলদ আর গ্লানি জমে জমে পাহাড় হয়ে উঠেছে।"

এইভাবে গল্পের চরিত্রদের সংলাপে একটি রাজনৈতিক চরিত্রের মানসিকতা, চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতিকে তুলে ধরেছেন লেখক। এছাড়া বিজন চরিত্রের বিভিন্ন দিক ফুটে উঠেছে শুভেন্দুর চিন্তা প্রবাহের মধ্য দিয়ে। শুভেন্দুর স্মৃতি রোমন্থনের সূত্রে ফুটে উঠেছে বিজুর ছাত্রজীবনের কথা যখন তার রাজনীতিতে প্রবেশের প্রস্তুতিপর্ব চলছে — "ও আড্ডা দেয় না, সিগারেট খায় না,ক্বচিৎ কখনো সিনেমা দেখে। যেটুকু সময় পায় পড়াশোনা করে। আর বসে বসে ভাবে। চোখের সামনে ও যেন কিছু একটা দেখে। নিজের কল্পনার পৃথিবীকে। শুভেন্দু ভেবেছিল ও বুঝি কবিতা লিখবে। কিন্তু তা লিখল না। ও পদ্য লিখল না গদ্য লিখল না। সায়ান্সের ছেলে, অথচ সেই বিজ্ঞানচর্চাও ছেড়ে দিল। ও নিজের পাড়ায় স্কুল গড়ল, যুব সমিতি গড়ে তুলল। সমাজের যে স্তরের মানুষকে শুভেন্দু দূর থেকে দেখে বিজু তাদের ভিতরে চলে গেল।"

অপরদিকে শুভেন্দু বাস্তববাদী। বিজুর মত দেশোদ্ধারে ব্যস্ত হয়ে পড়েনি সে। বরং ভালো রেজাল্ট করেছে, ভালো চাকরি পেয়েছে এবং স্ত্রী কন্যাকে নিয়ে বিবাহিত জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যে দিনযাপন করছে। অন্য প্রান্তে 'ম্যাথেম্যাটিক্সে ব্রিলিয়ান্ট' বিজু অঙ্ক নিয়ে থাকেনি। জটিল গাণিতিক হিসেবে নিজের জীবনের গতিপথ নির্ধারণ করেনি বরং নিজের মতাদর্শকে জয়ী করতে চেয়েছে জীবনে। সে প্রেম চায়নি, যশ চায়নি, অর্থ চায়নি, নিজের দলের প্রধান স্থানও লাভ করেনি। বিজুর এই ত্যাগ ও তিতিক্ষাকে শুভেন্দু শ্রদ্ধা করেছে কিন্তু আবার মনে মনে সন্দিহানও হয়েছে। তার মনে হয়েছে — একটি বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকা, নিজের জীবনকে পদে পদে বঞ্চিত করে সকল বঞ্চিতদের মুখে হাসি ফোটানোর এই ব্রত কী মানুষকে পদে পদে আহত করেনা। তার মনে প্রশ্ন জেগেছে, রাজনৈতিক চেতনাই কি একমাত্র মানবিক চেতনা, আর রাজনৈতিক কর্মই কি মানবের একমাত্র কর্ম। এ যেন শুভেন্দুর আড়ালে লেখকের নিজেরই জিজ্ঞাসা। বিজুর প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও শুভেন্দু বিজুর জীবনের অসম্পূর্ণতা বা অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধেও সন্দিগ্ধ। লেখকের বর্ণনা এইরকম — "শুভেন্দু শ্রদ্ধা করে বিজনকে। যে শুধু নিজের জন্যে ভাবে না, দশজনের জন্য ভাবে, দশজনের কিছু না কিছু করে, আরো দশজনের শ্রদ্ধা সে পাবেই। কিন্তু শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে শুভেন্দু হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। সত্যিই কি তাই? সত্যিই কি রাজনৈতিক কর্মী আর নেতা মাত্রেই অতিমানব? বহুমানবের সুখ দুঃখে তাঁদের হৃদয় আন্দোলিত? রাজনৈতিক চৈতন্যই একমাত্র চৈতন্য? রাজনৈতিক কর্ম-মাত্রই একমাত্র

কর্ম? না কি লোকের আরো পাঁচটা কর্মপ্রবণতার মধ্যে এও একটি?" শুভেন্দুর আরও মনে হয়েছে যে, বিজন মুখে খুবই বিনয়ী, কিন্তু তার এই কর্মধারা, ত্যাগ ও সংগ্রামের কারণে সে মনে মনে গর্ব ও অহঙ্কার বোধ করে। এই প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার তাকে আত্মদানে উদ্‌বুদ্ধ করে, একই সঙ্গে তাঁর মনে অনুভব হয়েছে— "সব দলেরই তো একই বাণী, একই বিশ্বাস। এই বিশ্বাস ছাড়া বোধহয় কাজ করা চলে না। এই অহঙ্কার মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। আবার ভিতরে ভিতরে মারেও।"

এইভাবে দেখা যায় কেমন ক'রে একজন ব্যক্তি রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা চালিত হয়। রাজনৈতিক এক বিশিষ্ট মতাদর্শ কেমন করে তাকে আত্মদানে উদ্বুদ্ধ করে, তাকে ত্যাগে উৎসাহী ও স্বার্থহীনতায় আগ্রহী ক'রে তোলে। কিন্তু লেখকের একটি জিজ্ঞাসা এর মধ্য দিয়ে ধ্বনিত হয়েছে যে, এই সুনির্দিষ্ট একটি মতাদর্শকে জীবনের ধ্রুবতারা ক'রে তোলার মধ্যে কি কোথাও কোনো ফাঁকি নেই, এর ফলে কি মানুষের মানবিক অনুভূতিগুলিকে আহত করা হয়না? এই অন্তর্লীন প্রশ্নটিই গল্পের মূল উপজীব্য। মানুষের জীবনে রাজনৈতিক মতাদর্শ বা রাজনীতির যান্ত্রিক প্রভাব এ গল্পকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। অপরদিকে বিজন চরিত্রের বিপরীতে শুভেন্দু চরিত্রটিকে সৃষ্টি ক'রে তথাকথিত অরাজনৈতিক মানুষদের চিন্তা চেতনাকেও প্রকাশ করেছেন লেখক।

এইভাবে চরিত্রদের রাজনৈতিক চেতনার বিশ্লেষণ ছাড়াও নকশাল আমলে কেমন করে উজ্জ্বল প্রতিভার অধিকারী নবযুবকেরা প্রাণদান করেছে তার ছবিও পরোক্ষে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। বিজনের স্বল্প ভাষণে উঠে এসেছে এমনই একটি তথ্য — "শিখা একটি ছেলেকে ভালোবাসত। খুব ব্রাইট বয়। হঠাৎ গোলমালের মধ্যে পড়ে মারা গেল। হাসপাতালে দেওয়া হয়েছিল। বাঁচানো যায়নি।" এইভাবে দেখা যায় একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিতে কয়েকটি রাজনৈতিক চরিত্রকে তাদের কার্যকলাপ, জীবনদৃষ্টি ও অনেকাংশে পরিণতিকে লেখক গল্পে তুলে ধরেছেন। আবার একই সঙ্গে তুলনা দেবার জন্য ও চরিত্রগুলিকে যথাযথভাবে পরিস্ফুট করবার জন্য বিপরীত শ্রেণির চরিত্রও সৃষ্টি করে তাদের বিশ্লেষণের পথ সুগম করেছেন। অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনা যে সংকীর্ণ দৃষ্টিপ্রসুত নয়, তা যে বৃহত্তর অর্থে মানবিক তা তাঁর এই ধরনের গল্পগুলি পর্যালোচনা করলে বারংবার প্রমানিত হয়।

খ. দেশবিভাগ পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গ থেকে এবং এ বঙ্গে আগত মানুষদের নিয়ে নরেন্দ্রনাথ বেশ কিছু গল্প লিখেছিলেন। এই গল্পগুলি পর্যলোচনা করলে কেবলমাত্র ছোটগল্পকারের রাজনৈতিক চেতনা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় না, মানুষের সংগ্রামী দিক সম্পর্কে তাঁর বিশেষ মনোভঙ্গিটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে আসলে নরেন্দ্রনাথ মিত্র নিজে ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতবর্ষে আগত ছিন্নমূল উদ্বাস্তু।

যদিও তিনি নিজে দেশবিভাগের বহু পূর্বে ১৯৩৫ সালেই ফরিদপুর থেকে কলকাতায় চলে আসেন, কিন্তু পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কলকাতায় নিয়ে আসেন স্বাধীনতালাভের পর ১৯৪৮ সালে। ফলে দেশবিভাগ ও তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকাল উভয় সময়েই অবিভক্ত বাংলা ও বিভক্ত বাংলার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনি যে কেবল দেশবিভাগ পরবর্তী উদ্বাস্তু মানুষের সুকঠোর জীবন সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করেছেন তাই নয়, তিনি ছিলেন স্বয়ং সেই উদ্বাস্তু মানুষদের একজন। তবে পূর্বেই বলা হয়েছে যে দেশবিভাগের পূর্ব থেকে বঙ্গবাসী কলেজে পড়বার সময় থেকেই তিনি কলকাতাবাসী। সেই সময় থেকেই তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই শুরু। অতএব দেখা যায় দেশবিভাগের পর সরকারী উদ্বাস্তু হবার আগে থেকেই নরেন্দ্রনাথের উদ্বাস্তু হয়ে জীবনসংগ্রাম শুরু হয়েছিল। পূর্ববঙ্গে থেকে যাওয়া স্ত্রী, পুত্র পরিবার — প্রতিপালনের জন্য চল্লিশের দশকের শুরু থেকেই তিনি বিভিন্ন পেশায় নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন। অস্থায়ী ও স্বল্পআয়ের সেই সব বৃত্তির মধ্যে যুদ্ধের সময় অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে সৈন্যদের ব্যবহার্য দ্রব্য পরীক্ষকের কাজ থেকে শুরু ক'রে প্রতিরক্ষা বিভাগে করণিকের কাজ, ব্যাঙ্কে কাজ, খবরের কাগজের অফিসে কাজ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সব কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত ছিল ছাত্র পড়ানোর কাজ। এই সময়েই পত্রপত্রিকায় গল্প লিখেও তিনি স্বল্প অর্থের সংস্থান করেছিলেন। মেসবাড়িতে, ভাড়াবাড়িতে একাধিক ভাড়াটের সঙ্গে তিনি এই সময় দিনযাপন করেছেন। তাঁর এই জীবনসংগ্রামের চিত্র তাঁর লেখা চিঠি পত্রাদিতেও রয়েছে। ১২ই ভাদ্র, ১৯৪৬ তারিখে কলকাতা থেকে স্ত্রী শোভনা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে নরেন্দ্রনাথ লেখেন — "তার চেয়ে কলকাতাতেই টুইশন ও চাকরির খোঁজ করা যাক আরও কিছুদিন। দেখা যাক, সাহিত্যচর্চা করে কিছু পাওয়া যায় কিনা। ....আর একটা পনের টাকার টুইশন জুটবার খুবই সম্ভাবনা আছে সেপ্টেম্বরের প্রথম থেকে। আই. এর একটা ছেলেকে লজিক পড়াতে হবে। আনন্দবাজারে চেষ্টা করছি এখনও। কিছু কিছু আশা পাওয়া যাচ্ছে। তুমি কিছু চিন্তা করনা। যেভাবেই হোক, খাওয়া পরার সংস্থান করতেই পারবই।"[১৫]

অতএব দেখা যাচ্ছে একটা সময় নরেন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় এসে খাওয়া পরার সংস্থান করতেই চিন্তিত ছিলেন এবং এই সময় কঠোর সংগ্রাম ক'রে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করেছেন। কখনও বাস্তুচ্যুত এই মানুষটি শহরের জীবনযুদ্ধে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন কখনও ভেবেছেন পুনরায় পূর্ববঙ্গের গ্রামে ফিরে যাবেন। তাঁর এই মানসিক অবস্থার পরিচয়ও রয়েছে তাঁর লেখা চিঠিপত্রে —

"মাঝে মধ্যে আমার গ্রামে ফিরে যেতে ইচ্ছা করে, সেখানেই ইচ্ছা করে কর্মক্ষেত্র তৈরী করতে। শহরে আমি রস পাচ্ছিনে, শহর আমার কাছে বড় শুকনো, বড় নীরস মনে হচ্ছে। ....আমার ভয় হয়, এসব দিক থেকে আমার মতের সঙ্গে তোমার মতের মিল হবেনা। কিন্তু কোনও অফিসে ৪০/৫০ টাকায় কি তার চেয়ে কিছু বেশীতে সারা দিন, সারা জীবন কাটবে এ কথা ভাবতে আমার ভালো লাগেনা।

....কিন্তু পরিবার প্রতিপালনের জন্য অন্তত কিছু অর্থের প্রয়োজন আছে এবং তা নিজেকেই অর্জন করতে হয়।"[১৬]

পূর্বেই বলা হয়েছে দেশবিভাগের ফলে উদ্বাস্তু মানুষদের জীবনসংগ্রামের তিনি একজন প্রত্যক্ষদর্শীই শুধু নন, এই জীবন সংগ্রামের একজন অংশীদারও বটে। কলকাতায় যেহেতু তিনি প্রথমে একা এসেছিলেন আর পরিবারের লোকজন ১৯৪৮ -এর পূর্ব পর্যন্ত ছিল পূর্ব পাকিস্তানে সেইজন্য তিনি কেবল দেশবিভাগের ফলে ভারতবর্ষে আগত হিন্দু উদ্বাস্তুদের জীবনযুদ্ধকেই প্রত্যক্ষ করেননি, একই সঙ্গে সাক্ষী হয়েছিলেন দেশবিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যাওয়া মানুষদের মানসিক টানাপোড়েনের। এই কারণে নরেন্দ্রনাথের যে গল্প গুলিতে দেশবিভাগ পরবর্তী জীবনসংগ্রামের চিত্র পরিস্ফুট তাদের দুটি উপবিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। এই বিভাগ দুটি হল —

ক. দেশবিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতবর্ষে আগত মানুষের জীবনসংগ্রাম। এবং

খ. দেশবিভাগের পর পূর্ববঙ্গেই থেকে যাওয়া মানুষের কাহিনি।

এই প্রথম বিভাগের গল্পগুলিতে উল্লেখযোগ্য হল 'দ্বিচারিণী', 'কাঠগোলাপ', 'হেডমাস্টার' প্রভৃতি গল্পগুলি। আর 'পালঙ্ক' গল্পটিকে দ্বিতীয় উপবিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

তবে এ'কথা এখানে উল্লেখ করা অবশ্য কর্তব্য যে, এই গল্পগুলির মূল বিষয় কেবলমাত্র দেশভাগ হয়তো নয় কিন্তু এ গল্পের চরিত্রদের জীবনে সবচেয়ে বড় প্রভাব দেশভাগের। দেশভাগ ও তজ্জাত পরিস্থিতির শিকার এই মানুষগুলি সহসা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কেমন ক'রে প্রতিক্রিয়া করেছে তা এই গল্পগুলির প্রধান উপজীব্য। একস্থান থেকে অন্যস্থানে কপর্দক শূন্য অবস্থায় এসে উদ্বাস্তু মানুষদের মানসিকতা কেমন ক'রে পরিবর্তিত হ'ল বা হ'ল না তার প্রকাশে এই গল্পগুলি উজ্জ্বল।

'কাঠগোলাপ' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে, পূজা সংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকায়। এই গল্পের ঘটনা ধারাকে তিনটি সুস্পষ্ট ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম অংশে আছে গল্পের প্রধান দুটি চরিত্র নীরদ ও অণিমা, যারা পরস্পর স্বামী-স্ত্রী, তাদের পূর্ব পাকিস্তান থেকে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হয়ে কলকাতায় আগমন। দ্বিতীয় অংশ — নতুন নতুন শহরবাসী হ'য়ে শহরের প্রতি অণিমার মোহমুগ্ধতা ও শহুরে হবার তীব্র বাসনা ও অপরিণামদর্শিতা। তৃতীয় অংশ — এর পরিণামে নীরদের উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং অণিমার কঠোরতর জীবন সংগ্রামে অংশীদারিত্বের কাহিনি। এই গল্পে কাহিনির 'ক্রাইসিস' বা 'ক্লাইম্যাক্স' অংশ কেমন করে গড়ে উঠেছে তা পরবর্তী অধ্যায়ে গল্পের গঠন বিন্যাসের আলোচনায় বিস্তারিত করা হবে, এখানে দেখা যাক গল্পের কাহিনি কী এবং তাতে ছিন্নমূল একটি উদ্বাস্তু পরিবারের জীবনযুদ্ধের চিত্র কেমন ক'রে পরিস্ফুট।

নীরদ ও অণিমার কলকাতায় থাকবার বাড়ির বর্ণনায় কলকাতায় উদ্বাস্তু মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের বাসস্থানের অপ্রতুলতা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ প্রাপ্তির পরিচয় প্রকাশিত —

"অনেক খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত এই শহরতলীতে এসে ঘর মিলেছে একখানা, একতলার স্যাৎসেঁতে ঘর, চুন-বালি-ঝরা কত কালের পুরনো দেয়াল। জোরে বৃষ্টি নামলে ছাদ চুঁয়ে জল পড়ে জায়গায় জায়গায়। ঘটি বাটি পেতে রাখতে হয় ধরবার জন্য। জানলা দু'টি আছে বটে, কিন্তু খুলবার সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা নর্দমার গন্ধও আছে। বাথরুমটা প্রায় ব্যবহারের আযোগ্য। কল-চৌবাচ্চা নিয়ে তিন ঘর ভাড়াটে; আর উপরের বাড়িওয়ালার সঙ্গে মারামারি কাড়াকাড়ি। নোংরা-ভরা উঠান। মশা আর দুর্গন্ধ ভরা ঘর।"

নীরদদের এই মনুষ্য বসবাসের প্রায় অনুপযুক্ত স্থানও অনেক মানুষের পক্ষে ঈর্ষার বিষয়। বেলেঘাটা, নারকেলডাঙা, চড়কডাঙা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে যে সকল উদ্বাস্তু মানুষের ঢল, তাদের পক্ষে নীরদের মত বাসগৃহ জোগাড় করাও সম্ভব হয়নি। অণিমাদের গ্রামের সম্পন্ন ঘোষ পরিবারের বড় বউ মল্লিকা কলকাতায় এসে যে বাড়িতে উঠেছে তার বর্ণনাতেও দেশবিভাগ পরবর্তীকালের কলকাতার চিত্র পরিস্ফুট — "মিঞাবাগানের এক বস্তীর মধ্যে, আলো নেই, জল নেই বাড়িতে। রাস্তার টিউবওয়েল থেকে জল আনিয়ে নিতে হয়।"

শহরে আসা অণিমার যেমন ফেলে আসা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য গর্ব ও স্মৃতিমেদুরতা আছে তেমনি কলকাতা শহরের আধুনিকতাতেও সে মুগ্ধ। তার নিজের মনে হয়েছে নদীয়া-চব্বিশ পরগণার গ্রাম আর তাদের ফরিদপুর বরিশালের গ্রামের কোনো তুলনাই হয় না। স্কুল, পোস্ট অফিস, হাট বাজার এ সব দিক দিয়েই পূর্ববঙ্গের গ্রাম এদেশের শহরের সমান। তবুও কলকাতায় এসে শহুরে জীবনের প্রথম স্পর্শ ও স্বাদ পাওয়া অণিমার পক্ষে কলকাতায় আগমন সৌভাগ্য বলেই বিবেচিত হয়েছে। দেশবিভাগের ফলশ্রুতিকে সে নিজে প্রাথমিকভাবে দুর্ভাগ্য বলে অনুভব করতে পারেনি, বরং তার মনে হয়েছে — "শাপে বর হ'ল। ভাগ্যে পাকিস্তানের হাঙ্গামা হ'ল দেশে; হিড়িক লাগল গ্রাম ছাড়বার। ..... নইলে কি আসতে পারতুম কলকাতায়?"

কলকাতায় এসে অণিমার শুধু চালচলন ও আচার ব্যবহারেই পরিবর্তন আসেনি "মেয়েদের দাবী, মেয়েদের অধিকার, মেয়েদের মর্যাদা" প্রভৃতি আধুনিক ধ্যান ধারণা সম্পর্কেও কিছু কিছু জ্ঞান হয়েছে। সে পাড়া প্রতিবেশিদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলে, আলাপচারিতায় মুগ্ধ করে সকলকে। — কাহিনির এই পর্যন্ত নীরদ ও অণিমার জীবন সংগ্রাম কঠোরতর হয়ে উঠেনি, কিন্তু নীরদের সোয়া দু'শ টাকার চাকরি, নীরদ একদিন ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়। অণিমার কারণে — অকারণে অন্যের টেলিফোন ব্যবহার করার শখ এই চাকরি ছাড়বার কারণ। প্রতিবেশির ফোন থেকে পরিচিত, অর্ধ পরিচিত অনেককেই ফোন করত অণিমা । একদিন নীরদের অফিসেও সে টেলিফোন করেছে আর নীরদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে

অফিসের টেলিফোনকে ব্যক্তিগত কাজে আটকে রাখবার জন্য অপমানিত হতে হয়েছে নীরদকে। অপমানিত নীরদ চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে এসেছে। এই চাকরি চলে যাবার পর নীরদ অণিমার পরিবারের — এক ছিন্নমূল উদ্বাস্তু পরিবারের জীবনযুদ্ধ, কঠোরতম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। অর্থের অভাবে নীরদ পুনরায় অণিমাকে গ্রামে রেখে আসতে চেয়েছে, কিন্তু নীরদের এই প্রস্তাবে অণিমা কিছুতেই সম্মত হয়নি। আর্থিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অণিমার বাহ্যিক আচার আচরণও বদলে গেছে, তার শখ আহ্লাদ গেছে, ট্রামে বাসে করে ভ্রমণ বন্ধ হয়ে গেছে, সিনেমা দেখা, পাড়াপড়শি, পাড়াতুতো দেবর ননদদের চা-জলখাবার খাওয়ানো বন্ধ হয়ে গেছে। আশে পাশের মানুষরাও অনুভব করেছে এই পরিবারের আর্থিক দুরবস্থা, তারাও পরিত্যাগ করেছে এদের সংস্পর্শ। নীরদ ও অণিমা এদের পরস্পরের প্রতি প্রেম প্রীতির অভাবও পরিলক্ষিত হয়েছে অর্থের অভাবের সঙ্গে সঙ্গে। নরেন্দ্রনাথ এই পরিস্থিতির বর্ণনা করেছেন এইভাবে — "দু'জনের মধ্যে দিনের মধ্যে দু'তিনবার ক'রে যে ঝগড়া লাগছে, আজকাল তা ঠিক দাম্পত্য কলহ নয়, দু'টি অর্ধভুক্ত, বুভুক্ষু নরনারীর বিসম্বাদ — পরস্পরকে আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ।"

নীরদ একটি ষাট টাকার চাকরি কোনো রকমে জোগাড় করেছে কিন্তু তাতে অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। নীরদ তীব্র আর্থিক দুরবস্থার সময় পূর্ব পরিচিত, অর্ধ পরিচিত মানুষদের কর্মপ্রচেষ্টার খবর নিয়েছে। তাদের কর্মপ্রবণতাকে অনুসরণ ক'রে অর্থ উপার্জনের উপায় করার চেষ্টার কথা ভেবেছে। গল্পের এই অংশেও উদ্বাস্তু মানুষদের জীবনসংগ্রামের চিত্র উদ্ভাসিত, যেখানে দেখা যায়, পূর্বতন রেজেস্ট্রি অফিসের দলিল লেখক ভুবন ও ফটিক বেলেঘাটার বাজারে কুমড়ো ফালি ক'রে বিক্রি করে, পূর্বতন শিক্ষক নবীন অফিসে অফিসে ঘুরে ফাউন্টেন পেন, ঘড়ি প্রভৃতি মেরামত করে, আবার চরকুসুমপুরের ভদ্রেরা ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হ'য়ে বউবাজারের মোড়ে গামছা বিক্রি করে।

কিন্তু এইসব জীবিকা গ্রহণ করা নীরদের পক্ষে সম্ভব হয়নি; অপরদিকে তার আর্থিক অবস্থা দিনের পর দিন আরও খারাপ হয়েছে। ক্রমাগত ব্যয় সংকোচ করেও আর্থিক দুরবস্থা দূর করা যায়নি। কয়লা ধরাবার জন্য আর তাদের পরিবারে কাঠ কেনা হয় না, বরং নিজের হাতে ঘুঁটে দেয় অণিমা, কাপড় জামা আর লন্ড্রিতে কাঁচতে দেওয়া হয় না, খবরের কাগজ নেওয়াও বন্ধ হয়ে গেছে। বাজার খরচের জন্য বরাদ্দ হয়েছে দৈনিক দু'টাকার বদলে এক টাকা, কখনো চোদ্দ আনা। এখন খবরের কাগজ নীরদ বাইরের চায়ের দোকান থেকে দেখে আসে, আর সেই কাগজে সে দেখে কেবল কর্মখালির বিজ্ঞাপন। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু শরণাগতদের সাহায্যকেন্দ্র বা রিলিফ সেন্টারে রেশন কার্ড পিছু সপ্তাহের চাল, ময়দা, আটা বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষার লাইন চোখ পড়ে অসহায় নীরদের আর আগত ভবিষ্যতে সেই লাইনেই মুখ আড়াল ক'রে দাঁড়াতে হবে কিনা ভেবে অণিমা আতঙ্কিত হয়। স্ত্রীসুলভ লজ্জা পরিত্যাগ ক'রে অণিমাও অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টা করেছে। কখনও গানের স্কুলে,

কখনও সেলাই শেখাবার স্কুলে আবার কখনও নার্সিং -এর কাজে যোগদানের চেষ্টা করেছে সে, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা ও যোগ্যতার অভাবে সেই প্রচেষ্টা অণিমার ব্যর্থ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অণিমা নিজে কিছু উপার্জনের পথ খুঁজে পেয়েছে। পূর্ববঙ্গ থেকে তাদেরই মত এদেশে আগত দুই বয়স্থা মহিলা অণিমাকে দিয়েছে কিছু আর্থিক উপার্জনের খোঁজ। সে এখন রাত জেগে স্বামী নীরদকে গোপন ক'রে কাগজ কেটে আঠা দিয়ে জুড়ে ঠোঙা বানায়। একদিন সহসা রাতে ঘুম ভেঙে গেলে নীরদ দেখেছে কাজ করতে করতে ক্লান্ত অণিমার নিদ্রিত মূর্তি। সারাদিনের গৃহস্থালীদের কাজের পর সংসারের উপার্জন বৃদ্ধির জন্য ক্লান্ত শরীরে ঠোঙা তৈরি করতে করতে অণিমা ঘুমিয়ে পড়েছে তার কাজের উপকরণের মধ্যেই। নীরদের কাছে অণিমার গোপন কর্ম প্রচেষ্টা ধরা পড়ে গেছে আর এই সত্যের উদ্‌ঘাটনেই গল্পের পরিসমাপ্তি।

এইভাবে দেখা যায় গল্পটিতে একটি ছিন্নমূল উদ্বাস্তু পরিবার কেমন ক'রে এক নতুন দেশে, এক নতুন শহরে তাদের অস্তিত্বের শিকড়কে প্রোথিত করার চেষ্টা করেছে। কেমন ক'রে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান জোগাড়ের কঠোর সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। নীরদ ও অণিমার জীবনযাত্রার বর্ণনা, তাদের কর্মপ্রচেষ্টার বর্ণনা বিস্তারিতভাবে আর তার সঙ্গে অন্যান্য ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মানুষদের পরিচয় স্বল্প হ'লেও কিছুকিছু ক'রে গল্পে পরিস্ফুট। এই অংশে দেশবিভাগ পরবর্তী দেশত্যাগী মানুষের জীবনযুদ্ধের চিত্রটি প্রকাশিত হয়, আবার একই সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের দ্বিধাদ্বন্দ্বের দিকটিও সমানভাবে প্রকাশিত। ছিন্নমূল মানুষের জীবন সংগ্রামের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে নতুন দেশে আসবার পরেও পূর্ববঙ্গের জন্য এই মানুষগুলির স্মৃতিমেদুরতা। নরেন্দ্রনাথ নিজে যখন ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হয়ে কলকাতা শহরে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে অবতীর্ণ সেই সময় তিনি নিজে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে, তিনি গ্রামে ফিরে যেতে চান, শহরে তেমনভাবে তিনি রস পাচ্ছেন না। এই সঙ্গে আরও লেখেন — "চাষীদের নিয়ে, কৃষকদের নিয়ে নতুন সভ্যতা, নতুন সাহিত্য গড়ে তুলতে ইচ্ছা করে।"[১৭]

একইভাবে 'কাঠগোলাপ' গল্পের নায়ক নীরদও পূর্ববঙ্গের স্মৃতিতে আক্রান্ত। নীরদের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের আরও সাদৃশ্য আছে। নীরদ যেমন দীর্ঘ দশ বছর কলকাতায় একাকী বসবাসের পরেও কলকাতাকে ভালোবাসতে পারেনি, তেমনি লেখকও এই রকমই সময়কাল কলকাতায় অতিবাহিত করার পরেও কলকাতাকে খুঁজে পেয়েছেন শুকনো ও নীরস রূপেই। কলকাতা অপেক্ষা গ্রাম বাংলা বিশেষ ক'রে পূর্ববঙ্গই তাদের মনকে গভীরভাবে অধিকার ক'রে রেখেছে। 'কাঠগোলাপ' গল্পে নীরদের মানসিকতার বর্ণনায় তাই যেন আমরা নরেন্দ্রনাথের মানসিকতারই ছায়াপাত লক্ষ করি — "বছর দশেক ধ'রে শহরেই আছে নীরদ, পড়াশুনো করেছে, চাকরি-বাকরি করেছে, তবু সে নাগরিক নয়, মনে মনে গ্রামিক। এখনো সেই নদী-নালা, খাল-বিল, মাঠ-জঙ্গল, বেতের ঝোপ, বাঁশের ঝাড় তার নাড়ির সঙ্গে

জড়িয়ে আছে, রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে, মিলেছে, স্মৃতিতে আর স্বপ্নে। কিন্তু বাস্তবে মেলেনি। ছুটিছাটায় দু-এক সপ্তাহ, দু-এক মাস গ্রামে থেকেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে নীরদ, পালাই পালাই করেছে তার মন, পালিয়ে এসেছেও। কিন্তু শহরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই বাঁশের ঝাড়, গাছের ছায়া মনকে ঢেকে ফেলেছে, ছেয়ে ফেলেছে। শহরে যে সে কিছু ক'রে উঠতে পারল না, বোধহয় এই জন্যই। এত বড় রাজধানী সারা দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্র, তার কাছে গাঁয়ের বাজার ছাড়া বেশি কিছু নয়। এখানে লোকে আসে, চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য করে তারপর খেয়া পার হয়ে ফের যায় গ্রামে। থাকবার ঘুমাবার ঘর-গৃহস্থালী, চাষবাসের জায়গা সেখানে। এত বড় কলকাতা নীরদের মনে সেই হাটুরে গঞ্জের চেয়ে বেশি জায়গা জুড়তে পারেনি।"

মনের সমর্থন না থাকলেও বাস্তবে পরিস্থিতির চাপে নীরদকে বাসা বাঁধতে হয়েছে শহর কলকাতায়, বস্তু জগতের সঙ্গে আপোস করতে হয়েছে, স্ত্রী পুত্র পরিজনকে পালনের জন্য পরিশ্রম করতে হয়েছে, তাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে হয়েছে, কারণ তারা নীরদের কাছে 'দেশের সমাজের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি'। প্রসঙ্গত একটি তথ্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নরেন্দ্রনাথকেও তাঁর ব্যক্তিজীবনে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। ১১ই জানুয়ারি ১৯৪৬ তারিখে স্ত্রী শোভনা দেবীকে লেখা একটি পত্রতে তিনি লেখেন — "সপ্তাহে অন্তত দু'তিন দিন নিজেকে নিজে প্রশ্ন করি, শহরেই থাকব না গ্রামে গিয়েই থাকব। শহরে তোমাদের নিয়ে থাকতে হ'লে যতখানি আর্থিক ক্ষমতার প্রয়োজন, তার যে অনেক নিচেই পড়ে আছি, তা তোমার কাছে স্বীকার করতে কখনও সংকোচ করিনি, আজও করব না। যেমন তেমনভাবে যেমন তেমন জায়গায় নিজে থাকতে পারি, কিন্তু তোমাদের আনতে কষ্ট হয়।" এই চিঠিতেই অন্যত্র তিনি লেখেন — "নিজের মনের ঝোঁকটা যে শহরে থাকার দিকেই বেশি, এ কথা অস্বীকার করা যায় না, অন্তত কার্যত তাই দেখা যাচ্ছে। সুতরাং তোমাদের নিয়ে এখানেই বাস করবার সুবিধা এবং সাধ্য যাতে হয় সেদিকেই চেষ্টা করতে হবে। .....দিবু ডনের পড়াশুনোর সমস্যা রয়েছে। অন্তত পক্ষে আরও পাঁচ-ছয় বছর পরে দিবুকে হয়তো নিজের কাছে এনে রাখা যাবে, কিন্তু তার আগে তা পারা যাবে না।"[১৮]

— এ যেন অণিমা ও নান্তুকে নিয়ে নীরদের ভাবনারই প্রতিচ্ছবি। প্রকৃতপক্ষে নীরদ ও অণিমার জীবন সংগ্রামের চিত্র অনেকটাই নরেন্দ্রনাথের নিজস্ব, বাস্তব ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল। গল্পের পরিণতি ও 'ট্রিটমেন্ট' হয়তো আলাদা, কিন্তু একটি ছিন্নমূল উদ্বাস্তু পরিবারের জীবনসংগ্রাম ও তার সঙ্গে অন্যান্য ছিন্নমূল মানুষদেরও উল্লেখ এবং লেখকের অতি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকেই 'কাঠগোলাপ' একটি পৃথক উচ্চতা লাভ করেছে।

নরেন্দ্রনাথ রচিত যে সব ছোটগল্পগুলিতে দেশভাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে

সেই ধারার গল্পগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প হল 'পালঙ্ক'। 'পালঙ্ক' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে পূজাসংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকায়। অবশ্য গল্পটি প্রকাশের পূর্বে শ্রাবণ ১৩৫৯ তারিখে বেতারে পঠিত হয়েছিল। 'পালঙ্ক' গল্পটিতে দেশবিভাগ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করলেও এই শ্রেণির অন্য গল্পের থেকে এই গল্পটি ভিন্নতর মাত্রা নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত। কারণ 'হেডমাস্টার', 'দ্বিচারিণী', 'কাঠগোলাপ' প্রভৃতি গল্পের মত এ গল্পে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু মানুষের জীবন সংগ্রামের চিত্র নয় বরং দেশভাগের পরও দেশেই থেকে যাওয়া, নিজের পিতৃপুরুষের ভিটেমাটিকে প্রাণপণে আঁকড়ে থাকা এক মানুষের কাহিনি বিবৃত। গল্পের কাহিনি বা আখ্যান অংশ সুবিশাল নয়, আর এই কাহিনি অংশে একটি পালঙ্কেকে ঘিরে পালঙ্কের মূল মালিক রাজমোহন ও সেই পালঙ্কের নতুন মালিক মকবুলের অন্তর্লীন মানসিক সংঘাতের চিত্র পরিস্ফুট। এই সংঘাতের মধ্য দিয়ে প্রকৃত পক্ষে পরিস্ফুট হয়েছে দেশত্যাগ না করে পূর্ব পাকিস্তানেই পূর্ব অভিজাত্য, মান-মর্যাদা কে পরিত্যাগ না ক'রে পিতৃপুরুষের ভিটেতে থেকে যাওয়া মানুষের মানসিক অবস্থার কথা। দেশ-বিভাগের পাঁচ বছরের মধ্যে রচিত এই গল্পের কাহিনিভাগ নিয়ে সমালোচক বলেন — "দেশবিভাজনের অভিশাপ, বেদনা, নিঃসঙ্গতা, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, জাত্যভিমান এসব মিলেমিশেই 'পালঙ্ক' গল্পের কাহিনীভাগ নির্মিত।"[১৯]

গল্পের কাহিনি অংশ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দেশবিভাগের পর বৃদ্ধ রাজমোহনের পুত্র সুরেন তার স্ত্রী ও চার সন্তানকে নিয়ে ভারতবর্ষে চলে গেছে কিন্তু রাজমোহনকে কিছুতেই তার পিতৃপুরুষের ভিটে পরিত্যাগ করতে রাজি করানো যায় নি। যখন গ্রামের প্রায় সকল হিন্দু পরিবারই তাদের বিষয় সম্পত্তি বিক্রি ক'রে ভারতবর্ষে পাড়ি জমিয়েছে, যখন গ্রাম শূন্য করে অন্যান্য বৈষয়িক মানুষেরা নতুন দেশে গিয়েও কিছুটা গুছিয়ে বসতে পেরেছে তখন রাজমোহন নিজের ভিটে মাটির মায়া পরিত্যাগ করতে পারেনি আর পূর্ব পাকিস্তান দেশবিভাগের পর নতুন দেশ হয়ে উঠলেও সেই দেশকে তার নিজের দেশ নয় বলে মনে করতে পারেননি। একটি গাছের ডাল, এক ছটাক জমিও তিনি প্রাণে ধরে বিক্রি করতে পারবেন না। তার মৃত্যুর পর মুসলমানেরা সব লুটেপুটে খাবে তাও স্বীকার, কিন্তু তিনি নিজে হাতে নিজের সম্পত্তির কোনো অংশ বিক্রয় করতে পারবেন না। কারণ তিনি বলেন — "আমি কিনি আমি বেচি না।" জীবনে কিছুই রাজমোহন বিক্রয় করেননি, শুধু একটি জিনিসই তিনি ক্রোধবশত বিক্রি করে ফেলেছেন, তা হ'ল তার পালঙ্কখানা। রাজমোহন, যিনি গ্রামে ধলাকর্তা নামে পরিচিত তার এই পালঙ্ক বিক্রয়ের খবরে গ্রামের লোক হতবাক হয়ে গেছে। কারণ তারা জানে নিজের সম্পত্তির এক কণা অংশ বিক্রয় করতেও ধলাকর্তার কষ্ট হয়, তার সম্মানে বাধে। তিনি ভিটের একটি বাঁশ বিক্রয় করেন না, এমন ধলাকর্তা তার পালঙ্ক কেন বিক্রয় করলেন, তার একটা ইতিহাস আছে। রাজমোহনের পুত্র সুরেন তার স্ত্রী অসীমা ও পুত্রকন্যাদের নিয়ে বেলেঘাটায় যে বাড়িতে উঠেছে সে বাড়ির পরিবেশ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর।

স্যাঁতস্যাঁতে সেই বাড়ির দেয়াল আর মেঝে দিয়ে যেন দিনরাত জল চুঁইয়ে পড়ছে। এমন স্যাঁতস্যাঁতে মেঝেতে শুয়ে তাদের পুত্র কন্যা কানু, টেনু, রীণা, মীনা প্রভৃতিদের অসুখ বিসুখের আর বিরাম নেই। তাই স্বামী সুরেনের সম্মতিক্রমে অসীমা শ্বশুর রাজমোহনকে পত্র দিয়ে জানিয়েছে যে, তার বিয়েতে যৌতুক হিসেবে প্রাপ্ত সেগুন কাঠের পালঙ্কটি যেন রাজমোহন বিক্রয় ক'রে সেই টাকা কলকাতায় পাঠিয়ে দেন, যাতে সেখানে একটি খাট বা তক্তপোষ কিনে অসীমা তার পুত্রকন্যাদের কষ্ট দূর করতে পারে। যেহেতু পালঙ্কটি রাজমোহনের নিজের সম্পত্তি নয় সেইহেতু সেটি বিক্রয় করতে তার মানমর্যাদা ক্ষুণ্ন হবার বা অসম্মত হবার কোনো কারণ থাকবার কথা নয় বলেই অসীমা চিঠিতে উল্লেখ করেছে।

স্বভাবতই এই পত্রাঘাত সহ্য করা রাজমোহনের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই পত্রের বিষয়বস্তু রাজমোহনের কাছে বিশেষ পীড়াদায়ক ও অসম্মানজনক বলে বোধ হয়েছে। তীব্র ক্ষোভ ও দুঃখে তিনি আকস্মিক উত্তেজনাবশত সেই পালঙ্ক যার দাম দুশো টাকার কম হবে না তা মকবুল শেখের কাছে মাত্র পঞ্চাশ টাকায় বিক্রয় করেছেন। মকবুল কোনো সম্পন্ন গৃহস্থ নয়। হতদরিদ্র মকবুল দরিদ্র জীর্ণ গৃহে বসবাস করে। তার জীবনযাত্রার সহায় শারীরিক শ্রম ও জীর্ণতর একটি নৌকা। দেশত্যাগের হুজুগে হিন্দুরা বহু খাট, চেয়ার, টেবিল, আলমারি, বাসন কোসন জলের দরে বিক্রয় করেছে, কিন্তু অর্থের অভাবে মকবুল সে সবের কিছুই কিনতে পারেনি। এখন ধলাকর্তা রাগের মাথায় একটি চমৎকার পালঙ্ক বিক্রয় করতে যাচ্ছেন দেখে মকবুল সস্তার এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চায়নি। বহুদিনের সঞ্চিত রক্তজল করা অর্থ, যা দিয়ে সে গরু কিনবে, ঘর ছাইবে, স্ত্রীর গয়না গড়িয়ে দেবে বলে স্থির ক'রেছিল তাই সে ব্যয় করেছে সেই পালঙ্ক ক্রয় করবার জন্য। সেই পালঙ্কও অতীব শৌখিন ও দামি জিনিস — "আগাগোড়া সেগুন কাঠের তৈরি, চারিদিকে চারটি পায়ায় বড় বড় বাঘের থাবা, হাতখানেক চওড়া বাতায় ভারি সুন্দর নকসার কাজ। উপরে লতা, নীচে লতা। মাঝখানে সুদীর্ঘ ছোট ছোট হাতীর সারি।"

রাগের মাথায়, আকস্মিক উত্তেজনাবশত এমন পালঙ্ক ধলাকর্তা মকবুলকে বিক্রয় ক'রে দিয়েছেন বটে কিন্তু রাগ পড়তেই তিনি তার পালঙ্কের জন্য গভীরভাবে শোকাভিভূত হয়ে পড়েছেন এবং তার পালঙ্কখানা পুনরায় ফিরে পাবার চেষ্টা করেছেন। ঘর সংসার, তৈজসপত্র সকল কিছুর উপরেই অগাধ মায়া রাজমোহনের, তাই যে ঘরে সেই পালঙ্কখানা ছিল সেই ঘরে তিনি প্রবেশ করেই বেড়িয়ে এসেছেন। পালঙ্ক শূন্য সেই ফাঁকা ঘরের শূন্যতা যেন তার হৃদয়ে গিয়ে আঘাত করেছে, তার বুক খালি ক'রে দিয়েছে। নিজের ঘরে এসে তিনি আহ্নিকে বসেছেন কিন্তু ইষ্ট মন্ত্রের বদলে বারবার পালঙ্কের কথাই তার মনে হয়েছে। পালঙ্ক হারানোর শূন্যতা তার জীবনের অন্যান্য শূন্যতাকে মনে করিয়ে দিয়েছে। নিজের মৃত স্ত্রী ও দেশবিভাগের ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি, নাতনি প্রভৃতিদের বিচ্ছেদ বেদনাকে তিনি পুনরায় অন্তরে অনুভব করেছেন। দেশবিভাগের ফলে দেশেই থেকে যাওয়া নিঃসঙ্গ মানুষের নিঃসঙ্গতা

ও একাকীত্বের বেদনা যেন ফুটে উঠেছে লেখকের বর্ণনায় — "হঠাৎ বুকের মধ্যে এক অসীম শূন্যতা বোধ করলেন রাজমোহন। তাঁর কেউ নেই, তাঁর কেউ নেই। বহুদিন, দশ বছর আগে মরে - যাওয়া স্ত্রী সরলার মুখ মনে পড়ল, প্রবাসী পুত্র-পুত্রবধূর, নাতি-নাতনির বিচ্ছেদ-দুঃখের কথা মনে পড়ল, কেউ যেন তাঁর থেকেও নেই, সংসারের সব সরে গেছে, সব চলে গেছে, সব ভুলে গেছে রাজমোহনকে। তিনি একা, এই শূন্য পুরীতে; এই শূন্য সংসারে তিনি একান্তই নিঃসঙ্গ।"

পালঙ্কটি ফিরে পাবার জন্য তিনি মকবুলকে ডেকে পাঠিয়েছেন কিন্তু মকবুল দেখা করেনি। ধলাকর্তার কমবেয়সী ভৃত্য কালুর কথায় ফুটে উঠেছে পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন অবস্থা, হিন্দু মুসলমানদের পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্কের বিনষ্টির ইঙ্গিত; মকবুল ধলাকর্তার আহ্বানকে অগ্রাহ্য করায় কালু বলেছে — "এখন ওয়াগো দিনকাল ওয়াগোই রাজত্ব।"

এরপর ধলাকর্তা স্বয়ং গেছেন মকবুলের বাড়ি। বিক্রয়মূল্যের উপর আরও পাঁচটি টাকা দিয়ে তিনি পালঙ্কটি ফিরিয়ে নিতে চেয়েছেন কিন্তু তার এ প্রস্তাবে মকবুল রাজি হয়নি; কিন্তু ধলাকর্তা এতেও নিরস্ত হননি, পালঙ্কটি ফিরে পাবার প্রত্যাশা পরিত্যাগ করেননি। শুধু পালঙ্ক নয় বাড়ির প্রতিটি জিনিসের প্রতিই তার মমতা অসীম। তাই ছদন মৃধার মত মানী গুণী ও ধন্যাঢ্য ব্যক্তি যখন রাজমোহনের কোনও জিনিস বিক্রি করলে তা কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে তখন রাজমোহন তীব্র ক্রোধে বলেছে — "তুমি চইল্যা যাও মেরধা, তুমি নামো আমার বাড়ি থিকা। আমি মইরা গেলে আইসা ভোগ দখল কইরো। কিন্তু যতক্ষণ বাইচা আছি, আমি আমার বাড়ির কিছু বিক্রি করব না। বেচিও নাই, বেচবও না।" এই অসীম আসক্তিবশত রাজমোহন মকবুলের অসম্মতিতে ক্ষান্ত না হয়ে পালঙ্কটি পুনরায় হস্তগত করবার প্রত্যাশায় গ্রামের মাতব্বর মানুষদের সাহায্য লাভের প্রচেষ্টা করেছেন। কিন্তুগ্রামের সম্মানিত ব্যক্তিরা সমবেতভাবে মকবুলকে বোঝানোর চেষ্টা করার পরও মকবুল ধলাকর্তাকে পালঙ্ক ফিরিয়ে দিতে রাজি হয়নি। অপরদিকে পাড়ার মুসলমানেরাও মকবুলের পক্ষই অবলম্বন করেছে। তাই গ্রামের অপর ব্যক্তি শরৎ বলেছে — "সব মেঞাই একজোট হইছে বোঝলেন ধলাকর্তা। তলে তলে সকলেরই সায় আছে। নইলে মকবুল শেখের সাধ্য কি আপনার মুখের পর বলে যে, বিচার মানব না। চুপ কইরা থাকেন ধলাকর্তা, সইয়া যায়ন, সইয়া যায়ন। যখন যেমন তখন তেমন।" — এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে দেশবিভাগ পরবর্তী দুই ধর্মের মানুষের পারস্পরিক অবিশ্বাসের চিত্রটিই যেন প্রকাশিত।

এছাড়া ইয়াকুব চৌকিদারের সঙ্গে মকবুলের কথোপকথনেও মুসলিমদের মানসিকতা ও পাকিস্তান হবার পর সেখানে হিন্দুদের অসহায়তার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। ইয়াকুবকে সঙ্গে নিয়ে পালঙ্ক ঘরে তুলবার সময় মকবুল ধলাকর্তা সম্পর্কে তাকে বলেছে — "শালার বুইড়া কি আইচ্ছা বজ্জাত চকিদার! মানুষ নয়, যখ। যখের ধনের মত সব আগলাইয়া রইছে। এত হিন্দু চইলা গেল, ও বুইড়ার যাওনের নাম

নাই! তা না গেছে না গেছে, ওয়ার জ্বালায় একটা ফল-পাকড়া ছোঁবার জো নাই, একটা জ্বালানি কুটা ছোঁয়ার জো নাই। অমনি ধাইয়া আসবে মারতে। আরে চউখ বোজলে খাব তো আমরাই, থাকব তো আমরাই। সুরেন ভুঁইঞা ফের আবার থাকতে আসবে নাকি ওই বাড়িতে ? ছাইড়া দ্যাও মোনে।" মকবুলের এই বক্তব্যে দেশবিভাগ পরবর্তীকালে পাকিস্তানে মুসলিমদের আধিপত্যের দিকটি যেমন প্রকাশিত তেমনি সংসারের প্রতিটি জিনিসের প্রতি ধলাকর্তার অপরিসীম মমতার দিকটিও প্রকাশিত। এরপর ইয়াকুব ও মকবুলের পরবর্তী কথোপকথনেও পাকিস্তানে ইসলামধর্মাবলম্বী মানুষদের প্রাধান্য ও মানসিকতার দিকটি প্রকাশিত হয়। গল্প থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করা হল —

"ইয়াকুব বলল, 'তা ঠিক। পাকিস্তানে সে আর সাহস কইরা আসতে পারবে না। গেছে তো গেছেই।'

মকবুল বলল, 'বুইড়ার বাড়ি আমি খাস পাকিস্তান বানাব। আমার পোলাপান, আমার কবিলা ওয়ার ওই শানবান্ধানো ঘরের ভেতর দিয়ে নইড়া চইড়া বেড়াবে। আমি জিতছি তুমি কইলা মেঞাভাই, কিন্তু আমার তো মনে হয় আমি ঠইগা গেলাম। এ খাট আমি এমনই পাইতাম, কাইড়া নিতাম বুইড়ার কাছ থিকা।"

তবে দেশবিভাগের পরবর্তীকালে পাকিস্তানে এই মানসিকতাই সর্বত্র প্রাধান্য পায়নি। যে সকল হিন্দু মানুষেরা দেশভাগের পরেও পুরানো ভিটে মাটি ও ভিন্নধর্মী প্রতিবেশীদের আঁকড়ে ধরে আছেন তাদের প্রতি অনেকের মনে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিও বর্তমান, ধলাকর্তাও এই শ্রেণির মানুষ তাই গেদু মুন্সী মকবুলকে পালঙ্ক ফিরিয়ে দেবার অনুরোধ করে বলেছে — "কাজটা তুমি ভালো কর নাই শেখের পো, দেশ ছাইড়া সব হিন্দু মশাইরা চইলা গেছেন। কিন্তু ধলাকর্তা আমাগো মায়া ছাড়েন নাই, তিনি আমাগো জড়াইয়া ধইরা আছেন। এখনো আমার তানার জমি চষি, তানার বাড়িতে বসি, আপদে-বিপদে তানারে ডাকি।"

যাইহোক মকবুলের কাছ থেকে কোনভাবেই পালঙ্ক ফিরে না পেয়ে ধলাকর্তা কৌশলে তার কাজকর্মের পথ বন্ধ করে দিয়েছেন, যাতে মকবুল আর্থিক দুরবস্থায় তার পালঙ্ক বিক্রয় করে দিতে বাধ্য হয়। ধলাকর্তার অসহযোগিতায় মকবুলের দিনযাপন দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে, সপরিবারে অনাহারের মুখে পড়ে মরণাপন্ন হয়ে পড়েছে সে, কিন্তু তবুও নিজের জেদ বজায় রেখেছে, শত প্রলোভন সত্ত্বেও ধলাকর্তাকে বা অন্য কারও কাছে সে পালঙ্ক বিক্রি করেনি। জীবনধারনের দুরূহ সংগ্রামে সে নিজের গরু বিক্রি করে দিয়েছে, নৌকা বিক্রি করে দিয়েছে, তথাপি অবস্থা তার ফেরে নি, বরং দিন দিন আগের থেকেও খারাপ হয়েছে। সকল কিছু নিঃশেষ হবার পর শুধু টিকে গেছে তার ঘর আর ঘরজোড়া পালঙ্কখানি। মকবুলের পরম দুরবস্থার কালে স্ত্রী ফতেমার সঙ্গে তার কথোপকথনে দরিদ্র মানুষের অসহয়তার চিত্র পরিস্ফুট।

দেশভাগ, রাজনৈতিক পালাবদল ও পট পরিবর্তনেও যে দরিদ্র মানুষ দারিদ্র্যের অন্ধকারেই নিমজ্জিত থাকে তা বোঝা যায় যখন ফতেমা বলে — "শুনি এখন তো আমাগো পাকিস্তান। আমাগো মোসলমানের রাজত্ব। এখন আমরা না খাইয়া মরব ক্যান ?" এর উত্তরে মকবুল চরম দুঃখ ও নৈরাশ্য নিয়ে বলেছে — "গরীবের হিন্দুস্থানও নাই, পাকিস্তানও নাই, কেবল এক গোরস্থান আছে ফতি, গোরস্থান আছে।"

মকবুল পালঙ্ক রক্ষা করবার জন্য যত জেদ করেছে অপরদিকে পালঙ্ক ফেরত পাবার জন্য ধলাকর্তাও চেষ্টার ত্রুটি করেননি। বাড়ির চাকর কালুকে, অধিক অর্থ দেবার প্রস্তাব দিয়ে মকবুলের কাছে পাঠিয়েছেন, মকবুল রাজি না হবার পরেও ধলাকর্তা নিরস্ত না হয়ে নিজেই বাসক পাতা আনবার ছল করে বার বার মকবুলের বাড়িতে গেছেন, দরজার ফাঁক দিয়ে হতাশা পূর্ণ দৃষ্টিতে নিজের পালঙ্কের দুরবস্থা দেখেছেন। চিন্তা ও মানসিক যন্ত্রণায় ধলাকর্তা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অপরদিকে মকবুলের দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে একের পর লোক এসেছে অধিক অর্থের লোভ দেখিয়ে তার পালঙ্ক কিনে নিতে। মকবুলও পেটের ক্ষুধা চেপে রেখে, ক্ষুৎ পিপাসাকে প্রাণপণে দমিয়ে রেখে অর্থের প্রলোভনকে ঠেকিয়ে রেখেছে। ধলাকর্তা তার আরাধ্য রাধাগোবিন্দের মূর্তির সামনে বসে একদিন প্রার্থনা করেছেন তার মায়ার বন্ধন কাটাবার জন্য, তার কামনা-বাসনা, লাঞ্ছনা ও অপমান দূর করবার জন্য। একদিন সহসাই পালঙ্কের প্রতি ধলাকর্তার মোহ অপসৃত হয়েছে। অসুস্থ অবস্থায় ধলাকর্তা গভীর রাতে একাকী উপস্থিত হয়েছে মকবুলের বাড়িতে আর মকবুল দুঃসহ ক্ষুধার জ্বালাকে চেপে রেখে আতাজদ্দির প্রলোভনকে ফিরিয়ে দিয়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়েছিল। ধলাকর্তা দেখলেন তার পালঙ্ক, আরও দেখলেন পালঙ্কের উপর শায়িত মকবুলের দুই শিশু সন্তানকে। মকবুল ধলাকর্তাকে তার পালঙ্ক খুলে দিতে চেয়েছে কিন্তু ধলকর্তা আর সে পালঙ্ক চাননা, পালঙ্কের উপর শায়িত মকবুলের সন্তানদের দেখে তার মনে হয়েছে যেন স্বয়ং রাধাগোবিন্দ সেখানে শুয়ে আছেন, স্বয়ং ঈশ্বর যেন মুহূর্তে তার বিষয় বাসনাকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। এই স্থানে গল্পের সমাপ্তি। গল্পের অন্তিম বার্তা হয়তো ভিন্ন। কিন্তু ধলাকর্তার চরিত্রের মধ্যে দিয়ে দেশবিভাগের পরও যে সকল হিন্দু মানুষ প্রাণপণে নিজেদের বিষয় সম্পত্তিকে পাকিস্তানে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে এবং গল্পের বিভিন্ন স্থানে দেশভাগের ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতি ও মানুষের বিশিষ্ট মানসিকতা যে ভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাতে নরেন্দ্রনাথের দেশবিভাগ সম্পর্কিত গল্পের ধারায় 'পালঙ্ক'একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে।

ছোটগল্পকার নরেন্দ্রনাথের সমাজবীক্ষা ঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালে ও তার পরবর্তী সময়কালে নরেন্দ্রনাথের লেখনী বিশেষরূপে

ক্রিয়াশীল ছিল। বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তি, দেশভাগ, উদ্বাস্তু স্রোত প্রভৃতি একের পর এক আঘাতে প্রচলিত বাঙালি সমাজের কাঠামোটি ভেঙে পড়েছিল। শ্রমিক শ্রেণি যেমন কর্মচ্যুত হয়ে পড়েছিল তেমনি গ্রাম্য কৃষি নির্ভর জীবন পরিত্যাগ করে কৃষকেরাও হয়েছিল শহরমুখী। একান্নবর্তী পরিবারগুলির ভাঙন এবং জীবন ও জীবিকার তাগিদে পারিবারিক জীবনের সকল বন্ধন শিথিল হয়ে পড়েছিল, ব্যক্তিগত জীবনে শুচিতা, সম্মানবোধ প্রভৃতির সংজ্ঞাও পাল্টে গিয়েছিল। বেঁচে থাকবার দুস্তর ও দুরন্ত প্রয়াসে কখনো পিতা মেয়েকে ভোগের সামগ্রী হিসেবে বিক্রি করেছে, কখনো বা স্বামী স্ত্রীকে ঠেলে দিয়েছে পতিতাবৃত্তির দিকে, আবার কখনও নিরন্ন অসহায় স্ত্রীলোক জীবনধারণের প্রয়াসে নিজেই অবলম্বন করেছে দেহোপজীবিনীর বৃত্তি। মানুষের সকল মূল্যবোধের পরিসমাপ্তি ও নৈতিক অধঃপতনের চিত্র কিছু পরিমাণে ফুটে উঠেছে নরেন্দ্রনাথের ছোটগল্পসমূহেও। যদিও নরেন্দ্রনাথের মানসিকতার সঙ্গে অবক্ষয়িত সমাজের চিত্রণের দিকটি ঠিক খাপ খায় না তবুও তাঁর 'চোরাবালি', 'রসাভাস', 'পুনশ্চ' প্রভৃতি গল্পগুলিতে সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্রটি পরিস্ফুট। এই শ্রেণির গল্পগুলিতে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের মূল্যবোধের ভাঙন ও অবক্ষয়ের চিত্র যেমন পরিস্ফুট হয়েছে তেমনি আবার অন্যদিকে এই ছোটগল্পগুলিতে ফুটে উঠেছে নারীর আত্মাধিকার লাভের প্রচেষ্টা বা স্বাধিকার অর্জনের লড়াই এবং একে কেন্দ্র করে পারিবারিক নানা অশান্তি। এই ধারার কোন কোন গল্পে স্থান পেয়েছে নারীর অবনমন ও পদস্খলনের দিকটিও।

নরেন্দ্রনাথের অবক্ষয়িত সমাজচিত্রণের গল্পের ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য নাম 'চোরাবালি'। 'চোরাবালি' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল পূজা সংখ্যা 'কলিকাল' পত্রিকায়, ১৩৫২ বঙ্গাব্দে। এই গল্পটির পূর্বনাম ছিল 'সংসর্গ', পরবর্তী সময়ে 'অসমতল' গল্পগ্রন্থে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'চোরাবালি'। নরেন্দ্রনাথের বহু গল্পেই প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় নারীর অসহায়তার দিকটি এবং তার কর্মজীবন ও অন্যান্য প্রবণতা কেমনভাবে পুরুষতান্ত্রিকতার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় তা পরিস্ফুট হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ 'অবতরণিকা' গল্পটির কথা উল্লেখ করা যায়, যেখানে কর্মজীবনে প্রবেশকারী গৃহবধূর গৃহের গন্ডি অতিক্রমের পারিবারিক, সামাজিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতার দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। আবার 'চোরাবালি' গল্পে দেখা যায় নারীর অসহায়তার চিত্র, যেখানে কখনও পিতার হাতে, আবার কখনও বা স্বামীর হাতে নারী ক্রীড়নকে পরিণত হচ্ছে, সামাজিক অবক্ষয়ের ধারায় পুরুষের স্বার্থরক্ষার যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত হচ্ছে, নিজের সম্ভ্রমকে রক্ষা করতে অসমর্থ হচ্ছে।

'চোরাবালি' গল্পের সূচনাতে দেখা যায় একই বাড়িতে ভাড়াটিয়া হিসেবে বসবাসকারী রাণুর প্রতি গৌরাঙ্গের অভব্যতার সীমা অতিক্রমকারী ব্যবহার ও দৃষ্টিভঙ্গীর বর্ণনা — "মাসখানেক যাবৎ গৌরাঙ্গ বড়ই বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে।" একই বাড়িতে ভাড়া থাকবার সুবাদে সুন্দরী রাণুর প্রতি মুখোমুখি

ঘরের ভাড়াটে গৌরাঙ্গ অত্যন্ত অন্যায়, অশালীন ও ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যবহার করে, যা দেখে রাণুর বাবা অনাদি ক্রোধান্ধ হয়ে বলে— "ওকে মেরে যদি হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো করে না দিই তো কায়েতের বাচ্চা নই আমি।" গৌরাঙ্গের ব্যবহারে রাণুর মা সর্বদা ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকেন, এমনকি গৌরাঙ্গের নিজের বিধবা মাও ছেলের ব্যবহারে অন্তরে লজ্জিত হন কিন্তু মুখে প্রকাশ করেন না। অপরদিকে যাকে লক্ষ করে গৌরাঙ্গের অশালীন ইঙ্গিত, চটুলগান ও অসভ্য দৃষ্টিপাত নিক্ষিপ্ত হয়, সেই রাণু গৌরাঙ্গের ব্যবহারে কখনও বা রাগান্বিত হয় কখনও বা কিছুটা কৌতুক উপভোগ করে, কিন্তু অনুরাগের ছিটেফোঁটাও তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়না গৌরাঙ্গের প্রতি। বরঞ্চ নিজের বংশ গৌরবের প্রতি সচেতন রাণু পীড়িত হয় গৌরাঙ্গের অসংস্কৃত ব্যবহারে। গৌরাঙ্গের আচরণ দেখে রাণুর মনের অবস্থা লেখক ব্যক্ত করেছেন এইভাবে — "গৌরাঙ্গের কাণ্ড দেখে তার কখনো বা হয় রাগ কখনো বা পায় হাসি। অনুরাগ মুহূর্তের জন্যেও আসেনা। আসবার কথাও নয়, কেবল রঙটাই যা গৌরাঙ্গের ফরসা, কিন্তু এই বয়সেই চোয়াল ভেঙেছে, চোখ দুটো কোটরগত, বিড়ি খেয়ে খেয়ে ঠোঁটের রঙ হয়েছে ঘন-কৃষ্ণ। দশ আনি ছ আনি চুলের ছাঁট, ঠোঁটের উপর গোফ রাখা সূক্ষ্ম রেখায়। এর পর একটা ছাই রঙের স্যুট পরে বেরোয় কাজে। যা চমৎকার দেখায় স্যুট পরলে ঐ চেহারায়। শুধু বাইরের নয়, লোকটির মনের চেহারাও যে অমনি তা তার হাব-ভাব আদব-কায়দায় রাণুর কাছে গোপন থাকে না। গৌরাঙ্গের প্রতিটি অঙ্গ-ভঙ্গি প্রতিটি পদক্ষেপ রাণুর দৃষ্টিকে পীড়া দেয়, রুচিকে ক্লিষ্ট করে তোলে। আজই না হয় অবস্থা এমন হয়েছে। কিন্তু কমলপুরের বনেদী চৌধুরী বংশের তো মেয়ে। এক ঘর জ্ঞাতি এখনো জমিদারি করছে গাঁয়ে।"

এ হেন গৌরাঙ্গের প্রতি সবার মানসিকতা সহসা পরিবর্তিত হয়ে গেছে, মিথ্যে বংশ গৌরবের গর্ব মুছে গেছে, আর এই অভাবিত অসম্ভব ঘটনা সম্ভব হয়েছে গৌরাঙ্গের চাকুরিতে পদোন্নতির ফলে। রাণুর বাবা অনাদি ও গৌরাঙ্গ একই ইনস্পেকশন ডিপোতে একই টুলস্ সেক্সনে কাজ করেন। সকলকে বাদ দিয়ে সাহেব গৌরাঙ্গের প্রতিই সন্তুষ্ট হয়ে তাকে অনাদিদের সেক্সনের হেড একজামিনারের পদাভিষিক্ত করেছেন। অনাদিকে এখন গৌরাঙ্গের অধীনেই কাজ করতে হবে, শুধু তাই নয় খুব শিগ্‌গিরি অনাদির সুপারিনটেনডেন্ট হবারও সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এখন গৌরাঙ্গ অনাদির সহকর্মী মাত্র নয় বরং অনাদির উপরওয়ালা; অনাদির পদোন্নতি, বেতনবৃদ্ধি প্রভৃতি সব কিছুই এখন গৌরাঙ্গের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। গৌরাঙ্গকে খুশি করতে পারলেই অনাদির বেতনবৃদ্ধি হতে পারে, সম্ভব হতে পারে রাণুর ভাই প্রমথকে কাজে ঢুকিয়ে দেওয়া। এই প্রয়োজনের তাগিদে সহসা গৌরাঙ্গের প্রতি অনাদি সহ রাণুর পরিবারের সকলেরই দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে। যে গৌরাঙ্গের হাড় গুঁড়ো করে দেবার ইচ্ছা পোষণ করতো অনাদি, যে গৌরাঙ্গের সামনে বের হওয়া নিষেধ ছিল রাণুর সেই গৌরাঙ্গের সঙ্গেই রাণুর বিয়ে দেবার ইচ্ছা পোষণ করেছে অনাদি। গৌরাঙ্গের স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে রাণুর মা মৃদু আপত্তি করলে আশ্চর্যজনক ভাবে অনাদি

বলেছে— "পুরুষের আবার স্বভাব-চরিত্র। বিয়ে করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে দেখে নিয়ো। তা ছাড়া ওই রকমই চাই আজকাল,বুঝলে? ফাজিল-ফক্কর না হতে পারলে এই যুগে ভাত নেই"। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নিজের মেয়েকে বলি প্রদত্ত করতে বিন্দুমাত্র বিবেকের দংশন অনুভব করেনি অনাদি বরং নিজের সিদ্ধান্তকে যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করবার প্রচেষ্টা করেছে সে, তাই স্ত্রীকে বলেছে — "আর ভাব-সাব দেখে বুঝতে পারো না, দুজনের মধ্যে বেশ একটা ভালোবাসাও হয়েছে। আজকালকার এই তো নিয়ম, ভালোবাসার পর হয় বিয়ে"। কেবলমাত্র নিজের চাকুরিগত সুরক্ষাই নয় গৌরাঙ্গের সঙ্গে রাণুর বিয়ে দিলে অনাদির আর একটি লাভের দিকও আছে, কোনো দাবী দাওয়া, খরচপত্র ছাড়াই রাণুকে পাত্রস্থ করা যাবে, তাই এমন লোভনীয় সুযোগ হাতছাড়া করতে চায়নি অনাদি। পিতার এই ঘৃণ্য আচরণে ও নীচ মানসিকতার পরিচয় পেয়ে হতবাক হয়ে গেছে রাণু, বিহ্বল রাণু প্রতিবাদ নিস্ফল জেনে পিতার ইচ্ছার কাছে বলিপ্রদত্ত হয়েছে। এখানেই গল্পটি সমাপ্ত হতে পারতো কিন্তু লেখক মানুষের অধঃপতনের শেষ সীমাও যেন দেখাতে চান, মানুষের দ্বারা মানুষকে পণ্যে পরিবর্তিত করার চূড়ান্ত নির্মমতার দিকটি তিনি উদ্‌ঘাটন করতে ইচ্ছুক। তাই দেখা যায় গৌরাঙ্গের সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেছে রাণুর। অনাদি রাণুকে ব্যবহার করে নিজের কর্মজীবনকে সুরক্ষিত করেছে আর এই ভাবে রাণু প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে তার পিতার স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে।

বিবাহের পর ধীরে ধীরে রাণু গৌরাঙ্গের প্রতি স্বাভাবিক আচরণ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। পিতার আচরণের প্রতিশোধ নেবার জন্য সে পিতামাতার সামনেই গৌরাঙ্গকে বেশি বেশি ভালোবাসার চেষ্টা করল। এই মানসিকতা দ্বারা পরিচালিত হয়েই সে পুরোনো বাড়ি ছেড়ে গৌরাঙ্গকে নতুন বাড়ি ভাড়া নিতে বাধ্য করলো। অপরদিকে গৌরাঙ্গও পরিবর্তিত হয়েছে, নিজের উদ্দাম লোলুপতাকে পরিত্যাগ করে রাণুকে নিয়ে সে সুখের সমুদ্রে ভাসতে চেয়েছে। এই কারণে যুদ্ধের বাজারে গৌরাঙ্গ ন্যায়- অন্যায় সকল পথেই অর্থ উপার্জন করতে মনোনিবেশ করেছে, আর তার এই কাজে সহায়তা করেছে তারই উর্ধ্বতন কর্তা মিঃ গোয়েন।

গৌরাঙ্গের সুপারিনটেনডেন্ট্ গোয়েনকে রাণু একদিন দেখেছে সিনেমা হলে। উল্টোদিকে গোয়েনও দেখেছে রাণুকে। তার দৃষ্টিকে রাণুর মনে হয়েছে — "ঠিক আগেকার গৌরাঙ্গের মত"। গোয়েনের লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে রাণুর প্রতি, কিন্তু গৌরাঙ্গ গোয়েনের চরিত্র সম্পর্কে সচেতন, তাই সে রাণুকে সাবধান ও সতর্ক করে দিয়েছে গোয়েন সম্পর্কে। গোয়েনকে সে উল্লেখ করেছে সাক্ষাৎ শয়তান হিসেবে।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গৌরাঙ্গ সেই শয়তান গোয়েনেরই সহকর্মী হিসেবে একত্রে অবৈধ পথে অন্যায় অর্থ উপার্জনের দিকে পা বাড়িয়েছে। নরেন্দ্রনাথ গৌরাঙ্গের মানসিকতাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, গৌরাঙ্গ জানে গোয়েন শয়তান কিন্তু — "জানলেই কি আর সব সময় মানতে পারা যায়, না

মানবার কথা মনে থাকে? তাছাড়া মানেও কি আর কথার বদলায় না যখন শয়তান আধা-আধি বখরা দিতে চায় ভালো মানুষকে?" অতএব দেখা যায় নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য অন্যায়ের সঙ্গে আপস আর আপসের পক্ষে যুক্তি সজ্জার সুবিধাবাদী মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে গৌরাঙ্গের মধ্যে।

অন্যায় ও অবৈধ কাজকর্মের ফলভোগ একদিন করতে হয়েছে গৌরাঙ্গকে। জেলে যাবার উপক্রম হয়েছে তার, আর এই বিপদের দিনে তার উদ্ধারকর্তা হিসেবে উপস্থিত হয়েছে মিঃ গোয়েন। কিন্তু বিপদোদ্ধারের এই প্রয়াস শর্তসাপেক্ষ। রাণুকে একদিনের জন্য ভোগ করতে চায় গোয়েন। রাণুকে গোয়েনের সঙ্গে একদিন আধাআধি ভাগ করে নিলেই গৌরাঙ্গ রক্ষা পাবে জেলের ঘানি ঘোরানো থেকে। গোয়েনের এই প্রস্তাবে রাজি হওয়া নিয়ে গৌরাঙ্গ দ্বিধাগ্রস্ত কিন্তু সেই দ্বিধা খুব স্বল্প সময়ের জন্য স্থায়ী হয় তার মনে, সে মুহূর্তেই মনস্থির করে ফেলে। গোয়েনের প্রস্তাবে সে রাজি, কারণ — "সত্যি ঘানি তাকে কেন ঘুরাতে হবে? কি এসে যাবে? কেই বা জানবে?" গৌরাঙ্গের কাছে আশু বিপদ থেকে রক্ষাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়েছে আর সেই জন্য নিজের স্ত্রীকে অন্যের ভোগের সামগ্রী করে তুলতেও সে কোনো মানসিক বাধা অনুভব করেনি। এইভাবে দেখা যায়, একদিন রাণু পিতার স্বার্থসিদ্ধির জন্য ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল, লোলুপ গৌরাঙ্গের হাতে তাকে তুলে দিয়ে তার পিতা নিজের জীবনকে সুরক্ষিত করার প্রয়াস করেছে আর বিয়ের পর রাণু স্বামীর স্বার্থরক্ষায় স্বামীর উপরওয়ালার ভোগের সামগ্রী হতে চলেছে। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কন্যা রাণুর জন্য পিতা অনাদির ভাবনার সঙ্গে স্ত্রী রাণুর জন্য স্বামী গৌরাঙ্গের ভাবনার স্তর এক হয়ে গেছে। উভয়ক্ষেত্রেই অসহায় ক্রীড়নক হয়েছে রাণু।

রাণুর কাছে গৌরাঙ্গ গোয়েনের আগমনবার্তা দিলে রাণু অবাক হয়ে বলেছে, গোয়েন যে সাক্ষাৎ শয়তান, সে কেন আসবে, তখন গৌরাঙ্গ ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছে — "ঠাট্টা করেছিলাম। আসলে আমার খুব বন্ধুলোক, আসবে চা টা খাবে, একটু গল্পগুজব করবে, চলে যাবে। চমৎকার আলাপী, দারুণ ফুর্তিবাজ। দোষের মধ্য একটু ফাজিল। কিন্তু অমন ফাজিল ফক্কর না হতে পারলে আজকালকার দিনে চলে না,বুঝলে।" এই ভাবে গৌরাঙ্গের মুখের ভাষা আর অনাদির মুখের ভাষা এক হয়ে গেছে। যাকে মেরে হাঁড় গুড়ো করে দিতে ইচ্ছে হতো একদিন অনাদি তার হাতেই নিজের কন্যাকে তুলে দিয়েছিল এবং নিজের কৃতকর্মের জন্য যুক্তি সাজিয়েছিল। অপরপক্ষে যে ছিল সাক্ষাৎ শয়তান তারই ভোগের সামগ্রী হতে গৌরাঙ্গ নিজের স্ত্রীকে প্রেরিত করেছে এবং তারও যুক্তির অভাব হয়নি। উভয়ের যুক্তিই একই পথে গেছে, তাই রাণুর মনে হয়েছে অনাদির কণ্ঠই শুধু গৌরাঙ্গের সঙ্গে এক হয়ে যায়নি, গৌরাঙ্গের মুখের আদলও অনাদির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। এইভাবে 'চোরাবালি' গল্পে দেখা যায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে একজন নারী কেমনভাবে পুরুষের হাতে ব্যবহৃত হয়, সেই পুরুষ কখনও হয় তার পিতা কখনও বা স্বামী।

নরেন্দ্রনাথ 'ধ্বনি' পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন — "সমাজে শঠতা আছে, ক্রূরতা আছে,

তা আমি জানি। হিংসা বিদ্বেষেরও অভাব নেই। কিন্তু সমাজ জীবনের এই অন্ধকার দিকের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় কম।... শান্ত মধুর ভাবই আমার রচনায় বেশি।... জীবনের পঙ্কিল অথবা ক্লেদাক্ত দিকে আমার নিজস্ব বাস্তব অভিজ্ঞতা তেমন কিছু নেই। আমার মেজাজ রোমান্টিক সৌন্দর্যপ্রিয়। তাই মহত্ত্বই আমায় আকর্ষণ করে বেশি।"[২০] নরেন্দ্রনাথের এই নিজস্ব স্বীকারোক্তি ছাড়াও তাঁর রচনা পাঠ করলেই তাঁর চরিত্রের এই বিশেষ প্রবণতার দিকটি আমাদের সামনে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। মহত্ত্বের প্রতি তাঁর আকর্ষণের কারণে তিনি যখন মানুষের পাপ ও পদস্খলনের চিত্র অঙ্কন করেন তখন সেই বর্ণনায় নির্মম হলেও স্খলিত ব্যক্তির প্রতি সহমর্মিতা তাঁর থাকে, তাঁর অঙ্কিত চরিত্রের পদস্খলনের জন্য বেদনাহত হন তিনি নিজেই। এই কারণে অনেকক্ষেত্রেই আমরা দেখি তাঁর অঙ্কিত চরিত্রেরা স্খলিত হবার শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েও ঘুরে দাঁড়ায়, চরিত্র হননের প্রান্তদেশে দাঁড়িয়ে চরিত্র মাহাত্ম্য প্রকাশ করে। এমনই এক উত্তরণের গল্প 'রসাভাস'।

'রসাভাস' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৫২ বঙ্গাব্দের নববর্ষ সংখ্যা 'বসুমতী'তে। গল্পটির প্রথমে নাম ছিল 'বিষক্ষয়', 'অসমতল' গল্পগ্রন্থে লেখক এর নাম পরিবর্তন করে রাখেন 'রসাভাস'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর উপর কন্ট্রোল ব্যবস্থা আরোপিত হয়েছিল, এই সময় গ্রাম গ্রামান্তর থেকে মহিলারা লুকিয়ে চাল নিয়ে তা বিক্রি করত কলকাতার গৃহস্থ বাড়িতে। এই অবৈধ 'ব্লাক মার্কেটিং' কে প্রতিরোধ করবার জন্য ছিল সরকারী গোয়েন্দারা। আইনের এই রক্ষকেরা অনেকক্ষেত্রেই ভক্ষকের ভূমিকা পালন করত। অবৈধ চালের আদান প্রদানকে বন্ধ করবার পরিবর্তে অনেকক্ষেত্রেই এই চাল পাচারকারী মহিলাদের কাছ থেকে অবৈধ উপায়ে অর্থ আদায় করাই ছিল তাদের কাজ, অনেক সময় এই মহিলাদের সম্ভ্রমও ছিল তাদের উৎকোচের অংশ। সমাজের সর্ব অংশে সংক্রমিত এমন দুর্নীতির চিত্র লেখক 'রসাভাস' গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন।

গ্রামের বধূ পদ্মমণি আকালের সময় স্বামী, শাশুড়ী আর ছেলের হাত ধরে শহরে আসে। শহর সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, ভীতু পদ্মমণির বুক কাঁপত শহরের নাম শুনেই। শহরে গাড়ি ঘোড়া থেকে ভীতি ছিল তার, পথচারী মানুষের দৃষ্টি তাকে শঙ্কিত করত, লজ্জিত আর অস্বস্তিতে ভরিয়ে দিত। কারও দিকে দৃষ্টি রেখে সে ভিক্ষে চাইতে পারত না। স্বামী, শাশুড়ি ও ছেলেকে আকালের শিকার হতে দেখে, পেটের জ্বালায় ধীরে ধীরে তার লজ্জা ভেঙেছে, ভয় ভেঙেছে, শুধু তাই নয়, নারীর শুচিতা সতীত্বকেও আর সে মহার্ঘ্য বলে মনে করতে পারেনি। মান-সম্মান, লজ্জা- শরম সম্পর্কেও পুরাতন ধ্যান ধারনা সে ধরে রাখতে পারেনি। পদ্মমণির এই রূপান্তরকে লেখক ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে — "তারপর পদ্মমণির আরও নানা রকমের ভয় ভাঙল, লজ্জা ভাঙল, ভাবল এ মুখ দেখাবে কি করে। শেষ পর্যন্ত দেখল কিছুতেই কিছু হয় না, সব সয়ে যায়। কে কাকে মুখ তুলে খোঁটা দিতে আসবে। প্রত্যেকের মুখেই তো কালি। সবাই

জানে সবারই হাঁড়ির খবর।"

রূপান্তরিত পদ্মমণি জীবন জীবিকার জন্য শহরে গিয়ে গোপনে চাল বিক্রি করবার পথ বেছে নিয়েছে। কুমুদিনীকে তার পাড়াতুতো বউদি শিখিয়ে দিয়েছে এই ব্যবসার ফন্দি ফিকির। খুব শিগগিরি সে এই ব্যবসায় পরিপক্বতা লাভ করেছে, মানুষকে চিন্‌তে শিখেছে, ভয়কে চেপে রেখে কাজ হাসিল করার কৌশল করায়ত্ত করেছে। পুলিশের গোয়েন্দাদেরও সে আর ভয় পায় না, সে জানে সিকি আধুলিটা ফেলে দিলেই তাদের কাছ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়, গৃহস্থেরা ভয় দেখালেও সেই ভীতি প্রদর্শনের অন্তঃসার শূন্যতাও সে উপলব্ধি করতে পারে।

এমন করেই চলছিল পদ্মমণির দিন, একদিন বোনঝি সোহাগীকে তার স্বামী রেখে গেল পদ্মমণির কাছে আর সোহাগী একদিন বায়না ধরেছে শহর দেখবার। তাই পদ্মমণি একদিন চালের সঙ্গে সঙ্গে সোহাগীকেও নিয়ে এসেছে শহরে আর গোয়েন্দা মুকুন্দ শিয়ালদহ স্টেশন থেকেই অনুসরণ করেছে তাদের। 'ব্লাক মার্কেটিং'-কে বন্ধ করা বা অবৈধ চাল ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণই তার উদ্দেশ্য নয়। পদ্মমণির সঙ্গী সোহাগীই তার আকর্ষণের কেন্দ্র। লেখক মুকুন্দের বাসনাকে ব্যক্ত করেছেন এই ভাবে — "পাঁচ ছয় জন আধবয়সী নিম্নশ্রেণীর মেয়েমানুষ আর তাদের সঙ্গে সতের আঠার বছরের ওই মেয়েটি। ওর গায়ের রং সঙ্গিনীদের মত কালো হলেও চোখ নাক এত টানাটানা আর মুখের ডৌলটি এমন সুশ্রী যে, মুকুন্দের মনে হলে বহুকাল সে এমন সুন্দরী মেয়ে দেখেনি। ভাবলে অবাক হতে হয় যে, এই নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এমন একটি সুশ্রী মেয়ে কোত্থেকে এসে জুটল।"

সোহাগীর প্রতি আকর্ষিত হয়ে মুকুন্দ তাই সিকি আধুলির বিনিময়ে পদ্মমণিদের নিষ্কৃতি দেয়নি বরং সারা শহরময় অনুসরণ করে বেড়িয়েছে। যখন পদ্মমণি ভেবেছে যে সে পিছু ছাড়াতে পেরেছে গোয়েন্দাটির ঠিক তখনই পদ্মমণির এক পুরানো খদ্দেরের ফার্নিচারের দোকানের সামনে মুকুন্দ তাদের ধরে ফেলেছে। দোকানের মালিক হেরম্ববাবু নিজেকে ও পদ্মমণিদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছে। চা, পান ও সিগারেট খাইয়ে মুকুন্দকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছে সে, কিন্তু মুকুন্দের লোলুপ দৃষ্টি তখন সোহাগীর দিকে। পদ্মমণির লুকিয়ে রাখা চাল সে বের করেছে, কঠোর কর্তব্যের দোহাই দিয়ে পদ্মমণিকে ধমক দিয়েছে কিন্তু চোখ রেখেছে সোহাগীর দিকে। লেখক লেখেন — "মুকুন্দ অপাঙ্গে একবার সোহাগীর দিকে তাকাল। আর একবার আলমারীর গ্লাসে প্রতিফলিত তার প্রতিবিম্বের দিকে। সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে ফোঁটা, দুই ঠোঁট পানের রসে লাল টুক টুক করছে। কি চমৎকার ওর মুখের ডৌলটি, মুকুন্দ যেন পলক ফেলতে ভুলে গেল।" এরপর মুকুন্দ পদ্মমণির কাছ থেকে চাল উদ্ধার করেছে, হেরম্ববাবুর কাছ থেকে সিগারেটের প্যাকেট ও পাঁচ টাকা উৎকোচ গ্রহণ করেছে কিন্তু পদ্মমণি ও সোহাগীকে ছেড়ে দেয়নি বরং থানায় জবানবন্দী দেবার জন্য তাদের নিয়ে চলেছে থানার দিকে। পদ্মমণি কিছু জরিমানা নিয়ে তাদের

ছেড়ে দেবার কাতর অনুনয় করলেও মুকুন্দ তাদের রেহাই দেয়নি বরং অন্ধকারে কিছুক্ষণ এগলি ওগলি ঘুরে, পদ্মমণিকে চলে যেতে বলেছে কিন্তু সোহাগীকে থানায় জবানবন্দী দেবার অজুহাতে রেখে দিতে চেয়েছে। চতুরা ও বহু অভিজ্ঞা পদ্মমণি মুহূর্তে মুকুন্দের অভিলাষ বুঝতে পেরেছে, তাই সোহাগীকে ছেড়ে সে চলে যেতে উদ্যত হয়েছে। অসহায় অনভিজ্ঞা সোহাগীর আর্ত অনুনয় শুনে সে বরং নির্লজ্জের মত বলেছে — "আঃ অমন করে চেঁচাচ্ছিস কেন ছুঁড়ী। তোকে কি যমের মুখে ফেলে যাচ্ছি না কি, ভয় কি, থানা পুলিশ তো আর কিছু হচ্ছে না। এ তো ভালই।" থানা পুলিশ অপেক্ষা সোহাগীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে মুক্তি লাভ পদ্মমণির কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হয়েছে। ক্ষুদ্রতা, নীচতা, হীনতা ও নৈতিক অধঃপতনের চূড়ান্ত পরিচয় দিয়ে এরপর পদ্মমণি আরও বলেছে — "কোন লজ্জা করবেন না বাবু। মেয়ে কি ওতে মরবে না পচে যাবে? চোখের ওপর কত দেখলুম। কেবল একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবেন"। অর্থাৎ নারীদেহের শুচিতা, পবিত্রতা প্রভৃতি পদ্মমণির কাছে অর্থহীন, তা তার কাছে আদর্শবাদীর ফাঁপা ফানুস মাত্র। মুকুন্দ একজন নারীমাংস লোলুপ, স্খলিত গোত্র মানুষ, তাকেও স্তম্ভিত ক'রে পদ্মমণি এবার তার কাছে দাবী করেছে 'দস্তুরী'। সোহাগীর আপন মাসি ও একমাত্র গার্জিয়ান হিসেবে সোহাগীকে ভোগ করবার 'দস্তুরী' দাবী করেছে সে। পদ্মমণির নির্লজ্জ ব্যবহার ও নীতিহীন নীচতায় হতবাক হয়ে গেছে মুকুন্দের মতো মানুষ, সে বিশ্বাস করতে পারেনি যে সত্যিই পদ্মমণি সোহাগীর নিজের মাসি। মাসি হয়ে নিজের বোনঝিকে এক লোলুপ পুরুষের হাতে তুলে দেবার সানন্দ উৎসাহ ও সহায়তা করার পিছনে যে ঘৃণ্য মন ও মানসিকতা লুকিয়ে আছে, তার স্বরূপ উপলব্ধি করে মুকুন্দ সহসা সম্বিত ফিরে পেয়েছে। নিজের পাপ ও দুর্বলতার বোধটি যেন তার মধ্যে সহসা সঞ্চারিত হয়ে তাকে আঘাত করেছে। মুকুন্দের লাম্পট্য— ইন্দ্রিয়পরায়ণতা পদ্মমণির ততোধিক কলুষতা ও অর্থলালসার বিকৃত রূপের কাছে পরাস্ত হয়েছে, দুঃসহ ঘৃণায় মুকুন্দ উৎকোচ রূপে গৃহীত পাঁচ টাকার নোটটি ছুড়ে ফেলে দিয়ে কশাহতের মতো পালিয়ে এলেছে কলুষতা থেকে। ভয়াবহ ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়েও মানুষের কল্যাণবোধ ও বিবেক যে নিঃশেষ হয়ে যায়না সেই দিকটিই লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন 'রসাভাস' গল্পে। আপাত বীভৎসতার আড়ালে মানুষের কল্যাণবোধের জাগরণে গল্পটি রসোত্তীর্ণ।

নরেন্দ্রনাথের বহু গল্পেই নারীরা সংসারের চার দেয়ালের মধ্যে বেড়িয়ে এসে বৃহত্তর জগতে বা কর্মজগতে পা রেখেছে। সংসারের প্রয়োজনে বা আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নের জন্য মেয়েদের এই স্বাধীন কর্মপ্রয়াস সেই সময়ে অনেক পরিবারে সমস্যা বা পারিবারিক অশান্তির কারণ হয়ে দাড়িয়েছিল। বর্তমান কালে যে জিনিসটি খুবই স্বাভাবিক ও বহুল প্রচলিত, স্বাধীনোত্তর কালে সেই জিনিসটিই যথেষ্ট পরিমাণে কন্টকাকীর্ণ ছিল মেয়েদের পক্ষে। বাড়ির মেয়ে বা বউরা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছে, এতদিনকার সংস্কার ও রক্ষণশীলতার পাথরপ্রতিম প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছে, বাইরের জগতের সঙ্গে

তাদের সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে, কিন্তু বহুদিন ধরে প্রচলিত পারিবারিক সম্পর্ক ও ছকটি যেন ভেঙে গেছে, রক্ষণশীল মানুষেরা যেন মেয়েদের এই বহির্মুখীনতাকে ঠিক যথার্থ মর্যাদা দিতে পারছে না – – এমন একটি পরিস্থিতি সেই সময় তৈরি হয়েছিল। বাড়ির মেয়ে বা বউদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশকে কেন্দ্র করে পুরুষতান্ত্রিক এই সমাজে যে তরঙ্গ জেগেছিল তাকে নরেন্দ্রনাথ অনেক গল্পেই রূপদান করেছেন। এমনই এক পারিবারিক তথা সামাজিক পালা বদল ও তাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিত্বের ও মানসিকতার সংঘাত লক্ষ করা যায় 'অবতরণিকা' গল্পে। ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে পূজা সংখ্যা 'আনন্দবাজার পত্রিকা' তে প্রকাশিত এই গল্পটি বিভিন্ন দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এই গল্পটিকে নরেন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে 'মহানগর' নাম দিয়ে উপন্যাসে বর্ধিত করেছেন এবং চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় গল্পটি নিয়ে 'মহানগর' নামক চলচ্চিত্রও তৈরি করেছেন। 'অবতরণিকা' গল্পের মূল বিষয় সুব্রতর স্ত্রী আরতির চাকরি গ্রহণ ও সেই বিষয় নিয়ে পারিবারিক শান্তির বিঘ্ন ঘটা। কিন্তু গল্পের মূল বিষয় এইটি হলেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর স্থান, রক্ষণশীল মানুষের প্রবল স্বার্থপরতা, পূর্ববঙ্গের মানুষের প্রতি পূর্ববঙ্গের মানুষের অন্তরের যোগাযোগ, উদ্বাস্তু মানুষের জীবনযাত্রার কঠোরতা, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েদের প্রতি সাধারণ মানুষের বিরূপতা প্রভৃতি জিনিসও গল্পে ছায়া ফেলেছে এবং গল্পকে গড়ে তুলেছে।

সুব্রত ও তার স্ত্রী আরতি পূর্বপাকিস্তানের থেকে কলকাতায় আগত উদ্বাস্তু পরিবার। সুব্রতর বাবা প্রিয়গোপাল, স্ত্রী ও নাবালক তিনটি ছেলে মেয়ে নিয়ে বড় ছেলের কাছে চলে এসেছেন পূর্ববঙ্গ ছেড়ে, কারণ পূর্ববঙ্গে জমিদারী সেরেস্তার চাকরি চলে গেছে তার, পাকিস্তানের হাঙ্গামা তার পূর্ববঙ্গ ছেড়ে কলকাতায় চলে আসাকে ত্বরান্বিত করেছে। প্রথমে প্রিয়গোপালের ইচ্ছে ছিল মাসদুয়েক থেকেই স্বস্থানে ফিরে যাবেন কিন্তু অর্থাভাব ও আলস্যবশত আর ফিরে যাওয়া হয়নি বরং বড় শহরে থাকবার স্বাদ পেয়ে সুব্রতর সংসারেই থেকে গেছেন। ফলস্বরূপ সুব্রতর একার আয়ের উপর সাত আট জন পোষ্যর ভার পড়েছে আর যে ভার একক ভাবে বহন করতে সুব্রত গলদঘর্ম হয়ে পড়েছে। সংসারে অভাব অনটন বৃদ্ধি পেয়েছে, বহু দিকে ব্যয় সংকুলান করেও সংসার চালানো দায় হয়ে পড়েছে সুব্রতর পক্ষে। সুব্রত ও আরতির সংসারের বর্ণনায় লেখক তৎকালীন নিম্নবিত্ত উদ্বাস্তু মানুষের অর্থনৈতিক অসহায়তার চিত্রটি পরিস্ফুট করেছেন — "অফিস থেকে যা মাইনে পায়, তা মাসের পনের দিন যেতে না যেতেই নিঃশেষ হবার উপক্রম হয়। টিউশনির টাকাটা নিয়মিত আদায় হয় না। ফলে পরের দুই সপ্তাহের রেশন আর বাজারের টাকাটা সংগ্রহ করতে প্রতিমাসে প্রাণান্ত হয় সুব্রতর। সংসারে রোজগেরে সে একা হলেও পোষ্য অনেক। নিজেরা স্বামী-স্ত্রী, আর দুটি ছেলে-মেয়ে। তা ছাড়া আছেন বুড়ো বাপ, মা আর ছোট ছোট তিনটি ভাইবোন। ভাই দুটিকে স্কুলে দিতে হয়েছে। উল্টোডাঙ্গার সরু গলির মধ্যে একতলায় ছোট ছোট দু'খানা ঘর। তারই ভাড়া গুনতে হয় মাসে মাসে পঁয়তাল্লিশ টাকা। সংসারিক খরচ ছাড়াও অসুখ-বিসুখের খরচ

আছে। লোক-লৌকিকতাও কিছু না দেখলে চলে না। ফলে প্রতি মাসে জমার চেয়ে খরচের অঙ্ক ভারী হয়ে ওঠে।"

সাংসারিক কারণেই সুব্রত প্রথমে আরতিকে কোনো চাকরি জোটানোর জন্য উৎসাহ জুগিয়েছে। নিজের বন্ধুর স্ত্রীদের চাকরির খবর শুনিয়েছে আরতিকে। কখনো পরোক্ষে কখনো বা স্পষ্ট করেই প্রকাশ করেছে সে নিজের মনের কথা। নিজের দুরবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সুব্রত ব্যাখ্যা করেছে বর্তমান পরিস্থিতিকে — "পুরুষ হোক, মেয়ে হোক, আজকাল বসে খাওয়ার কি জো আছে কারো ? চেষ্টা চরিত্র করে তুমিও যদি একটা জোটাতে পারতে মন্দ হোত না। বিশ হোক, পঁচিশ হোক, যা আনতে, তাতেই সাহায্য হোত আমার।"

সুব্রতকে সাহায্য করবার জন্যই আরতি প্রাথমিক দ্বিধা ত্যাগ করে চাকরির সন্ধান করেছে। এতদিন সে সংসারের ব্যয় সংকোচ করবার চেষ্টা করেছে, নতুন মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এবার সে চেষ্টা করেছে ব্যয় কমানোর পরিবর্তে আয় বাড়ানোর। দৈনিক কাগজে কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে আবেদন পাঠানো শুরু করে আরতি আর তার এই কাজে সহায়ক হয় সুব্রত। চাকরির জন্য চেষ্টা চরিত্র করতে থাকলেও মানসিক দ্বিধার কারণে এ প্রচেষ্টা চলে আরতির শ্বশুর শাশুড়ীকে গোপন করেই। একের পর এক দরখাস্ত করতে থাকে আরতি কিন্তু ইপ্সিত ফললাভ হয় না। হঠাৎ একদিন মুখার্জী এন্ড মুখার্জী কোম্পানি থেকে নিয়োগপত্র আসে আরতির নামে, শিক্ষায়িত্রী বা কেরাণীর চাকরি নয়, সেলাই মেশিনের বিক্রয় ও ডেমনেস্ট্রেসনের কাজ। কাজটি আরতির কাছে যথেষ্ট সম্মানজনক মনে হয়নি কিন্তু মাইনের পরিমাণটি সেই দ্বিধা ঝেড়ে ফেলতে সাহায্য করেছে। চাকরির নিয়োগপত্র পাবার পর আরতির প্রথম সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে শ্বশুর-শাশুড়ীকে খবরটি জানানোকে কেন্দ্র করে। সে নিজের মুখে খবরটি জানাতে পারেনি তাই সুব্রত সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। প্রিয়গোপাল ও সরোজিনী কেউই সংবাদটি ভালো মনে গ্রহণ করতে পারেনি। বাড়ির বউ-এর চাকরি করাকে বাবা-মা সহজে মেনে নেবে না একথা সুব্রত ও আরতি উভয়েরই অজানা ছিল না তাই এতদিনের চাকরির দরখাস্ত প্রেরণ ও ইন্টারভিউ দেওয়া সবই চলেছিল গোপনে, কিন্তু প্রিয়গোপাল ও সরোজিনী আরতির চাকরি লাভের ঘটনায় মাত্রাতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন এবং সে সময়ের প্রেক্ষিতে বিষয়টি অস্বাভাবিকও নয়। চাকরির খবর পেয়ে প্রিয়গোপালের সুপ্ত বংশমর্যাদা বোধ জাগ্রত হয়েছে। অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে সুব্রতকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন— "একথা তুমি উচ্চারণ করলে কি ক'রে ভোম্বল। আমি বেঁচে থাকতে মজুমদার বাড়ির বউ চাকরি করবে, আর আমি তা চোখ মেলে দেখব ?" অতএব দেখা যাচ্ছে, অর্থনৈতিক কারণে প্রিয়গোপাল দেশে ফিরে যেতে পারছেন না, নিজের নাবালক তিনটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে বড় ছেলের আশ্রয়ে বাস করছেন, তথাপি বাড়ির বউ-এর চাকরি করা তার কাছে অপমানকর বলে বোধ হয়েছে। শাশুড়ী সরোজিনীও আরতির চাকরি

গ্রহণকে প্রসন্ন মনে মেনে নিতে পারেননি তাই তিনি সুব্রতর আশ্রয় ছেড়ে পটলডাঙ্গায় তার বড় ভাইয়ের বাসায় চলে যাবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। সুব্রত প্রথমে বাবা মাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছে, নিজের বন্ধু বান্ধবদের চাকরিরতা স্ত্রীর উদাহরণ দিয়েছে কিন্তু প্রিয়গোপাল নিজের পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করেননি বরং দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন — "যারা করে, তারা করুক। আমাদের বংশে ওসব কোনদিন হয়নি, হবেও না।" সুব্রতও নিজের জেদ বজায় রেখেছে, বাবার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করেছে এবং শেষ পর্যন্ত একার পক্ষে তার এত বড় সংসার চালানোর অপারগতার কথা ঘোষণা করেছে। উত্তরে প্রিয়গোপাল নিজের উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে তিনি নিজে স্ত্রীকে চাকরি করতে না পাঠিয়েও অত্যন্ত কম বয়সে এক সুবৃহৎ সংসারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। যাইহোক শেষ পর্যন্ত সুব্রতর জেদ বজায় থেকেছে, আরতি চাকরিতে যোগদান করেছে কিন্তু প্রিয়গোপাল আরতির কাজে যাবার আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে নীরব প্রতিবাদ করেছেন, দুঃখ ও অভিমানে সরোজিনীর চোখ অশ্রু-সজল হয়ে উঠেছে। আরতির নিজের কাছেও কাজে যোগদানের দিনটি সংকোচে পরিপূর্ণ। শ্বশুর-শাশুড়ীর খাবার পূর্বেই স্বামীর পাতে খেয়ে নিতে আরতি অস্বস্তি বোধ করেছে, ছোট ছেলে আর মেয়ের ক্রন্দনধ্বনি সমস্ত দিন তার কানে বেজেছে।

ধীরে ধীরে সমস্তটাই স্বাভাবিক হয়ে গেছে, আরতির অস্বস্তিবোধ কেটে গেছে, সরোজিনীও হেঁসেল সামলানোর দায়িত্বকে ভবিতব্য বলেই যেন মেনে নিয়েছেন। পরিবর্তন আরো হয়েছে, ঘরের বাইরে আরতির আর একটা জগৎ হয়েছে, যেখানটা পূর্ণ হয়ে আছে অফিসের কর্মচারী, বস, সহকর্মী ও কাস্টমারদের দিয়ে।

প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে আরতি পরিবারের সকলের জন্যই কিছু না কিছু নিয়ে আসার চেষ্টা করেছে, বাচ্চাদের জন্য লজেনস্ আর লেবু, শাশুড়ীর জন্য জরদা, অসুস্থ শ্বশুরের জন্য আঙুর, স্বামীর জন্য সিগারেট, নিজের জন্য ব্লাউজের কাপড় ইত্যাদি। কিন্তু এসব আনার জন্য সে মাইনের টাকা খরচ করেনি বরং মাইনের উপর সেলাই মেশিন বিক্রির কমিশন আরতি ও তার সহকর্মীরা আদায় করেছে এবং সেই টাকাই ব্যয় হয়েছে বাজার করার কাজে। অদ্ভুত মানুষের মন তাই সুব্রত বহুদিন পর ভালো সিগারেট খেতে পেলেও তার মন তিক্ত হয়ে গিয়েছে। সে নিজে অফিসের পুরো মাইনে বাড়ি আনতে পারে না, কিন্তু তার স্ত্রী আরতি তা পেরেছে বরং মাইনের উপর অতিরিক্ত কমিশন লাভ করেছে — এব্যাপারটিতে সুব্রত যেন কিছুটা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছে, যদিও তার মনে হয়েছে আরতির একটু 'কর্মাশিয়াল গন্ধ' মাখানো কথাবার্তা তার বিরূপতার কারণ। অপরদিকে আরতি যখন শ্বশুড় প্রিয়গোপালকে মাইনের টাকা দিতে গেছে তখন তিনি মুহূর্তকাল জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে অশ্রুসজল চোখে বলেছেন এ তার অপমান। নিজের জন্মদিনের দিন তিনি পুত্রবধুর নিকট থেকে প্রণামীস্বরূপ কিছু নিতে অস্বীকার করে বলেছেন — "...আজ

আমার মৃত্যুদিন। যত মধুর ক'রেই বল না মা, ওটা প্রণামী না, ঘুষ।"

পুত্রবধূ আরতির চাকরির প্রতি প্রিয়গোপালের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মিথ্যে অহং ও ফাঁকা বংশমর্যাদার প্রতি গৌরববোধ যেমন প্রকাশিত হয়েছে তেমনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের আত্মম্ভরিতা ও স্বার্থপরতার দিকটিও প্রকাশিত হয়েছে। জমিদারী সেরেস্তার কাজে প্রিয়গোপাল প্রজাদের কাছ থেকে, তাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে সিকিটা আধুলিটা ঘুষ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, প্রচলিত দস্তুর অনুসারে নিজের ন্যায্য পাওনা বলেই গ্রহণ করেছেন যদিও সেই পাওনার স্বরূপ তার কাছে অগোচর ছিল না। কিন্তু সেই প্রিয়গোপাল পুত্রবধূর দেওয়া প্রণামী স্বরূপ মাইনের টাকা গ্রহণ করতে পারেননি। অন্যায় অর্থ গ্রহণে তার সংকোচ ছিল না, কিন্তু ন্যায়সংগত অর্থ গ্রহণে তার বিরাগ, কারণ সেটি তার পুত্রবধূর উপার্জিত। পুরুষের অসহায়তা সত্ত্বেও নারীর দ্বারা উপার্জিত অর্থ গ্রহণে যেন পৌরুষের অবমাননা — পুরুষতন্ত্রের এই বোধটি সম্ভবত সেই সময়ে নারীদের কর্মজগতে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় ছিল।

আরতির চাকরিগ্রহণের ফলে সংসারের চেহারা বদলে গেছে। পূর্বের থেকে সংসার সচ্ছল হয়েছে, সব সময়ে বাইরের কাজ করবার জন্য ঝি রাখা হয়েছে, সুব্রত বোন নীলাকেও স্কুলে পড়বার সামর্থ্য অর্জিত হয়েছে। এছাড়া একত্রে কাজে যাবার সময় বাসযাত্রায় সুব্রত আরতির সান্নিধ্যে পানসে হয়ে যাওয়া প্রেমের পূর্ব রোমাঞ্চ পুনরায় অনুভব করেছে। আরতিরও পরিবর্তন হয়েছে, তার গানের সখ, সেলাইয়ের সখ, মাসিক পত্রিকায় গল্প পাঠের সখ আর নেই বরং সে পুরো দস্তুর কর্মী হয়ে উঠেছে তার অফিসের।

কিন্তু চিরদিন পরিবারে সুখের পরিবেশ বজায় থাকে না। আরতির স্বাধীনতা, বাইরের লোকের সঙ্গে মেশা, ট্রামে-বাসে যাতায়াত প্রভৃতি সকলে ভালো মনে গ্রহণ করতে পারে না। পূর্ববাংলা থেকে কলকাতায় আগত সুব্রতদের শুভাকাঙ্ক্ষীরা বাড়ি বয়ে এসে হয়তো খবর দেয় যে, কোনো এক অপরিচিত যুবকের সঙ্গে আরতি রেস্টুরেন্টে চা খাচ্ছিল। এই বিষয়টি বর্তমান কালে কারও কাছে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না, কিন্তু এই গল্পটি যে পটভূমিতে লেখা সেই সময়ের নিরিখে বিচার করলে সে আলোড়নের মাত্রাটি ধরা পড়ে। সুব্রত এই ব্যাপারে আরতিকে প্রশ্ন করেছে, যথেষ্ট সন্তোষজনক উত্তর পেয়েছে, তথাপি মানসিকভাবে অস্বস্তিবোধ করেছে। অর্থ উপার্জনে আরতির মনোযোগকে সুব্রতর মনে হয়েছে 'স্থূল ব্যবসায় বুদ্ধি'। আরতির অনুপস্থিতিতে সাংসারিক কাজে অসুবিধে ছাড়াও সুব্রতরও ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার অভাব হয়, বউয়ের সেবা ঝি-এর কাছ থেকে পেতে তার মন বিরক্ত হয়, তার মনে হয় আরতির বস মুখার্জী এন্ড মুখার্জী কোম্পানীর হিমাংশু মুখার্জী যেন আরতির কিছু অংশ সুব্রতর কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন — "স্ত্রীর দেহমন তারই। কিন্তু দৈহিক শ্রমের দশ আনার শরিক হিমাংশু মুখার্জী।" সুব্রত হিমাংশু বাবুর সঙ্গে দেখা করে আরতির কাজে অসুবিধার কথা বলতে চেয়েছে কিন্তু তার মুখোমুখি হয়ে কিছুই বলতে পারেনি বরং হিমাংশুবাবুই উল্টে সুব্রতর অভিযোগের কথা নিজের ভাষায় বলে দিয়েছেন।

এই গল্পের আলোচনার প্রারম্ভেই বলা হয়েছে যে বাড়ির মেয়েদের বাইরে চাকরি করা নিয়ে যে পারিবারিক দ্বন্দ্ব তাই গল্পের মূল সংকটকে গড়ে তুললেও এই বিষয়টি ছাড়াও 'অবতরণিকা' গল্পটিতে আরও কয়েকটি মাত্রা আছে। আর এই মাত্রার একটি হল পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মানুষদের পারস্পরিক সহানুভূতিপূর্ণ মানসিকতার দিকটি। মুখার্জী এন্ড মুখার্জী কোম্পানীর হিমাংশু মুখার্জী ও সুব্রত উভয়েই পূর্ববঙ্গ থেকে আগত তাই তাদের কথোপকথনে পূর্ববঙ্গের মানুষদের প্রতি একটু অধিক পরিমাণে পক্ষপাতিত্ব ফুটে উঠেছে। সুব্রতরা পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বলে হিমাংশুবাবু আরতির কাছে তাদের ভালই খোঁজখবর নিয়েছেন আর সুব্রতও পূর্ববঙ্গের লোক পেয়ে খুশি হয়ে উঠেছে। গল্প থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করে ব্যাপারটি দেখানো যেতে পারে-

"... 'আমরাও পূর্ববঙ্গের মানুষ মশাই। অত সঙ্কোচ-টঙ্কোচের ধার ধারিনে। দেশের মানুষ দেখলে রেখে ঢেকে আলাপ করতে জানিনে। একেবারে প্রাণ খুলে দিই।'

সুব্রত খুশি হল ঃ 'ও আপনিও পূর্ববঙ্গের ? কোন জেলার ?'

সিগারেটের কৌটা এগিয়ে দিতে দিতে হিমাংশুবাবু হাসলেন, 'খোদ ঢাকার। আপনাদের বাড়িও তো মুন্সীগঞ্জ সাবডিভিশনে ? সবই শুনেছি।'....

....হিমাংশুবাবু আর একবার আত্মপরিচয় দিলেন, 'সব বাঙাল মশাই, কোন চিন্তা করবেন না। বাঙালে বাঙালে ছেয়ে ফেলেছি আমরা, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রায় বার আনি তুলে আনতে হল পাকিস্তান থেকে। কিন্তু চুপচাপ বসে তো আর থাকা যায়না হাত পা কোলে ক'রে। ভাবলাম দেখি কপাল ঠুকে, আর ঢিল ছুঁড়ে। ভাগ্য পরীক্ষা করতে আমরা পূর্ববঙ্গের লোক তো কোনদিন পিছ-পা নই। আর পূর্ববঙ্গের লোক ছাড়া হঠাৎ মেয়েদের জন্য এমন একটা নিউ এভিনিয়ু কেই-বা খুলতে সাহস করত ? পূর্ববঙ্গের লোক না হলে আপনিই কি এত সহজে পাঠাতেন আপনার—'।"

এছাড়া আরেকটি দিক থেকে তৎকালীন সময়ে মেয়েদের বেশবাস ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির বিশিষ্টতাও গল্পে ফুটে উঠেছে। আরতির এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কলিগ বর্তমান যার নাম এডিথ সিমনস্। এই এডিথকে গল্পে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত করা হয়নি, আরতির কথোপকথনেই এই চরিত্রটি সুব্রত ও আমাদের কাছে পরিচিতি লাভ করেছে। এই চরিত্রটি গল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে কিন্তু এছাড়াও ঐ এডিথ সম্পর্কে সুব্রতর মানসিকতার প্রকাশে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের প্রতি সাধারণ বাঙালি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ও মেয়েদের সাজ পোশাকের প্রতি সাধারণ মানসিকতাটি প্রকাশিত হয়। গল্প থেকে কিছুটা অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে, — "বয়সে আরতির চাইতে বড়ই হবে। কিন্তু এমন সেজে-গুজে আসে যে ছোট দেখায়। আরতির কাছে তার রূপ-বর্ণনা শুনতে

শুনতে বেঁটে, কালো, ঠোঁটে কড়া লিপস্টিক আর আঙুলের নখে পালিশ লাগানো একটি এ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ের রূপ সুব্রতর চোখে ভেসে ওঠে।

সুব্রত সাবধান ক'রে দেয়, 'খবরদার ওসব মেয়ের সঙ্গে মোটেই মিশবে না।"

— এই বর্ণনা থেকেই বোঝা যায় এডিথের শুধুমাত্র সাজসজ্জার কথা শুনেই সে যে মন্দ মেয়ে সে সম্পর্কে সুব্রত স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। আবার সুব্রতর ভাবনা থেকেই পরিষ্কার যে ঠোঁটে লিপস্টিক ও আঙুলের নখে পালিশ লাগানো সেই সময় মন্দ মেয়ের লক্ষণ ছিল। সুব্রত ছাড়া হিমাংশু মুখার্জীও এডিথকে সুনজরে দেখেননা, এ দিকটিও গল্পে দেখা যায়। এই কারণে তাই কাস্টমারদের বাড়ি থেকে ফিরলে হিমাংশুবাবু তাকে কড়া কথা শোনান এবং অফিসে না এলে তার সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করতে এমনকি তাকে ''খারাপ টাইপের লুজ মরাল্‌সের মেয়ে'' বলতেও তার বাধেনা।

গল্পের এই দুটি ভিন্ন দিকের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে এবার আরতির কর্মজীবনকে ঘিরে তার পরিবারে যে আলোড়নের জন্ম হয়েছে সেই দিকে দৃষ্টি ফেরানো যেতে পারে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলেও দেখা গেল যে, আরতির চাকরির জন্য সুব্রত একদিন অতিশয় আগ্রহ দেখিয়ে ছিল, এমনকি বাবা মায়ের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে আরতিকে চাকরি করতে দিয়েছিল, সেই সুব্রত আরতিকে চাকরি ছেড়ে দেবার জন্য চাপ দিতে লাগল। নিজের আয় বৃদ্ধির জন্য সুব্রত পার্টটাইম কাজ যোগাড় করল এবং ইন্সিওরেন্সের এজেন্সির কাজ পুনরায় শুরু করে দিল কিন্তু বারংবার বলা সত্ত্বেও আরতি কাজ ছেড়ে দিল না বরং সুব্রতর চরম অসহযোগিতা ও অপমানের পরেও সে অফিসে যাওয়া বজায় রাখল। পারিবারিক সম্মান ও শান্তি রক্ষার দোহাই দিয়ে সুব্রত চেয়েছে আরতিকে বিরত করতে, আরতি তার কথা না শোনায় আরতিকে মারার জন্য তার হাত নিস-পিস করলেও সে সংযত করেছে নিজেকে। এ বিষয়টিতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের প্রাধান্য ও নারীর অসহায়তার দিকটি প্রকাশিত। আরতিকে কাজ ছাড়াতে না পারায় অস্থির সুব্রত নিজের শ্বশুরকে ডেকে এনে আরতির নামে নালিশ করেছে এবং পৃথক হয়ে যাবার ভয় দেখিয়েছে আর আরতির বাবাও সুব্রতর কথাতেই সহমত জানিয়েছেন। এমন পরিস্থিতি সহসা হঠাৎ পরিবর্তিত হয়েছে, আচমকা একদিন সুব্রতর ব্যাঙ্ক ফেল করেছে, রাতারাতি বেকার হয়ে পড়েছে সুব্রত। স্বাভাবিকভাবেই আরতির একার রোজগারের উপর নির্ভর হয়ে পড়েছে সংসার। ফলে অফিসের কাজে সামান্য রাত হলে যেখানে প্রিয়গোপাল, সরোজিনী, সুব্রত সকলেই কটু কথা শোনাতেন, বিরক্ত হতেন, আজ তারা নিজের স্বার্থের কারণেই চুপ হয়ে গেছেন। লেখক বলেন — "অনেক সকালে বেরোয়, অনেক রাত্রে ফেরে। মেশিন বিক্রির কমিশনের জন্য টালা থেকে টালীগঞ্জ টহল দিয়ে বেড়ায়। কেউ কোন কথা বলে না।" এডিথের সঙ্গে মিশতে মানা করেছে সুব্রত, তাই এডিথের সঙ্গে আরতিকে দেখলে সুব্রত ভাবে আরতিকে কিছু বলবে কিন্তু বলে না। বরং ভাবে — "আগে চাকরি জুটুক একটা।" একদিন সুব্রত আরতিকে বলেছিল— "সংসারের প্রয়োজনে

তোমাকে আমিই চাকরি নিতে বলেছিলাম, আবার দরকার বুঝে আমিই তোমাকে ছাড়তে বলছি। চাকরি তোমাকে ছাড়াতে হবে।" যেন আরতির চাকরি করা ও না করা সম্পূর্ণ ভাবে সুব্রতর ইচ্ছাধীন, পুরুষের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রয়াস যেন পরিলক্ষিত হয় এখানে, কিন্তু, সেই কর্তৃত্ব কায়েমে প্রয়াসী সুব্রতও অবস্থার পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়েছে। তাই সুব্রত কোনো খদ্দেরের দ্বারা আরতি অপমানিত হলেও তা সয়ে গিয়ে আরতিকে সে সাবধান করে বলে — "খবরদার' এখন কিন্তু মেজাজ দেখাবার সময় নয় আমাদের। সাবধানে, খুব হিসাব ক'রে চলতে হবে আমাদের।" সংসারে আবার অনটন শুরু হয়, ঝি ছাড়িয়ে দেওয়া হয়, চারিদিকে ব্যয় সংকোচ করা হয় যথাসাধ্য। তথাপি আরতির একার রোজগারে সমস্ত খরচ কুলিয়ে ওঠে না, তাই সুব্রতও ঘরের কাজে হাত লাগায়, আরতিকে কাজ ছাড়িয়ে দেবার জন্য চাপ দেওয়ার বদলে সুব্রত বলে — "দেখ যেন লেট্- ফেট্ না হয়। এ সময় ইরেগুলারিটি ভালো হবে না।" এই ভাবে দেখা যায় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সকলের চরিত্রেরই আমূল পরিবর্তন ঘটেছে, পারিবারিক সম্মানবোধ, ঐতিহ্য সকল কিছু চাপা পড়ে গেছে, বরং প্রকাশিত হয়ে পড়েছে আত্মরক্ষার তাগিদ ও একই সঙ্গে চূড়ান্ত স্বার্থপরতা।

এরপর ঘটেছে এক বিশেষ ঘটনা যা আমাদের পারিবারিক জীবনের মানুষগুলির চরিত্রের মূল দিকটিকে প্রকাশ করে। এক সামান্য ঘটনায় হিমাংশু মুখার্জী এডিথের অবর্তমানে তার সম্পর্কে চূড়ান্ত অবমানকর কথা উচ্চারণ করেন। উপস্থিত কেউ তার প্রতিবাদ না করলেও আরতি তার তীব্র প্রতিবাদ করেছে এবং হিমাংশুবাবু তার কথা উইথড্র না করায় সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে। যে কাজ আরতির প্রাণ ছিল, যার জন্য সে সমস্ত পরিবারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েও নিজের পায়ে দাঁড়াবার প্রচেষ্টা করেছে সেই কাজ অপর একজন নারীর সম্ভ্রম রক্ষার জন্য সে বিসর্জন দিয়ে এসেছে। আরতির এমন আদর্শবাদীতার দিকটি কিন্তু সর্বত্র উপেক্ষিত হয়েছে। প্রিয়গোপাল ও সরোজিনী আরতির চাকরি ছেড়ে দেবার জন্য আরতিকেই দোষারোপ করেছেন, দোষ দিয়েছেন তার মেজাজ ও গোয়ার্তুমিকে, মনিবের কথা অকুণ্ঠে স্বীকার করে নেওয়াই তাদের কাছে শ্রেয় বলে বিবেচিত হয়েছে। তাদের মতে — "সত্যিই তো কোথাকার না কোথাকার একটা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ে। ওরা তো ওই ধরনেরই হয়। কাজের গাফিলতির জন্য মনিব যদি চটে গিয়ে দুচার কথা তার সম্বন্ধে বলেই থাকে তো কি হয়েছে ? দোষ দেখলে তাঁরা বলেন না তাদের ঝি চাকরকে ? যে গুরু দুধ দেয় তার চাঁটও সয়।চাকরি করতে গেলে মনিবের মেজাজ বুঝে চলতে হয় বৈকি। তা ছাড়া আরতিকে তো হিমাংশু কিছু বলেনি। বলবে কেন, একই জেলার লোক, জাতে একই বামুন, বলতে গেলে আত্মীয়ের মত।" এমনকি সুব্রতও আরতির সেন্টিমেন্টাল বাঙালিয়ানাকে ব্যঙ্গ করেছে। কারও কাছ থেকেই সমর্থন না পেয়ে আরতি অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে এবং এখানেই গল্পের সমাপ্তি। অসাধারণ এই গল্পটিতে এই ভাবে একের পর এক উঠে এসেছে মেয়েদের

কর্মজীবনে প্রবেশকে ঘিরে পারিবারিক অশান্তির চিত্র, পুরুষের বিচিত্র ঈর্ষা বিজড়িত কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রয়াস এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির মিথ্যে অহংকার, দম্ভ ও ফাঁকা বংশ গৌরবের অহংকার।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নির্ভর গল্প ও কিশোর গল্প ঃ

সকল গল্পকারই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনদর্শন ও অভিজ্ঞতার পুঁজিকেই গল্প লেখার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। অভিজ্ঞতা ও কল্পনার সংমিশ্রণেই বাস্তব গ্রাহ্য প্রতীতির জন্ম। সেই হিসেবে সব গল্পকেই গল্পকারের অভিজ্ঞতাজাত গল্প বলা যায় তবে এই অংশে আমরা আলোচনা করব সেই সকল গল্প যে গল্পের বিষয় সমূহ উঠে এসেছে নরেন্দ্রনাথের একান্ত ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা থেকে। তাঁর রচিত কিশোর গল্পগুলি এই ধরনের রচনার সবচেয়ে উপযুক্ত উদাহরণ। কিশোর গল্পগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথ নিজের কিশোর জীবনের কাহিনি গল্পাকারে বিবৃত করেছেন, নিজের ভাই, বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনেরা সেখানে স্বনাম ও স্বমহিমায় বিরাজমান। এইসব গল্পগুলিতে কিশোর চরিত্র সম্পর্কে নরেন্দ্রনাথের জীবনভাবনাটি পরিস্ফুট হয়। নরেন্দ্রনাথের 'কিশোর গল্প সমগ্র' এর ভূমিকায় তাঁর পুত্র তথা গ্রন্থটির সম্পাদক অভিজিৎ মিত্র লেখেন — "প্রথম ষোলটি গল্প লেখকেরই ছোটবেলার গল্প, যা বলতে গিয়ে তিনি ছদ্মবেশ এমনকি ছদ্মনামের আড়ালটুকুও রাখেননি। ছোটবেলার জগৎ যেন নিজেই এক গল্প।"[২১] এছাড়াও এই গ্রন্থের অন্যান্য গল্পেও তিনি পরোক্ষভাবে বর্তমান। এই ব্যক্তিজীবনের কিশোর গল্পগুলির মধ্যে 'কুমির', 'গুপ্তচর', 'কুশল', 'অনাথের কীর্ত্তিকলাপ', 'ময়ূরপঙ্খী', 'নষ্টচন্দ্র', প্রভৃতি গল্পগুলির কথা উল্লেখ করা যায়। এই কিশোরগল্প ব্যতীতও বেশ কিছু গল্পে নরেন্দ্রনাথের ব্যক্তি জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে। এই গল্পগুলিতে হয়তো লেখক স্বনামে আবির্ভূত হননি কিন্তু ব্যক্তিজীবনের বিশিষ্ট অভিজ্ঞতাটি সেখানে পরোক্ষভাবে উপস্থিত থেকেছে। 'নেতা' গল্পটিকে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতেই নরেন্দ্রনাথ সামরিক অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে কাজ পেয়েছিলেন। কাজটি ছিল সৈন্যদের ব্যবহার্য জিনিসপত্র পরীক্ষা করে দেবার , আর এখানে নরেন্দ্রনাথ পরীক্ষা করতেন বালতি। ধীরেন্দ্রনাথ দাদার এই কাজকে বলেছেন, "বালতি টেপার চাকরি।"[২২]। এই অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে কাজ করবার অভিজ্ঞতাকে তিনি বেশ কিছু গল্পে পটভূমিকা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। 'চোরাবালি' গল্পটিতে কাহিনির দুই প্রধান চরিত্র গৌরাঙ্গ ও অনাদি এইরকম এক ফ্যাক্টরিতেই পরীক্ষকের কাজ করে। ধীরেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিচারণায় লেখেন — "যার কোনো জিনিস সম্পর্কেই জ্ঞান নেই তার উপর ভার পড়ল জিনিস বেছে দেবার। দাদার বস্তুজ্ঞান কম থাকলেও সাধারণ মানুষ সম্পর্কে আগ্রহ কম ছিল না। অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি থেকে দাদা কিছু ভালো গল্প ধরে আনল।"[২৩] এই 'কিছু গল্প ধরে' আনার আলোকেই 'নেতা' গল্পটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নির্ভর গল্পের স্থানাভিষিক্ত হয়, কারণ 'নেতা' গল্পটির পটভূমিকা ও চরিত্রেরা

প্রত্যক্ষভাবে উঠে এসেছে লেখকের একসময়ের কর্মস্থল অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি থেকে।

'নেতা' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'অরণী' পত্রিকায় আশ্বিন, ১৩৫১ বঙ্গাব্দে। মানুষের মনোলোকের গহনে বিচরণকারী নরেন্দ্রনাথ সামান্য একটি কাহিনিসূত্রকে বা ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে এখানে উদ্ভাসিত করেছেন জীবিকান্বেষী মধ্যবিত্ত শ্রেণির বাধ্যতামূলক অধঃপতন এবং এর মধ্যেই কৌতুককর ভাবে নিজের আত্মমর্যাদা ও সম্মান রক্ষার ব্যর্থ প্রয়াসের দিকটি। মেরুদণ্ডহীন মানুষের অন্যায়ের প্রতিবাদ করার মনোগত ইচ্ছা আবার একই সঙ্গে পরিস্থিতির চাপে ও চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাবে সেই প্রতিবাদের ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবার কাহিনি 'নেতা' গল্পের মূল।

উত্তমপুরুষীয় রীতিতে রচিত এই গল্পের কাহিনি অংশ সামান্য। অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে সৈন্যদের ব্যবহার্য জিনিসপত্র পরীক্ষকদের দলে গল্পকথক ভিন্নও রয়েছেন চন্দ্র চাটুয্যে, শিবু, বিপিন, রমেশ প্রভৃতি নিম্নবিত্ত শ্রমিকদের দল এবং "পরিচালক হিসাবে বিভিন্ন পদের সামরিক উপাধিধারী একেক জন শ্বেতাঙ্গ।" শ্রমিক দলের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ চন্দ্র চাটুয্যে কাজ করে সামান্য। তার মূল দায়িত্ব এই দলের উৎসাহ বর্দ্ধন করা, আদিরসের গল্পের স্রোতে সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই গল্পের নেশায় সাহেবকে লুকিয়ে চন্দ্র চাটুয্যের কাজ অন্যান্যরা ভাগ ক'রে করে দেয়। আদিরসের এই ফেনিল উচ্ছ্বাসকে রুচি সম্মত করবার গল্পকথকের একক প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে গেছে "চাটুয্যের রসস্রোতে"।এই নেশা লাগানো গল্প সকল শ্রমিককে প্রমত্ত করে রাখে। এ হেন চন্দ্র চাটুয্যের কাজে ফাঁকি দেওয়া ও গল্পে মত্ত থাকা চোখে পড়ে গিয়েছে বড় সাহেব ক্যাপ্টেন উইলসনের। উইলসন চন্দ্রকে এক রোজের বেতন জরিমানা করেছে। অসহায়ভাবে চাটুয্যে জরিমানা রদ করবার জন্য কৃপাভিক্ষা করেছে ক্যাপ্টেনের কাছে, তার পা জড়িয়ে ধরতে গিয়ে বলেছে—"একেবারে ম'রে যাব-একেবারে ম'রে যাব স্যার।"

সাহেব চলে যেতেই জেগে উঠেছে চাটুয্যের ব্রহ্মরক্ত, একই সঙ্গে জেগে উঠেছে মধ্যবিত্তের বিপ্লবী মনুষ্যত্ব। তার জরিমানার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে সে সবাইকে বলেছে — "এ ফাইন রদ কর। আর বুড়ো ব্রাহ্মণকে ম্লেচ্ছের বাচ্চা সকাল বেলায় যে অপমানটা ক'রে গেল তার শোধ তোল।"

বিদ্যা-বুদ্ধিতে নেতৃত্ব প্রাপ্ত কথক এবার সত্যি সত্যি নেতা হয়ে উঠেছে। বিপ্লবী মানসিকতার জাগরণে, অন্যায়ের প্রতিবাদকল্পে আত্মবলিদানের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে সবাই। কিন্তু সেকসন ইনচার্জ ডসন সাহেব যখন এই 'বিদ্যার জাহাজ', 'বুদ্ধির সাগর' নেতাজী তথা গল্প কথককে ডিসচার্জ করেছে তখন সঙ্গে সঙ্গে চাটুয্যে সহ বাকি সকলেই বিনা প্রতিবাদে সাময়িক কর্মবিরতি সমাপ্ত ক'রে হাতে বালতি তুলে নিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করে। কিছুক্ষণ পূর্বেই যে ক্ষণস্থায়ী চাকরিকে অতিতুচ্ছ জ্ঞান ক'রে অন্যায়ের প্রতিবাদ কল্পে সবাই একজোট হয়েছিল তাদের সেই সংকল্প অতি সহজেই ভেঙে

পড়েছে। মানুষের দুর্বলতা, নীচতা, হীনতা, ইতরতা ও লোভ গ্রাস করেছে মহৎ সংকল্প, মহত্ত্ব ও সাধু উদ্যোগকে। মেরুদণ্ডহীন মানুষ সামান্য আঘাতে গুটিয়ে গিয়ে কেন্নো হয়ে গেছে। যার উপর অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে নব প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক নেতা চাকরি খোয়ালেন, সেই চন্দ্র চাটুয্যে নিজের আচরণের ব্যাখ্যা দিয়েছে লজ্জাহীনভাবে — "আরে বাবা, ওটা স্থানমাহাত্ম্য। প্রথমে দাঁড়ালে ভটচায্ যা বলেছে — আমিও ঠিক তাই বলতুম, আর ভটচায্ও যদি আমার জায়গায় দাঁড়াত তা'হলে তার ফলাফল দেখে ভটচায্ও ঠিক তোমাদের মতই একটা ক'রে বাকেট হাতে তুলে নিত। নেতাগিরি জিনিসটাই আসলে এই। নেতা কেউ নিজের ক্ষমতায় হয় না, অবস্থা গতিকে ধ'রে বেঁধে একেকজনকে নেতা আমরা বানিয়ে বসি। সেটা তার কপাল জোরও বটে, গ্রহ বৈগুণ্যও বটে।"

ভীরু, কাপুরুষ শ্রমিকদের নিকট থেকে চন্দ্র চাটুয্যের বক্তব্যের সমর্থনও পাওয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে— "ঠিক বলেছেন, চাটুয্যেদা ! অবিকল তাই।"

মধ্যবিত্তের বিপ্লবী মনুষ্যত্বকে সস্তায়, প্রয়োজনের বেদিতে বলিদান দিয়ে আত্মসর্বস্ব, অর্থান্বেষী, সুখবাদী স্খলিতগোত্র মানুষের অধঃপতন এবং তারই মধ্যে সংগ্রামের প্রেরণা, এই নিয়েই গল্পের সমাপ্তি ঘটেনি। জীবনের এই বিকৃতি ও ভণ্ডামির মূলে যে সমাজ ব্যবস্থার সক্রিয়তা ক্রিয়াশীল সে সম্বন্ধেও লেখক সচেতন। তাই যখন এই আদর্শবাদী, আত্মত্যাগে উজ্জ্বল নেতাকে সেসন ইনচার্জ ডসন অনুকম্পাবশত পুনরায় কাজে যোগ দিতে বলেছে, তখন তার মনে হয়েছে দারিদ্রপীড়িত সংসারের কথা, অসুস্থ স্ত্রী সুমিতার জ্বরতপ্ত মুখের কথা, ক্রন্দনরত খোকার কথা। সামান্য একটু ইতঃস্তত করার পর দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে ডসনের প্রস্তাবেই সম্মত হয়েছে সে। যে সামান্য বাধা মনে মনে অনুভব করেছে তা বিবেক দংশন নয় বরং তা 'চক্ষুলজ্জা'। এই চক্ষুলজ্জারও একটি আড়াল সে মনে মনে ভেবে নিয়েছে— "ওদের মত লোকের কাছে আবার চক্ষুলজ্জা ? বরং ওদের ব্যবহারের জবাব চাকরি নিয়ে ওদের ওপর সর্দারি ক'রেই দিতে হবে।" নিম্ন মধ্যবিত্ত আর দরিদ্র মানুষের পরাজয়, অপমান, লাঞ্ছনা ও আত্মসমর্পণ এবং এর মধ্যেই মাথা উঁচু রাখার ভণ্ডামির বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়েছে এখানে। স্ত্রীর জন্য বেদানা আর খোকার জন্য লজেন্স নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন এই নেতা।

ভট্চাযের এই চাকরিতে পুনরায় যোগদানের খবর বিশ্বাস করতে পারেনি চাটুয্যের দল। তারা যা পারেনি, তাদের নেতা হয়ে ভটচায্ তা পেরেছে এই আশা ও বিশ্বাস তাদের ছিল। তাই সেদিন বিকেলে দলবদ্ধভাবে ভটচাযের বাড়িতে গিয়ে তার চাকরিতে যোগদানের সংবাদ শ্রবণ করে তারা সেই সংবাদ বিশ্বাস করতে চায়নি। বরং অবিশ্বাসের সুরে বলেছে— "যাঃ ঠাট্টা করছ! তুমি আবার তাই পার নাকি?" নিজেদের দুর্বলতা সম্পর্কে এই শ্রমিকদের দল সচেতন, কিন্তু তাদেরই একজন সাহেবদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করে তাদের মনে যে শ্রদ্ধা ও মর্যাদার আসন লাভ করেছিল সেই সান্ত্বনার স্থানটিও তাদের

ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। লাঞ্ছিত অপমানিত মানবাত্মার প্রতিবাদস্পৃহা সংহত বিদ্রোহ মূর্তি লাভ ক'রে যে অন্তরের পূজা লাভ করেছিল সেই আদর্শও ভেঙে পড়েছে। নিজেরা অধঃপতিত - দুর্বলচিত্ত হয়েও অন্যের বিল্পবের জ্যোতিতে আলোকিত হবার সুখ ও গৌরব লাভ করা থেকেও তারা বঞ্চিত হয়েছে। তাই শ্রমিকদের নেতা তথা কথকের মনে হয়েছে— "ওরা কি সত্যিই আমার কাছে অন্য কিছু আশা করেছিল? সত্যিই দেখতে এসেছিল, ওরা যা পারেনি আমি তাই পেরেছি ? উইলসন আর ডসনের চেয়েও কি আমি ওদের বেশি নিরাশ আর বেশি আপমান করলুম ?"

গল্পের নির্মেদ ভারহীন দেহ একটি বক্তব্যকেই প্রকাশ করেছে, আর সেই বক্তব্য হল — মানবিক সম্পর্ক ও আচরণ স্বার্থচালিত, তা হৃদয়াবেগ নিয়ন্ত্রিত নয়। হৃদয়াবেগ ও মানুষের বিবেক কখনো কখনো প্রাধান্য লাভ ক'রে অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেও মধ্যবিত্ত সুলভ মানসিকতা পরিত্যাগ করতে না পারার জন্য তা শেষ পর্যন্ত ভন্ডামিতে পরিণত হয়। এই প্রসঙ্গে সুবোধ ঘোষের 'গোত্রান্তর' গল্পের কথা স্মরণে আসে। 'নেতা' ও "গোত্রান্তর' উভয় গল্পেই লেখকদ্বয় আত্মপ্রতারক মধ্যবিত্তের দ্বিধাদীর্ণ মানসিকতার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ করেছেন। মধ্যবিত্তের আদর্শের নামে ভন্ডামি, আত্মপ্রতারণা, গর্ব,অসূয়া, আত্মাভিমান, ভীরুতা, নীচতা ও অন্যায়ের সঙ্গে আপসের সুবিধাবাদী প্রবণতা এই গল্পে পরিস্ফুট, একই সঙ্গে মধ্যবিত্তের এই মেরুদন্ডহীন আচরণ ও সেই দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতনতা ও অন্যের মধ্যে এক আদর্শায়িত রূপ দেখবার আকাঙ্ক্ষাও পরিস্ফুট। এই সব দুর্বলচিত্ত মানুষের হীনতা নীচতাকে উত্তরণ করবার প্রচেষ্টা সম্বন্ধেও লেখক সমানভাবে সচেতন ও সহানুভূতিশীল।

এই প্রসঙ্গ আলোচনার সূচনাতেই বলা হয়েছে যে, নরেন্দ্রনাথের কিশোর গল্পসমূহে তাঁর ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত জীবন্ত ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে 'কিশোর গল্প সমগ্র' -এ যে গল্পগুলি সংকলিত হয়েছে সেগুলির অধিকাংশতেই প্রধান চরিত্র বালক নরেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য চরিত্রেরাও অপরিচিত নয় বরং তাঁরই ভাই ধীরেন্দ্রনাথ, খুড়তুতো ভাই হেমেন্দ্রেনাথ, বাড়ির কমবয়েসী ভৃত্য অনাথ প্রমুখ। এই চরিত্রগুলি যে নিছক সুস্পষ্টভাবে রূপলাভ করেছে তাই নয় এক্ষেত্রে সামান্য ছদ্মনামের আড়ালও লেখক রাখেননি। কিশোর গল্পের চরিত্র পল্টু, কান্দু ও বাঞ্ছু প্রকৃতপক্ষে যথাক্রমে নরেন্দ্রনাথ, ধীরেন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রনাথেরই ডাকনাম। নরেন্দ্রনাথের কিশোর গল্পগুলি যে কেবল তাঁর কৈশোর কালকে জীবন্ত ভাবে তুলে আনার জন্যই বিশিষ্ট তা নয়, এই গল্পগুলির একটি বড় বৈশিষ্ট হল এখানে রাজা-রাণী-পক্ষিরাজ ঘোড়ার কাহিনি নেই, তথাকথিত ছোটদের গল্পের মত রাক্ষস-খোক্কস বা পরীদের কাহিনিও তিনি রচনা করেননি বরং নিজের বাল্যজীবনের অভিজ্ঞতাকে, কিশোর বয়সের কল্পনাময় জগৎ, দুষ্টুমি, কলহ, বিবাদ, ভালোলাগা, অপূর্ণ সাধ, বন্ধুত্বের দাবী, মেলা দেখার অভিজ্ঞতা — এ সকলকে তুলে এনেছেন তাঁর গল্পের উপাদান হিসেবে। তাঁর অন্যান্য গল্পগুলির মত তাঁর কিশোর গল্পও তাই

চেনাজগতের গল্প, পরিচিত জনের গল্প, মাটির কাছাকাছি গল্প।

নরেন্দ্রনাথের কিশোর গল্প 'ময়ূরপঙ্ক্ষী' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে দেবসাহিত্য কুটির শারদীয়া সঙ্কলন 'অপরূপা' তে। এই গল্পে রয়েছে কিশোর মনের স্বপ্ন আর সেই স্বপ্ন পূরণের পথে বিপজ্জনক এক দুর্ঘটনা। কাহিনির এই বিষয়টি ব্যতীত কিশোর মনের গভীর মনস্তত্ত্বের উদ্ভাসনও রয়েছে গল্পটিতে, যা গল্পটিকে ভিন্নমাত্রা দান করে। নরেন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোরকাল কেটেছে পূর্ববাংলার সদরদি গ্রমে। বর্ষাকালে তাদের বাড়ির চারধারেই জল থৈ থৈ করত, শুধুমাত্র বাড়ি গুলি "সমুদ্রের মধ্যে পিঠ ভাসিয়ে কোনরকমে জেগে থাকত"। যেহেতু বাড়ি থেকে পা বাড়ালেই জল তাই কাজকর্ম, হাটবাজার, স্কুলে যাওয়া সব কাজেই নৌকা ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা। তাঁদের ঘাটেও দুটো নৌকো বাঁধা থাকত আর নরেন্দ্রনাথ তথা পল্টুর বাবা কাকারা যেমন তাতে করে কাজে যেতেন তেমনি পল্টু, কান্দু, বাঞ্ছুরা স্কুলে যেতেন সেই নৌকাতে চেপেই। সম্পন্ন ব্যক্তিদের নৌকো থাকলেও দরিদ্র চাষী বা মজুরেরা যাতায়াত করতে ব্যবহার করত তাল গাছের তৈরি ডোঙা, অথবা কলার ভেলা। যেহেতু পল্টুরা প্রতিদিন নৌকোতে চড়লেও ভেলা ও ডোঙাতে চড়তেন না তাই ভাবতেন — "... যত মজা ওই ভেলা আর ডোঙার মধ্যেই আছে। বড় বড় নৌকায় না গিয়ে, ওই যে ভেলা আর ডোঙায় কোন রকমে জলের ওপর একটু ভেসে থাকা ওতে ঢের বেশি সাহস আর বীরত্ব দরকার।" যেহেতু কিশোর বয়স তাই তাদের মনে বীরত্ব দেখাবার সাধটিও প্রবল হয়ে উঠেছে, আর বীরত্ব দেখাবার উপাদানটি হল কলার ভেলা। কলার ভেলা শুধু পল্টু বা কান্দুদের বীরত্ব প্রকাশের মাধ্যমই নয়, এই ভেলা ছিল তাদের আকাশচারী কল্পনারও বাহন। তাই স্কুলের পণ্ডিতমশাই যখন মহাদেশ, মহাসাগরের নাম মুখস্থ করান বা মানচিত্র নীল রঙের সমুদ্রগুলিকে চিনিয়ে দেন তখন বালক পল্টুর মন ভেলা নিয়ে সেই নীল রঙের সমুদ্রে ভেসে পড়ত, সমুদ্র পাড়ি দেবার সংকল্প জাগত তাঁর মনে — "ক্লাসে বসে ব্লাকবোর্ডের ওপর টাঙানো বড় মানচিত্রটায় মহাসমুদ্রগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে হতে আমার মন সেই খালের ঘাটে ভেলার কাছে চলে যেত। আবার কোনদিন বা ওই ভেলাটাকে নিয়েই মহাসমুদ্রে ভেসে পড়ত। মানুষের কত দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প শুনতাম পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে। প্রথমেই তো মানুষ আর লঞ্চ স্টীমার তৈরি করতে শেখেনি। সুমুদ্রপাড়ি দেওয়ার জন্যে পাল তোলা কাঠের নৌকো গাছের গুঁড়িই তো ছিল সম্বল। তারা যখন পেরেছে আমরাই কি পারব না ? মহাসমুদ্রের তরঙ্গমালার চূড়ায় চূড়ায় ডুবতে ডুবতে ভাসতে ভাসতে পাতালের মণিমুক্তা লুঠতে লুঠতে আমরাও কি এক অজানা রাজ্যে গিয়ে পৌছাতে পারব না ?" কলার ভেলাকে নিয়ে কিশোর মনের এই কল্পনাই পল্টু, কান্দু ও বাঞ্ছুকে উদ্বুদ্ধ করেছে ভেলা বানাতে। বাড়ির ভৃত্য অনাথের শরণাপন্ন হয়েছে তারা, কিন্তু অনাথ তাদের ভেলা তৈরি করে দেয়নি বরং তাদের 'গোপন আবদার' প্রকাশ করে দিয়েছে বাড়ির বড়দের কাছে। ছোটদের ভেলা বানাবার পরিকল্পনায় বড়রা কেউ করল হাসাহাসি, কেউ করল

ঠাট্টা আবার কেউ করলেন শাসন। বাবার বকাঝকার সঙ্গে জুটলো বীরেনদারও তর্জন। এই বীরেন চরিত্রকে কেন্দ্র করে লেখক প্রকাশ করেছেন কিশোর বালকের মনস্তত্ত্বকে। বীরেন পল্টুর আপন দাদা নয়, শুধুমাত্র বৃত্তি পরীক্ষা দেবার জন্য তাদের বাড়িতে এসে রয়েছে, বছর চোদ্দোর স্বাস্থ্যবান বীরেন পড়াশুনায় ভালো ও ভালো ছেলে বলে সবার সমাদার লাভ করে। পল্টু থেকে তিন ক্লাশ উপরে পড়া বীরেনদার সমান মর্যদা পল্টু পায় না বরং মাছের বড় মুড়ো বা দুধের সরও বীরেনদাই বেশি মাত্রায় পায় বলে পল্টু বীরেনদাকে হিংসে করে। শুধু তাই নয় বীরেনের ঠোঁটের ওপর হালকা গোঁফের রেখাও পল্টুর হিংসের কারণ, এই সব কারণে — "বীরেনদার জন্যে আমার (পল্টুর) বুকের মধ্যে হিংসার এক বিশাল অতলান্ত সমুদ্র লুকিয়ে ছিল।" গম্ভীর স্বভাবের বীরেনদাকে পল্টু দেখতে পারেনা, অন্যের মুখে তার নিন্দে শুনলে পল্টু খুশি হয়। এইভাবে বীরেনের প্রতি পল্টুর মনোভাব ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে কিশোর বয়সী বালকের বিশিষ্ট মানসিকতাটি পরিস্ফুট। যাইহোক অনাথ ভেলা বেঁধে না দেওয়ায় পল্টুরা শরণাপন্ন হয়েছে প্রতিবেশি গোপাল ঘরামির মেয়ে বালবিধবা বুঁচী পিসির। পুনঃ পুনঃ তাগিদ দেওয়ায় একদিন সত্যি সত্যিই বুঁচী পিসি তৈরি করে দিয়েছে এক কলার ভেলা। সেই কলার ভেলা পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছে পল্টুরা। তাদের কাছে কলার ভেলা প্রতিভাত হয়েছে সোনার ভেলা রূপে। বড়রা সকলে খুশি না হলেও ভেলাটাই কদিন হয়ে উঠল ছোটোদের খেলার প্রধান উপকরণ। শুধু ভেলাতে চড়ে জলে ভেসে বেড়ানোই নয়, তারা চেষ্টা করল ভেলাটিকে সুসজ্জিত করতে, চেষ্টা চলল ছই ও পাল খাটানোর। ভেলা নিয়ে এই আনন্দের উৎসব বেশিদিন স্থায়ী হোলনা বরং একদিন স্কুলে যাবার সময় নৌকা না পেয়ে বড়দের কথা অগ্রাহ্য করে বাঞ্ছু একাই ভেলা নিয়ে স্কুলে যাবার চেষ্টা করেছে আর তার ফল হয়েছে মারাত্মক। একাকী লগি ঠেলতে গিয়ে গাব গাছে লগির ধাক্কা লাগায় বাঞ্ছু জলে পড়ে তলিয়ে গেছে। এই দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে জলের ধারে ভীড় হয়ে গেছে, চেঁচামেচি শুরু হয়েছে কিন্তু বাঞ্ছুকে উদ্ধার করতে কেউ জলে নামতে সাহস পায়নি। এমন সময় বাঞ্ছুর পরিত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে পল্টুর হিংসার পাত্র বীরেনদা। গায়ের জামা খুলে, পরনের কাপড় মালকোঁচা দিয়ে পরে সে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে জলে আর তারপর নিপুণ দক্ষতায় সাঁতরে গিয়ে বাঞ্ছুকে তুলে এনেছে জলের নীচ থেকে। সংজ্ঞাহীন বাঞ্ছুকে বাচাঁতে সে এরপর ডাক্তারকেও ডেকে এনেছে এবং শেষ পর্যন্ত তারই চেষ্টায় প্রাণে বেঁচে গিয়েছে বাঞ্ছু। রাতারাতি বীরেনের জয়গৌরব গেয়ে উঠেছে সবাই, পল্টুও হিংসা পরিত্যাগ করে বীরেনকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছে আর সাধের ভেলাটা সহসা তার দৃষ্টিতে হয়ে পড়েছে অপয়া। বিকেল বেলা চুপি চুপি ভেলাটার খোঁজ নিতে গিয়ে পল্টু দেখে সেটিকে কেউ ভাসিয়ে দিয়েছে, ভাসতে ভাসতে সেটা চলে গেছে নদীর দিকে। এই ভাবে পল্টুর 'ময়ূরপঙ্খী'-এর করুণ পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু কলার ভেলা তাদের স্বপ্নকে মুক্তি দিয়েছে, তার স্মৃতিকে লেখকের মনে অক্ষয় করেছে- "সেই ভেলা ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাসছে। এক সমুদ্র থেকে আর এক সমুদ্রে গিয়ে

পড়েছে। তার আর ফিরে আসবার গরজ নেই। কেনই বা থাকবে। নীল সমুদ্রের ফেনা গায়ে মেখে গভীর সুনীল সমুদ্রে সে শুধু ভাসবে আর ভাসবে।"

এইভাবে দেখা যায় একটি সামান্য কলার ভেলাকে কেন্দ্র করে লেখক বাল্যমনের কল্পনা, সাধ ও স্বপ্নকে ফুটিয়ে তুলেছেন আবার একই সঙ্গে শিশু মনের মনস্তত্ত্বের উদ্ভাসনেও গল্পটি উজ্জ্বল।

নরেন্দ্রনাথের কিশোর গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় খুব সহজ সরলতার সঙ্গে কাহিনি বিবৃত হলেও সেখানে গভীরতার ছোঁয়া বর্তমান। এমনই এক গল্প 'অনাথের কীর্ত্তিকলাপ'। নরেন্দ্রনাথ তথা পল্টুদের বাড়ির ভৃত্য অনাথকে নিয়ে রচিত এই গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৬৭ বঙ্গাব্দে, দেব সাহিত্যে কুটির শারদীয় সঙ্কলন 'অপরূপা'য়। শিশুকাল থেকে অনাথের সঙ্গে নিজেদের পার্থক্য অনুভব করলেও সে যে বাড়ির ভৃত্য তা উপলব্ধি করতে পারেনি পল্টু। সে দেখেছে তাকে ও তাঁর ভাইদের বই শ্লেট নিয়ে স্কুলে যেতে হয়, সন্ধ্যার পর গল্প শোনা ছেড়ে প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়তে হয়, অঙ্ক কষতে হয়, ইংরেজি পড়তে হয়, পড়তে পড়তে ঝিমুনি এলে বা গল্প করলে মাস্টারমশাইয়ের ধমক বা কানমলা খেতে হয় অথচ অনাথকে এসব কোনো 'বাজে কাজ' করতে হয়না বরং তার বদলে অনেক মজার মজার কাজ করবার ভার সে পেয়েছে। যেমন অনাথ অনায়াসে বাবা কাকাদের পিছনে পিছনে থলে নিয়ে ভাঙ্গার বাজারে যায় নিয়মিত, যেখানে পল্টুরা কদাচিৎ যাবার সুযোগ পায়। এছাড়া বর্ষাকালে যখন বাড়ির চারপাশে জল হয়ে যায়, নৌকা করে যাতায়াত করতে হয় তখন পল্টুদের নৌকার চালক হয় এই অনাথ। নিজেদের সকল বাধ্যতামূলক কাজই তাই কিশোর পল্টুদের কাছে 'বাজে কাজ' আর অনাথের সব কাজই তাদের কাছে আকর্ষণীয়, হিংসার যোগ্য। তাই তারা অনাথের মত হতে চায়, তাদের মতে — "অনাথের মত হতে কে না চায় ?" আর "অনাথের মত সুখী কে ?"। অনাথও পল্টুদের মনের আকাঙ্ক্ষা বুঝতে পারে, তাই পান্তাভাত খাবার জন্য লালায়িত পল্টুদের দেখিয়ে দেখিয়ে সে রোজ পান্তাভাত খায়, আর তাই দেখে পল্টুরা লালায়িত হয় — "পোড়া লঙ্কা কি কাঁচা লঙ্কা পাতে ঘষে ডাল পোড়া দিয়ে মেখে দিব্যি হুস হুস করে অনাথ ভাতের থালা শেষ করে। খাওয়া হয়ে গেলে থালার জলটুকু — যাতে এখন অপূর্ব ঝোলের স্বাদ — চুমুকে চুমুকে শুষে নেয়। সেই এক ঘেয়ে গরম ভাত খেতে গিয়ে হিংসায় আমাদের বুক জ্বলে, চোখ টাটায়, জিভ দিয়ে জল পড়ে। গরমের দিনে পান্তা ভাত শীতের দিনে পরশুতি, অনাথের মত সুখী কে?"

অনাথের প্রতি হিংসায় পল্টুরা অনাথকে জব্দ করতে ফন্দি আঁটে, তাকে অপমান করে গায়ের জ্বালা মেটাতে চায় কিন্তু বয়সে ও শক্তিতে বড় অনাথের সঙ্গে তারা পেরে ওঠে না, উল্টে অনাথের প্রতি সহানুভূতিশীল বাবার কাছে তাদের শাস্তি পেতে হয়। এই ভাবে দিন যায়, পল্টু, কান্দু, বাঞ্ছুদের বয়স বাড়ে, কেউ হাইস্কুলে ভর্ত্তি হয়, কেউ প্রাইমারি স্কুলে ছেড়ে এম.ই.স্কুলে আসে, নতুন নতুন বই, নতুন

নতুন বন্ধু, জগতকে নতুন চোখে দেখার সৌভাগ্য হয় তাদের, কিন্তু অনাথ থেকে যায় সেই তিমিরেই। যে কারণে শিশু বয়সে অনাথকে তারা হিংসা করত তা যে তাদের অপরিণত বুদ্ধিরই ফল সেবিষয়টি পল্টুরা অনুধাবন করতে শেখে আস্তে আস্তে। লেখক বলেন — "কিন্তু অনাথের সেই একই কাজ বাঁধা। হাট করে বাজার করে গরু রাখে বর্ষার দিনে নৌকা বায়, কুয়োর দড়ি ছিঁড়ে গেলে দিদিভাইয়ের সঙ্গে বসে বসে দড়ি পাকায়। যখন পাট কাটার সময় হয় চাষীদের সঙ্গে যায়, নিজের হাতে পাট না কাটলেও পাট ধোয়ার সময় থাকে, মেলার সময় থাকে। ধান কাটার সময়ও চাষীদের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হয় ওকে। আমার অনেক পড়া আর ওর অনেক কাজ।"

ধীরে ধীরে সময়ের সঙ্গে অনাথের চালচলন বদলে যেতে থাকে, বাড়ির মা কাকীমাদের কথা সে ভাল করে শোনে না, মুখে মুখে তর্ক করে, কাজে ফাঁকি দিয়ে আড্ডা দেয়, তাস খেলে, কখনও বা লুকিয়ে বিড়ি বা সস্তা সিগারেট খায়। বহু বেয়াড়াপণার পরেও সে কাজে বহাল থাকে, কিন্তু একদিন তার বাড়ি ছাড়বার দিন আসে, সে নিজেই পল্টুর বাবার কাছে তাকে বিদায় দেবার আর্জি জানায়। গ্রামে টিউবওয়েল বসাবার লোকদের সঙ্গে সে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে চায়, বাড়ির ভৃত্য হয়ে সে থাকতে চায় না বরং বৃহত্তর পৃথিবীর ডাকে সাড়া দিতে চায়, নিজের জীবনকে ভিন্ন পথে প্রবাহিত করতে চায়। যে পল্টু, কান্দু, বাঞ্ছুরা একদিন অনাথকে হিংসে করত, জব্দ করতে চাইত, তারাই অনাথকে জড়িয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে, বিদায়ের অশ্রুজলে অনাথের বিদায়যাত্রা করুণ হয়ে উঠে। পল্টুর পিতা বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষ মহেন্দ্রনাথও আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেন, কাছারি কামাই করে সেদিন তিনি বাড়িতেই ছিলেন এবং খাঁচার দরজা খুলে নাম না জানা বুনো পাখিটিকে নিজের হাতে ছেড়ে দেন। এই ভাবে দেখা যায় সরল সহজ হাল্কা চালের কিশোর গল্পও ভাব-ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে সমাপ্তি লাভ করে।

বাল্যের খেলার সঙ্গী কুশল সাহাকে নিয়ে নরেন্দ্রনাথ রচনা করেছেন 'কুশল' গল্পটি। গল্পটি কুশলের বোকামি নিয়ে। বুদ্ধি কম বলে গ্রামের সকলেই কুশলকে ডাকে 'বোকা কুশা' বা 'কুশা বোকা'। ভারী শান্ত ও নিরীহ বলে কুশলের প্রতি পল্টুর সহানুভূতি আছে, মমত্ব আছে, কিন্তু অন্তরের সেই বেদনাকে সে প্রকাশ করতে ভয় পায়, বোকা কুশল তার বন্ধু একথা সবাই জানলে যদি অন্য সকলে তাকেও বোকা মনে করে তাই পল্টু কুশলের সঙ্গে ভয়ে ভয়ে মেশে। তাই পল্টু অন্যের সামনে কুশলকে বন্ধু বলে ঘোষণা করতো না এবং নিজের ব্যক্তিত্বের এই দৃঢ়তার অভাব ও সাহসহীনতাকে অকুণ্ঠে নরেন্দ্রনাথ গল্পে প্রকাশও করেছেন — "কিন্তু ও (কুশল) যে আমার বন্ধু একথা সবাইর সামনে ঘোষণা করতে আমার সাহস ছিল না। পাছে কানাইরা আমাকেও ওরই মত একজন কেউ বলে ভেবে বসে। তাহলে ঠাট্টা - তামাশায় আমাকে অস্থির করে তুলবে। তাই কাউকে দেখিয়ে দেখিয়ে আমি ওকে ভালোবাসতাম না। বরং ওর সঙ্গে যে আমার তেমন ভাব নেই, কানাই আর লিচুদা বেচুদার সামনে সেইরকম ভাবই দেখাতাম।

আমি ওকে লুকিয়ে লুকিয়ে ভালোবাসতাম। আমি ওকে ভয়ে ভয়ে ভালোবাসতাম।" অন্যের দ্বারা উপহাসের পাত্র হবার ভয়ে পল্টু তাই অন্যদের সঙ্গেই বেশি মিশতো আর ওদের সঙ্গে মিশে কুশলের অফুরন্ত বোকামির গল্প শুনতো। নিজে সে বোকা এই বোধটি কুশলের ছিল, আর তাই চালাক হবার লোভে সে গাঁয়ের নাপিত প্রাণনাথ শীলের পরামর্শ মতো তেঁতুলের বিচি গুড়ো করে খেয়ে ডায়রিয়ায় ভুগেছে, রসগোল্লার রস বলে লোকে তাকে গোবুর গামলার বৃষ্টির জল খাইয়েছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কুশলের পরিবর্তন হয়েছে, বোকার মতো কাজ ও কথাবার্তাও সে আর তেমন বলে না, কিন্তু বোকা নাম তার ঘোচেনি বরং লোকের চোখের চাউনি, হাসি ও তার সঙ্গে ব্যবহার থেকেই কুশল উপলব্ধি করে যে বোকা উপাধি তার ঘোচেনি। কুশলের বাবাও কুশলের বদলে তার ছোটো ভাইকেই নিজের ব্যবসার কাজ সঁপে দিয়েছেন। কুশল অভিমানী হয়েছে কিন্তু তবুও সহ্য করে নিয়েছে। কুশলের কিছু গুণাবলীও ছিল যে সব কাজে তেমন বুদ্ধি খাটাবার দরকার নেই, সে সকল কাজ কুশল খুব ভালই পাড়ত যেমন —" কারো অসুখবিসুখ হয়েছে — ডাক্তার ডাকতে হবে পাঠাও কুশলকে। পাঁচ সাত মাইল দূরে কাউকে জরুরী একটা খবর দিয়ে আসতে হবে, কুশল এক পায়ে খাড়া। পাড়ার কোন বাড়িতে পুরুষ ছেলে কেউ নেই, পাহারা দিতে হবে, কুশল কুকুরের মত সেখানে জেগে বসে থাকবে।" কিন্তু এইসব গুণ থাকা সত্ত্বেও নিজের বুদ্ধিহীনতার জন্য সে তার কোনো মূল্য পায়নি, তাই হঠাৎ একদিন সে গ্রাম থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে। এইখানে এসে গল্পটি যেন একটু কারুণ্যের স্পর্শ পেয়েছে। এরপর বছর খানেক পরে হঠাৎ লেখক শহরে যাত্রা দেখতে গিয়ে কুশলের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। যাত্রায় এখন কুশল অভিনয় করে আর অভিনয়ে তার সাফল্যের কারণও তার বুদ্ধিহীন প্রকৃতি। সে বোকার পার্টেই অভিনয় করে। বাল্যের সঙ্গীর কাছে তাই গল্পের শেষাংশে কুশল স্বীকার করে এই সত্যটিকে — "পেটের দায়ে এই চালাকিটুকু শিখেছি। আমি যতখানি বোকা তার চেয়েও বেশী বোকার পার্ট করতে পারি, আমি যতখানি ভালোমানুষ তার চেয়েও বেশী ভালোমানুষ সাজতে পারি আজকাল।" —এই ভাবে দেখা যায় নরেন্দ্রনাথ কিশোরগল্পের মধ্যেও গভীরতা আনয়ন করেন, চরিত্র বিশ্লেষণ ও শিশু কিশোরদের মনস্তত্ত্বের দিকটিও গল্পে অসাধারণ দক্ষতায় পরিস্ফুট হয়।

প্রথমেই বলা হয়েছে যে নরেন্দ্রনাথের কিশোর গল্পের অধিকাংশই তার বাল্য জীবনের কাহিনি, অনেকক্ষেত্রেই তাদের পারিবারিক ঘটনার বিবরণ, আর এই সকল গল্পে বিভিন্ন ধরণের ঘটনা ও মাত্রাগত বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে। যেমন জেঠিমার মুখে শোনা কাল্পনিক গল্প রয়েছে 'কুমির' গল্পে, ছেলেবেলার অপূর্ণ সাধের গল্প ('ঘড়ি'), শীতকালে গ্রামে আয়োজিত ঘোড়দৌড়ের কাহিনি ('কানা বসিরের ঘোড়া') গ্রামে গঞ্জে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কার ও মন্ত্রতন্ত্রের কথা('বাটি চালান'), নষ্টচন্দ্রের দিন গ্রাম বাংলায় প্রচলিত বিভিন্ন প্রথার কথা ('নষ্টচন্দ্র'), প্রথম রথের মেলা যাবার অভিজ্ঞতা, ('মোহনবাঁশি'), প্রথম বাড়ি

ছেড়ে একাকী বাইরে থাকার অভিজ্ঞতা ('প্রথম প্রবাস') প্রভৃতি বিষয়কে নরেন্দ্রনাথ রূপদান করেছেন তাঁর কিশোর গল্পগুলিতে। এই গল্পগুলি যেমন তাঁর বাল্যজীবনের অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করে তেমনি সাধারণ গল্পগুণও এদের মধ্যে পুরোমাত্রায় বর্তমান।

ছোটগল্পকার নরেন্দ্রনাথের মৃত্যুচেতনা ঃ

উপনিষদে বলা হয়েছে 'জাতস্য হিধ্রুবো মৃত্যু'। আবার "জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে" — এ কথাও চিরন্তন সত্য। কিন্তু মানুষের জীবনে নিজের মৃত্যুর কোনো স্থান থাকবার কথা নয়, কারণ মৃত্যু জীবনের পরের ঘটনা। যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণ মৃত্যুর সেখানে কোনো প্রবেশাধিকার নেই। জীবন চলে গেলেই ঘটে মৃত্যু, ফলে "আমি মরে গেছি" এই বোধ মানুষের জীবনে বৈজ্ঞানিক দিক থেকে অসম্ভব। কিন্তু মৃত্যু ও মৃত্যুচেতনা ঠিক এক জিনিস নয়, জীবৎকালেই মানুষের অন্তরে এই বোধের জাগরণ ঘটতে পারে। কেবল ঘটতে পারে নয়, অনেক ক্ষেত্রেই ঘটে। নিজের পরিচিতজনের মৃত্যু, অপরিচিতজনের মৃত্যু, আত্মীয়-পরমাত্মীয়ের মৃত্যু, নিছক অনাত্মীয়ের মৃত্যু, স্বাভাবিক মৃত্যু, রোগভোগের পর মৃত্যু, - অপঘাতের অপমৃত্যু — এই সব বিভিন্ন জনের ও বিভিন্ন ধরনের জীবনাবসানের বিষয় আমাদের মনোলোকে প্রভাব ফেলে এবং এর দ্বারা আমরা মৃত্যুর সঙ্গে যেমন পরিচিত হই তেমনি আমাদের মধ্যে মৃত্যু সম্পর্কে চেতনারও জন্ম হয়। তবে এই চেতনা সকলের কাছে সমান নয়, এমনকি একই ব্যক্তির জীবনের বিভিন্ন পর্বে এই মৃত্যু সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধি বা চেতনার সঞ্চার পৃথক পৃথক ভাবে হতে পারে। আমাদের জীবনের সৃষ্টি রহস্য যেমন জিজ্ঞাসায় পরিপূর্ণ তেমনি জীবনাবসানের পরের রহস্যও জিজ্ঞাসায় পরিপূর্ণ এবং গভীরতর উপলব্ধিতে জীবন-জিজ্ঞাসা ও মৃত্যুচেতনা একই মুদ্রার এপিঠ ও ওপিঠ বলে বোধ হতে পারে। আমাদের দৈনন্দিন কাল যাপনের সঙ্গেও মৃত্যুর একটি সম্পর্ক রয়েছে। জীবনের একটি দিন অতিবাহিত হওয়ার অর্থ মৃত্যুর দিকে একটি দিন এগিয়ে যাওয়া। এই বোধ মানুষকে সর্বদা আচ্ছন্ন করে না কিংবা জীবনযাত্রায় বাধা হয়ে দাঁড়ায় না, কিন্তু জীবন সায়াহ্নে এসে এই মৃত্যুর বোধ মানুষকে আচ্ছন্ন করতে পারে। তাছাড়া প্রগাঢ় অনুভূতিশীল মানুষ এই চেতনা বা উপলব্ধিকে অন্তরে লালন করতেই পারেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে এই মৃত্যু-চেতনা মানুষের মানসিকতা ভেদে যেমন ভিন্ন ভিন্ন তেমনি জীবনের বিভিন্ন পর্বে বা স্তরে এই উপলব্ধি জাত প্রতীতির ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সাহিত্যকেরা প্রগাঢ় অনুভূতিশীল মানুষ তাই তাদের চেতনায় এই মৃত্যু ভিন্নতর উপলব্ধির মাত্রা নিয়ে উপস্থিত হয় এবং স্বাভাবিক ভাবেই এই চেতনাও ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মৃত্যু' কবিতায় বলেছেন —

" মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর। আজি তার তরে
ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ডরে।"

অচেনা অজানা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে তিনি ভয় পাচ্ছেন, কিন্তু কবিতার শেষে দেখা যায় সেই ভয় ভেঙে গিয়ে এক সুস্পষ্ট বিশ্বাসে উপনীত হয়ে তিনি বলেন -

" ..... জীবন আমার।
এত ভালোবাসি ব'লে হয়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয়।"

এই মৃত্যুকে তিনি মুক্তি হিসাবেও দেখেছেন। এই মুক্তি একই জন্মের মধ্যে আবদ্ধ একরূপতা থেকে মুক্তি, সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি। 'উৎসর্গ' কাব্যের 'জন্ম ও মরণ' কবিতায় তাই তিনি লেখেন —

" কে চাহে সংকীর্ণ অন্ধ অমরতাকূপে,
এক ধরাতল-মাঝে শুধু এক রূপে
বাঁচিয়া থাকিতে! নব নব মৃত্যুপথে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে।"

আবার এই মৃত্যুকে তিনি দেখেছেন প্রিয়তম রূপে, সাধনার ধন রূপে। রাধার সাধনার ধন শ্যাম রূপে তিনি আলিঙ্গন করতে চেয়েছেন মৃত্যুকে। কখনও বলেছেন 'মৃত্যু-অমৃত', কখনও বলেছেন "তামবিমোচন"। তার ভাষায় —

"মরন রে।
তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান। ...
তুঁহুঁ মম মাধব, তুঁহুঁ মম দোসর,
তুঁহুঁ মম তাপ ঘুচাও।" ('ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী')

কখনও তিনি কাতর আহ্বান জানিয়েছেন মৃত্যুকে — "মরণ তু আওরে আও"

('মরণ' ঃ 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী')

এছাড়া রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনায়, বিশেষ করে তাঁর শেষ পর্বের কবিতাতেও মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর বিশেষ ভাবনাটি প্রকাশিত।

কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতাতেও বিশিষ্ট মৃত্যু চেতনার প্রকাশ আছে, যেখানে তিনি মৃত্যুর কাল — মৃত্যুর পটভূমিকে বিশেষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতায় প্রকাশ করেছেন। কখনও জন্মান্তরের মাধ্যমে মৃত্যুর পর পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। এতো গেল কবিদের কথা,

কথাসাহিত্যিকদের মধ্যেও মৃত্যুচেতনার প্রকারভেদ দেখা যায়। তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসের প্রধান অবলম্বনই মানুষের মৃত্যু জিজ্ঞাসা। এই উপন্যাস এর — "অন্তঃস্থ জীবনধারা মৃত্যুর পটভূমিতে অবস্থিত এবং মৃত্যুর নিরিখেই জীবনের তাৎপর্য বিশ্লেষিত, মৃত্যুর কাছে জীবন গৌণ কিনা — প্রশ্ন পরে বিবেচ্য।"[২৪] তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে ('আরোগ্য নিকেতন') মৃত্যুর পৌরাণিক পরিচয়ও দিয়েছেন। যেখানে ব্রহ্মার ক্রোধ থেকে মৃত্যুর দেবীর সৃষ্টি হয়েছে। মৃত্যুর পৌরাণিক পরিচয়ের মূল উৎসটি তারাশঙ্কর যে ভাবে অনুসন্ধান করেছেন গৌরমোহন রায় তাঁর 'তারাশঙ্কর সাহিত্য সমীক্ষা' গ্রন্থে তা বিশ্লেষণ করেছেন এবং তা থেকে ঔপন্যাসিকের মৃত্যু সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিটিও পরিস্কার হয়। এখানে তিনি বলেন —

" ১) জীবের বাসভূমি বিশ্বকে আবিলতামুক্ত করায় প্রয়োজনেই মৃত্যুর সৃষ্টি।

২) মৃত্যু অনিবার্য সত্য।

৩) মৃত্যু পক্ষপাতহীন ও নির্মম ও আপন নিষ্ঠুরতায় কাতর .....

৪) মৃত্যুর সহযোগী শক্তি যমরাজ ও ব্যাধিসমূহ এবং এভাবেই মৃত্যুর কাঠিন্য সরলীকৃত।

৫) আবার ব্যাধির মূলীভূত কারণ লোভ, মোহ, ক্রোধ ইত্যাদি।

৬) এগুলির অন্তরালে আছে মানব প্রকৃতির অন্তর্ভুক্তি প্রবৃত্তি অর্থাৎ জীবনের মধ্যেই মৃত্যুর অধিষ্ঠান।"[২৫] এই ভাবে একটি উপন্যাসের বর্ণনা অংশের বিশ্লেষণে তারাশঙ্করের বিশিষ্ট মৃত্যুচেতনার রূপটি প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

এইভাবে দেখা যায় প্রগাঢ় অনুভূতিপ্রবণ সাহিত্যকদের বিশিষ্ট মানসিকতা — মৃত্যু সম্পর্কে বিশিষ্ট মনোভঙ্গি তাদের রচনায় মূর্ত হয়ে ওঠে। কখনও মৃত্যুর পাদস্পর্শে মর্মভেদী আর্তনাদ জেগে ওঠে, কখনও ব্যাধি ও জরার অবসানে মৃত্যু শান্তি আনয়ন করে, কখনও মৃত্যু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কোন দার্শনিক উপলব্ধিতে আবার কখনও কোনো সম্ভাবনার অপমৃত্যুতে নৈরাশ্যের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। আবার কখনও মানুষের জীবনের মধ্যেই ছায়াপাত ঘটায় মৃত্যু, মানুষ হয়ে পরে জীবন্মৃত। এই বিভিন্ন রূপভেদকেই গল্পকারেরা প্রত্যক্ষ করেন, অন্তরে অনুভব করেন এবং নিজস্ব চেতনার বিশিষ্টতা তাঁরা সাহিত্যে প্রকাশ করেন। এখন নরেন্দ্রনাথের মৃত্যুচেতনা প্রকাশক ছোটগল্পগুলিকে আলোচনা করে তাঁর বিশিষ্ট মৃত্যুচেতনার দিকটিকে প্রকাশিত করার প্রচেষ্টা করা যেতে পারে।

নরেন্দ্রনাথের জীবনের প্রারম্ভেই একটি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল, যা তাঁর গর্ভধারিণী মায়ের। কিন্তু এই মৃত্যু তাঁকে খুব বেশি প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয় না বরং বলা যায় এই মৃত্যু তাঁকে মোটেই প্রভাবিত করেনি, কারণ তাঁর নিজের মায়ের মৃত্যুর খবর তিনি বড় হয়ে শুনেছিলেন, যেহেতু মায়ের মৃত্যুকালে তিনি নিজে ছিলেন খুবই ছোট। তাঁর পিতার দুটি বিবাহ এবং তাঁর বড় স্ত্রী জগৎমোহিনীকেই

নরেন্দ্রনাথ মা বলে জানতেন। নিজের জন্মদাত্রী মা বিরাজবালার স্মৃতি তাঁর জীবনে খুব বেশি ছিল না। জীবনে সবচেয়ে নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুশোকের বেদনা তিনি সর্বপ্রথম অনুভব করেছেন জ্যাঠতুতো দাদা বিরূপাক্ষের কন্যা লক্ষ্মীর মৃত্যুতে। ভাইঝি লক্ষ্মীর মৃত্যুতে তিনি প্রবলভাবে শোকগ্রস্ত হন। ৩১শে জুলাই, ১৯৪০ সালে লিখিত একটি চিঠিতে এর উল্লেখ আছে। ৬৬,শোভাবাজার লেনে থাকবার সময় স্ত্রী শোভনাদেবীকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি লেখেন — "লক্ষ্মীর মৃত্যুতে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি। এত নিকট আত্মীয় ও স্নেহের পাত্র জীবনে এই প্রথম হারালাম। ছেলেবেলা থেকেই ওকে খুব ভালোবাসতাম। যতদিন বাড়িতে ছিলাম, ওকে লেখাপড়া শেখাতে চেষ্টা করেছি। ও অনেকদূর পর্যন্ত পড়াশুনা করবে, কৈশোরে এ কল্পনা আমাকে খুব আনন্দ দিত। ও খুব বুদ্ধিমতী ছিল তেমন শিক্ষা ও সাহচর্য পেলে সে বুদ্ধি খুব মার্জিতও হতে পারত।"[২৬] ভাইঝির এই মৃত্যুকে নরেন্দ্রনাথ এক সম্ভাবনার অকালমৃত্যু হিসাবে দেখেছেন এবং দুঃসহ বেদনা লাভ করেছেন। এই বেদনার প্রকাশ রয়েছে চিঠির পরবর্তী অংশে, যেখানে তিনি লেখেন — "ওর মৃত্যুর কয়েক মিনিট পরে আমি গিয়ে উপস্থিত হলাম ও-বাড়িতে। প্রথমটা অনুভূতি যেন কেমন অসাড় হয়ে গেল। মনে হল, বিষয়টা আমি নির্লিপ্ত, স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করেছি। শোক যেন আমাকে তেমনভাবে স্পর্শ করতে পারেনি। বৌদিকে গতানুগতিক অনেক সান্ত্বনার কথা বললাম বহুক্ষণ ধরে। তারপর যতবার মনে হতে লাগল, ও নেই, ততবার বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠতে লাগল। সে-দুঃসহ অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অথচ অনেকদিন পর্যন্ত ওর কথা তো প্রায় ভুলেই ছিলাম। শেষের দিকে বছরে ক'বারই বা ওর কথা মনে পড়ত, আর ক'বারই বা ওর সঙ্গে দেখা হত। জীবিত অবস্থাতেই ও তো আমার অনুভূতির বাইরেই প্রায় চলে গিয়েছিল। এখন সে-কথা যখনই মনে হয়, তখনই দুঃসহ বেদনায় হৃদয় আছন্ন হয়ে যায়।"[২৭] এই চিঠির বক্তব্যেই পরিষ্কার শৈশবকালের জন্যই হোক আর জগৎমোহিনীর স্নেহের কারণেই হোক নিজের জন্মদাত্রী মায়ের মৃত্যুশোক বা বেদনা নরেন্দ্রনাথের অন্তরে জাগরুক ছিল না। জীবনে প্রথম মৃত্যুশোক তিনি অনুভব করেন ভাইঝি লক্ষ্মীর মৃত্যুতে। এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, এই মৃত্যুর আকস্মিক আঘাতকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করতে পারেননি বরং কিছুটা অসাড় নির্লিপ্ততায় গ্রহণ করেছেন এবং সেই কারণেই অন্তরঙ্গ নয় বরং 'গতানুগতিক' শোক সান্ত্বনা জানিয়েছেন বৌদি কুসুমকুমারীকে। কিন্তু পরে শান্ত-ভারসাম্য অবস্থায় এই শোককে প্রগাঢ়ভাবে অনুভব করেছেন, সন্তপ্তকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করেছেন, সামাজিক কর্তব্য পালন করেছেন প্রাত্যহিকতার চাপে, জীবনকালে যাকে ভুলেই বসতে চলেছিলেন তারই মৃত্যু এই ভুলে থাকার ভ্রমকে ভেঙ্গে দিয়েছে। শোকের সান্ত্বনায় তিনি গতানুগতিক বাণী উচ্চারণ করেছেন — এসবই বহিরঙ্গ ব্যপার। প্রকৃতপক্ষে এই মৃত্যু আঘাত করেছিল তাঁর অন্তরে, তাই জীবিত অবস্থায় যাকে ভুলে থাকতে পেরেছিলেন, তাকে মৃত্যুর পর ভুলতে পারছেন না। মৃত্যুর ভয়াবহ শূন্যতা গ্রাস করেছে লেখকের অন্তরকে।

মৃত্যুর ঘটনা ও তার অভিঘাত এবং এর পরবর্তীকালের সামাজিক কর্তব্য পালন — সবমিলিয়ে এক সামগ্রিক অনুভূতি, এসবই প্রকাশ পেয়েছে নরেন্দ্রনাথের 'বীতশোক' গল্পে। গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল ২৮শে আষাঢ়, ১৩৮১ বঙ্গাব্দে 'দেশ' পত্রিকায়। বীত শব্দের অর্থ অতীত, বিগত বা অপগত। আর বীতশোক শব্দের অর্থ শোকমুক্ত। এই গল্পে কলেজের শিক্ষক অনিমেষ গিয়েছেন তাঁর বাল্যবন্ধু শীতাংশুর মৃত্যু সংবাদ শুনে তাঁর বৃদ্ধ পিতা শৈলেশ্বর ও সদ্যবিধবা স্ত্রী সুনন্দাকে সান্ত্বনা দিতে। মৃত্যুর পর দুমাস কেটে যাবার কারণেই হোক বা বার্দ্ধক্যজনিত কারণে সংসারের অনিত্যতা সম্পর্কে উপলব্ধির ফলেই হোক অথবা গীতা উপনিষদের সর্বসন্তাপ দূরকারী বাণী সমূহের প্রভাবেই হোক, বৃদ্ধ শৈলেশ্বর পুত্রের মৃত্যুতে সংযত শোকবেদনা প্রকাশ করেছেন। অপরদিকে শীতাংশুর স্ত্রী সুনন্দার মধ্যেও শোকের তীব্রতা বা প্রাবল্য দেখতে পাননি অনিমেষ। বরং অসুস্থ শীতাংশুর মৃত্যুকে শীতাংশুর রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ বলেই স্ত্রী সুনন্দা মনে করেছেন। সুনন্দা বলেছেন — "দু মাসও নয়, আরও অনেক আগে থেকেই বলতে গেলে তিনি ছিলেন না। যে ভাবে ছিলেন তাকে থাকা বলে না। তিনি বেঁচে গেছেন।" পিতা শৈলেশ্বরও আরও দুজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদের সঙ্গে একযোগে নিজের পুত্রের মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করেছেন।এই মৃত্যু সংবাদ ঘোষণার সময় তাঁর চোখও অশ্রুসজল হয়ে উঠে নি, গলার স্বরও কেঁপে ওঠে নি — "মাস দেড়েক আগে আমার একটি ভাই মারা গেছে। সে অবশ্য আলাদা বাড়িতে থাকত।তবু তো ভাই। তারপর সে দিন গেলেন আমার একজন বন্ধু,অন্তরঙ্গ বন্ধু। তারও আগে গেছে ছেলে। শীতু তো তোমার বন্ধু ছিল অনিমেষ। সে আর নেই।" মৃত্যু সংবাদ ঘোষণার এই অশ্রুহীন নিরাসক্ত স্বপ্নভাষা অনিমেষকে অবাক করেছে। তিনি এসেছিলেন শোক সন্তপ্ত বৃদ্ধ পিতাকে পুত্রশোকে সান্ত্বনা দিতে, স্বামীহারা স্ত্রীকে সদ্য বৈধব্যের যন্ত্রণায় উপশমের মলম লাগাতে , কিন্তু তাঁর সে উদ্দেশ্য সফল হয় নি। চিরদিন কোনো স্মৃতিকেই মানুষ বহন করতে পারে না, চরম শোককেও পারে না। যতই সেই শোক কোনো একটি মুহূর্তে হৃদয়বিদারক বলে মনে হোক না কেন। বাড়ি ফিরবার সময় অনিমেষের মনে হয়েছে তিনি শোকে সান্ত্বনা জানাতে এসেছিলেন বটে কিন্তু তার প্রকাশ তো সেখানে দেখা যায় নি। কারণ — "শোকেরও তো একটা অনুষঙ্গ চাই।" তাই অনিমেষ দেখেছেন পুত্রহারা পিতা রোগী দেখায় ব্যস্ত থাকছেন,স্বামী হারা সদ্য বিধবা স্ত্রী অম্লান বদনে অতিথি সৎকার করেছেন — হাস্যমুখে সাধারণভাবে কথা বলেছেন — পতির মৃত্যু শোকে নিস্পৃহতা দেখিয়েছেন। এরজন্য একদিকে অনিমেষের হয়তো সুবিধেই হয়েছে, কারণ — "শোকে তিনি সান্ত্বনা দিতে অক্ষম। শোকের পরিবেশে নিজেকে কেমন যেন বিমূঢ় মনে হয় অনিমেষের। কিংকর্তব্যবিমূঢ় । এসব ক্ষেত্রে গতানুগতিক কথাই তো লোকে বলে। কিন্তু সেই বাঁধাঁ ধরা কথাগুলিও অনিমেষের মুখ থেকে বেরোতে চায় না। নিজেরই কেমন যে অস্বস্তি লাগে। তাই তিনি যথাসম্ভব এই সব অনুষ্ঠানিকতা এড়িয়ে চলেন।" এখানে অনিমেষকে শোকের আনুষ্ঠানিকতা

থেকে নিজেকে জোর করে সরাতে হয় নি বরং তাঁর থেকেই শোক প্রকাশের আনুষ্ঠানিকতা দূরে সরে গেছে।কোনো গতানুগতিক সান্ত্বনার বাণীও তাকে উচ্চারণ করতে হয় নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নরেন্দ্রনাথও ভাইঝি লক্ষ্মীর মৃত্যুতে গতানুগতিক সান্ত্বনার বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, কিন্তু শোক অনুভব করেছিলেন অন্তরে। তেমনি অনিমেষও শীতাংশুর শোককে নিভৃত অন্তরে অনুভব করতে চেয়েছেন।প্রবল শোকাবেগের উদয় হয়েছে কিন্তু অচিরেই তা সয়ে গেছে। শোকের অভাবে নিজের অনুভূতিশূন্য মনের পরিচয় পেয়েছেন অনিমেষ, নিজেকে তাঁর অংশত মৃত বলে মনে হয়েছে। অদর্শন জনিত দূরত্বের কারণে, আধুনিক নগর সভ্যতার ইঁদুর দৌড়ের কারণে আমাদের মনে হয়তো স্মৃতি থাকে, কিন্তু স্মৃতিমেদুরতা থাকে না; সম্পর্ক থাকে, কিন্তু সম্পর্কের উষ্ণতা থাকে না।এই হৃদয়হীনতা, উপলব্ধি -অনুভূতিহীনতায় অনিমেষ কষ্ট পেয়েছেন। শীতাংশুর জন্য তার আপসোস হয়েছে কিন্তু তিনি শোকার্ত হননি। অনুতপ্ত অনিমেষ তাই নিজের অন্তরে চেয়েছেন — "একটি নীরব নিভৃত শোকসভার আয়োজন হোক।" কিন্তু এই নিভৃত শোকসভার জন্য যে আবেগের প্রয়োজন, সেই আবেগ সঞ্চারও তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। সেই ক্ষণিকের আবেগও তার পক্ষে সহজলভ্য হয়নি। শেষ বিচারে অনিমেষের মনে হয়েছে কেবল দৈহিক মৃত্যুই একমাত্র মৃত্যু নয়,মন, মানসিকতা ও স্মৃতির মৃত্যুও মৃত্যু, যে মৃত্যুকে সাদা চোখে ধরা যায় না, কেবল অনুভূতির স্তরেই যার প্রকাশ ঘটে। মৃত্যু জীবনের পরিসমাপ্তি, কিন্তু স্মৃতির মৃত্যু কেবল একজনের নয়, দুই ব্যক্তির মৃত্যু, যে স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়েছে তার ,আর যার স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়েছে তার। দুই মৃত ব্যক্তিই এই রকম ক্ষেত্রে শোকবিবিক্ত থেকে যায়। অনিমেষের উপলব্ধি হয়েছে — "শুধু শীতাংশু কেন আরো অনেকের ক্ষেত্রেই তিনি মৃত, তারাও জীবিত নয়। তিনিও শোকরহিত, তারাও শোকরহিত।" অনুভূতি - উপলব্ধির মৃত্যুতে তারও মৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু এই শবদেহ অসনাক্ত আর এই মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশের কেউ নেই এমনকি স্বয়ং মৃত ব্যক্তিও এজন্য শোক প্রকাশের অবকাশ বা সুযোগ কোনোটাই পায় না।

মৃত্যু কেবল নিছক মানব জীবনের সমাপতন নয়। মৃত্যুর পর ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে মানুষের স্বর্গ বা নরক লাভ করার একটি কল্পনাও জড়িত আছে । কিন্তু জীবিত মানুষের কাছে মৃত ব্যক্তি সকল ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতার অতীত। আমাদের দৈনন্দিন আলাপচারিতায় বা চলিত লেখায় আমরা মৃত্যুকে স্বর্গারোহণ বলেই মনে করি এবং উল্লেখ করি। ধর্মীয় বিধানে বা গ্রন্থে স্বর্গ বা নরকের প্রাপ্তি সম্পর্কিত বিষয় থাকলেও আমাদের চেতনায় নরক স্থান মৃত ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত হয় না। মৃত ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতা-হীনতা-দীনতার বশবর্তী হতে পারে কিন্তু মৃত্যুর পর সে সকল পার্থিব দৈন্যের উপর স্থান পায়। এই চেতনার প্রকাশ ঘটেছে 'মৃত্যু' গল্পে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে নরেন্দ্রনাথের মৃত্যু বা শোক নির্ভর গল্পগুলিতে 'interior monologue' বা অর্ন্তমুখি আত্মকথনের একটি ভূমিকা রয়েছে। একটি মৃত্যুকে

কেন্দ্র করে কোনো ব্যক্তির সজাগ মনের অবিচ্ছিন্ন চিন্তা প্রবাহে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ধরনের গল্প গড়ে উঠেছে। এই অন্তর্মুখি আত্মকথনের মধ্য দিয়ে কথকের মানসিক অবস্থা তথা মানসিকতাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করাই লেখকের মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনে ঘটনাধারার স্বল্প বর্ণনা কিন্তু এই ঘটনার অভিঘাতে মানবমনের চিন্তার প্রবাহের বিস্তারকে বর্ণনা করে লেখক তাঁর মৃত্যু সম্পর্কিত ভাবনাকেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

'মৃত্যু' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৭২ এর পূজা সংখ্যা 'বেতার জগৎ' - এ । গল্পের কাহিনি অংশে দেখা যায় প্রণবেশের বৃদ্ধ কাকার মৃত্যু সংবাদ প্রণবেশ প্রথম পায় টেলিফোনে। এই মৃত্যু সংবাদ তাঁকে বিচলিত করেছে বলে প্রণবেশ স্বীকার করেননি। কাকার মৃতদেহকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে যাবার সময়ও তিনি শোকগ্রস্ত হননি। লেখক প্রণবেশের মানসিকতাকে ব্যক্ত করেছেন এই ভাবে — "কাকার মৃত্যু সংবাদে এমন বিহ্বল হননি প্রণবেশ যে জামার বোতাম লাগাবার কথা তাঁর মনে থাকবে না — হাঁটতে গিয়ে প্রতি পদে হোঁচট খাবেন কি বাসের হ্যান্ডেল ধরতে গিয়ে তা খুঁজে পাবেন না। প্রৌঢ় বয়সে, বৃদ্ধ কাকার মৃত্যুতে অতখানি শোকবিহ্বল কেউ হয় না। বিশেষ করে দীর্ঘকালের অদর্শনে আদান-প্রদানের অভাবে আবেগের সম্পর্ক যেখানে বহুকাল আগে থেকেই ক্ষীণ হয়ে আসে সেখানে জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর সান্ত্বনা শোকের সঙ্গে সঙ্গেই এসে পড়ে।" প্রণবেশ হাসপাতালে যাচ্ছেন মৃত কাকার শবদেহকে সৎকারের প্রস্তুতিতে সহায়তা করতে, কিন্তু এই মৃত্যুদীর্ণ দিনেও বাসে উঠে তার পছন্দমত বাসের সবচেয়ে অগ্রবর্তী আসনটিই তিনি দখল করেছেন। অন্যান্য দিনের সঙ্গে এই দিনের কোনো পরিবর্তন বা পার্থক্য আছে বলে প্রণবেশের বহিরঙ্গ আচরণে অনুভূত হয় নি, তিনি নিজেও অন্তরে কোনও পরিবর্তন অনুভব করেননি। বৃদ্ধ কাকার মৃত্যুতে প্রণবেশ শোক বিহ্বল হয়ে পরেননি তবে মাত্র তিন দিন আগে মৃত্যু পথযাত্রী কাকাকে দেখতে গিয়ে কাকাকে তিনি তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করেছিলেন বলে অনুতাপ করেছেন। কিন্তু সেই অনুতাপও প্রবল হয়ে উঠেনি বরং গত কয়েকদিনের মতো এদিনও তিনি এ বিষয়ে নিজের কৃতকর্মের পক্ষে যুক্তি সাজিয়েছেন।তার কাকা শ্রীবিলাস রায় পূর্ববঙ্গে ফেলে আসা তাদের নিজের সহায়-সম্পত্তি, ভিটে-মাটিকে বিক্রয় করে দিয়েছেন। যদিও সেই ভিটে মাটির অধিকারকে প্রণবেশ সযত্নে রক্ষা করেন নি। সম্পত্তি রক্ষা করতে যেমন উদাসীন থেকেছেন তিনি তেমনই তা বৃদ্ধিও করেন নি। তবু প্রণবেশের ভাবতে কষ্ট হয়েছে, যে তার ঐ শৈশবের বাসগৃহ, বিচরণক্ষেত্র ,ঘরদোর, গাছপালা ক্ষেত খামার, বাবার কষ্টার্জিত সম্পত্তি আর নেই। এই দুঃখবোধ থেকেই মৃত্যুপথযাত্রী কাকাকে তিনি ভর্ৎসনা করেছেন, নিজের অন্তর্দাহকে উজার করে দিয়েছেন হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে থাকা বৃদ্ধের উপর। যতদিন বা যতক্ষণ বৃদ্ধ জীবিত ছিলেন ততক্ষন প্রণবেশ ভেবেছে, তার কাজ সঠিক, কেবল অন্যায়ের প্রতিবাদ করবার স্থানটি তিনি যথোচিত নির্বাচন করেন নি। প্রণবেশ ভেবেছেন — "কিসে কোথায় তাঁর অন্যায় হয়েছে? নিজের প্রাপ্য

সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়েও তিনি কোন প্রতিবাদ করবেন না ? প্রতিবাদ না করলেই বরং অন্যায় হ'ত কিন্তু ঠিক উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত স্থানে তিনি যথোচিত কাজ করেন নি, যথোচিত কথা বলেননি। ফলে তাঁর উচিত কথাও গর্হিত হয়ে উঠেছে।" কিন্তু এই দৈনন্দিন চাওয়া-পাওয়া, লাভ- ক্ষতির হিসেব সব গণ্ডগোল হয়ে গেছে কাকার মৃতদেহের সামনে এসে।একদা প্রবল প্রতাপান্বিত মানুষটির মৃত দেহকে বড় করুণ ও অসহায় বলে মনে হয়েছে প্রণবেশের। বয়সকালের তেজ-দীপ্তি প্রাণ বিয়োগের বহু আগেই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জীর্ণ দেহাধার থেকে বিদায় নিয়েছিল। তবু সেই মানুষটির মৃত মুখকে বড়ই বিষণ্ন ও কারুণ্যে পরিপূর্ণ বলে বোধ হয়েছে প্রণবেশের। 'বীতশোক' গল্পে লেখক একটি আপ্ত বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন যে, শোকেরও অনুষঙ্গ দরকার। এখানে কাকার মৃতদেহই সেই অনুষঙ্গকে বহন করে এনেছে। অন্তরে শোকের উদয় হয়েছে কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ দেখা যায় নি। প্রণবেশের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে কিন্তু চোখে অশ্রুবিন্দুর উদয় হয় নি। নিজের মনে হয়েছে হৃদয় তার মরুভূমি, তাই চোখে তার অশ্রুবিন্দুও দুর্লভ হয়ে উঠেছে। প্রণবেশের কেবলই মনে হয়েছে, তিনি মৃত্যু -পথযাত্রী কাকার সঙ্গে শেষ সাক্ষাতে যথোচিত ব্যবহার করেননি — "শেষ সাক্ষাতে কাকাকে তিনি শ্রদ্ধা দেখাতে পারেননি, ভক্তিতে অবনত হতে পারেননি নি। তাঁর রোগশয্যায়, সান্ত্বনায় আশ্বাসে একটি মধুর প্রীতিকর কথাও উচ্চারণ করেন নি, শুধু বঞ্চিত প্রতারিত হৃত সম্পদ অংশীদারের বিদ্বেষ বহ্নিতে তাঁকে জ্বালিয়েছেন , নিজে জ্বলেছেন। সেই অগ্নি জ্বালা এখন তার শোধ নিচ্ছে। এক বিন্দু হৃদয়রস এক ফোঁটা করুণা এক কণা অশ্রুও তাঁর জন্য অবশিষ্ট রাখেনি।" তবে চোখে জল না আসলেও প্রণবেশের অন্তর পরিবর্তিত হয়েছে, মানসিকতার রূপান্তর হয়েছে। জীবিত অবস্থায় কাকার ত্রুটিকে তিনি ক্ষমা করতে পারেন নি, কিন্তু কাকার মৃতদেহ দেখে তাঁর মনে হয়েছে, কেবল ত্রুটি বা দোষের বিচারেই মানুষকে বিচার করা যায় না।দোষ গুণ নিয়েই মানুষ পরিপূর্ণতা পায়।লেখকের বিশ্লেষণ এই রকম — "মানুষ কোন একটি দোষের সঙ্গে অভিন্ন নয়, গুণের সঙ্গেও অভিন্ন নয়, একই মানুষ দোষে-গুণে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি।তবু আমরা দোষকে ক্ষমা করিনে, গুণকে গ্রহণ করি।" কিন্তু প্রণবেশ এই উপলব্ধির দ্বারা প্রথমে পরিচালিত হন নি, তাই কেবলমাত্র কাকার ত্রুটিগুলিকেই বড় করে দেখেছেন এবং তার ফলে মৃত্যুপথগামী মানুষটিকে অন্তরে আঘাত করতেও দ্বিধা করেন নি। কাকার মৃত্যুর পর তিনি কেবল তিক্ততার স্মৃতি নয়, কাকার বাৎসল্যের স্মৃতিও রোমন্থন করেছেন। স্মরণ করেছেন কাকার পছন্দমতো জামা কিনে দেবার কথা, জেলা শহরে প্রথম কলেজে থাকবার সময় প্রথমদিন কাকার স্নেহস্পর্শ ও ব্যবস্থাপনার কথা। শিশু বয়সে কাকার কাঁধে চড়ার স্মৃতি যখন প্রণবেশের স্মৃতি পথে উদিত হয়েছে তখন আর তাঁর চোখে অশ্রুর অভাব হয় নি বরং নিজের অজান্তেই তিনি শিশুর মত কেঁদে উঠেছেন। এই স্বতোৎসারিত শোকাবেগে ও অশ্রুজলে যেন তাঁর পূর্বকৃত অন্যায় ধুয়ে গেছে। ভাইপো এসে তাঁকে সচেতন করে দিয়ে শবদেহ বহন করা থেকে

তাঁকে ক্ষান্ত করেছে। বলেছে — "তুমি পারবেনা জ্যেঠামণি।তুমি ছেড়ে দাও। অমন করে ছেলেমানুষের মত সারাটা পথ কাঁদতে কাঁদতে এলে কি হাঁটা যায়?" এইভাবে দেখা যায় মৃত্যু এমন একটা ঘটনা যেখানে মানুষ এক পরম সত্যের সামনে এসে উপনীত হয় — যেখানে মানুষের দোষ ত্রুটি সব সমান হয়ে যায়। পার্থিব দেনা-পাওনা, লাভ-ক্ষতির হিসাব সেখানে স্তব্ধ হয়ে যায়। মানুষের হীনতা নীচতা পালাবার পথ খোঁজে। যে অমৃতধামের উদ্দেশ্যে মানব মৃত্যুর পর যাত্রা করে সেখানে মলিনতা নেই, মর্ত্য লোকেই সেই মলিনতাকে মানুষ ত্যাগ করে যায়।

নরেন্দ্রনাথ নিজে হয়তো স্বর্গ নরকের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। 'উন্মোচন' গল্পের কথক তথা রিলায়েবল ন্যারেটরের বর্ণনায় মৃত্যু সম্পর্কে লেখকের ভাবনাই হয়তো প্রকাশিত হয়েছে — "মৃত্যু পরে কোন অস্তিত্বে আমার বিশ্বাস নেই। সবাই যেমন একমুঠো ছাই হয়ে যায় আমিও তেমন একমুঠো ছাই হয়ে যাব। তার কমও না, তার বেশিও না। মৃত্যুর পর কী হবে তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। "

প্রেম, রাজনীতি, সংগ্রাম, স্মৃতি এগুলি সমগ্র জীবনের সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। সুতরাং এ সম্পর্কিত বোধই একজন সাহিত্যিকের জীবনচেতনাকে গড়ে তোলে। সেই জীবনবীক্ষাই প্রতিফলিত হয় লেখকের প্রিয় সংরূপে — কখনো উপন্যাসে, কখনো নাটকে, কখনো কবিতায়, কখনো বা ছোটগল্পে। প্রায় ষাট বছরের জীবৎকালে নরেন্দ্রনাথ দেখেছিলেন অনেক কিছুই, তিনি অনুভব করেছিলেন আরও বেশি। সেই উপলব্ধি, সেই অনুভবের জগৎই তাঁর ছোটগল্পের বিশ্বটি গড়ে তুলেছে। এই অধ্যায়ে তাঁর গল্পের ভুবনে কেমনভাবে তাঁর স্বকীয় জীবনবীক্ষাটি প্রকাশিত হয়েছে তা ই আলোচনার চেষ্টা করা হল।

-ঃঃ উল্লেখপঞ্জি ঃঃ-

১. কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ঃ 'নরেন্দ্রনাথ মিত্র, অনুষঙ্গিক ভাবনা', মাসিক বাংলাদেশ, ৪র্থ বর্ষ, সংখ্যা ৯ম, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৪০৩.

২. মঞ্জুরী চৌধুরী ঃ 'ছোটগল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্র', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৬, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ২১

৩. দিব্যেন্দু পালিত ঃ 'দেহমনের বৈতালিক', 'দেশ' সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৮২, পৃষ্ঠা - ২৭০

৪. সরোজমোহন মিত্র ঃ 'বাংলায় গল্প ও ছোট গল্প', তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তুলসী প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা - ২৫৭.

৫. ইরাবানু বসুরায় ঃ 'নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্প', 'ভাঙ্গা কাঁচের শিল্প' সম্পাদক - অর্জুন রায়, পৃষ্ঠা - ১৩৩

৬.সরোজমোহন মিত্র ঃ 'বাংলায় গল্প ও ছোট গল্প', তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তুলসী প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা - ২৫৭.

৭. বীরেন্দ্র দত্ত ঃ 'বাংলা ছোট গল্প ঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ' (দ্বিতীয় খণ্ড), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ, ২০০৪, পৃষ্ঠা - ১৮৮.

৮. নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'গল্প লেখার গল্প', 'গল্পমালা - ১', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা - ১৯.

৯. 'প্রণয় পত্রাবলী', শারদীয়া, দেশ, ১৪০৩, পৃষ্ঠা - ৪১১.

১০. মঞ্জুরী চৌধুরী ঃ 'ছোটগল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্র', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৬, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ১২৭.

১১. তদেব, পৃষ্ঠা - ১২৭.

১২. 'প্রণয় পত্রাবলী', শারদীয়া, দেশ, ১৪০৩, পৃষ্ঠা - ৪২৬.

১৩. তদেব, পৃষ্ঠা - ৪২৬.

১৪. মঞ্জুরী চৌধুরী ঃ 'ছোটগল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্র', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৬, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ১২৭.

১৫. 'প্রণয় পত্রাবলী', শারদীয়া, দেশ, ১৪০৩, পৃষ্ঠা ৪১৩.

১৬. তদেব, পৃষ্ঠা - ৪২৮.

১৭. তদেব, পৃষ্ঠা - ৪২৮.

১৮. তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৩৫.

১৯. বীরেন্দ্র দত্ত ঃ 'বাংলা ছোটগল্প ঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ' (দ্বিতীয় খণ্ড), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ, ২০০৪, পৃষ্ঠা - ২৬৪.

২০. 'ধ্বনি' পত্রিকার সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সাক্ষাৎকার, ১৯৬৮ সাল,

২১. অভিজিৎ মিত্র ঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'কিশোর গল্প সমগ্র' এর 'নিবেদন' অংশ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ ১৪০৮, পৃষ্ঠা - ৫.

২২. ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'আমাদের কথা', 'প্রসঙ্গ ঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র', সম্পাদনা- সমীর বসু, পদক্ষেপ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০০১, পৃষ্ঠা - ৭.

২৩. তদেব, পৃষ্ঠা - ৭.

২৪. গৌরমোহন রায় ঃ 'তারাশঙ্কর সাহিত্য সমীক্ষা', সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা - ১৫৮.

২৫. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫৯.

২৬. 'প্রণয় পত্রাবলী', শারদীয়া, দেশ, ১৪০৩, পৃষ্ঠা - ৪২৩.

২৭. তদেব, পৃষ্ঠা - ৪২৩.

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্প থেকে যে সকল পংক্তি উদ্ধার করা হয়েছে সে সকল অভিজিৎ মিত্র সম্পাদিত ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পমালা ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কিশোর গল্প সমগ্র থেকে গৃহিত।

।। চতুর্থ অধ্যায় ।।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পের শিল্পরূপ

গল্পের আয়তন ঃ

ছোটগল্প হল 'Peculiar Product of nineteenth century'[১]।এই 'Peculiar Product' এর প্রযুক্তিগত একটি অন্যতম বিশিষ্টতা হলো এর আয়তন। আয়তনের স্বল্পতা ছোটগল্পকে 'ছোট' গল্প করেছে। "A short story must contain one and only one informing idea ....."[২] উইলিয়াম হেনরি হাডসন প্রদত্ত ছোটগল্পের এই সংজ্ঞার এই একটি, কেবল একটি 'informing idea'-কে প্রকাশ করবার জন্যই এই সংরূপটি তার আয়তনগত ব্যাপ্তিকে অস্বীকার করে। যে গল্পকে নিতান্তই ছোটগল্প বলে তেমন খুব স্বল্প পরিসরে সমাপ্ত গল্প যেমন নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনা করেছেন তেমনি বেশ কিছু বড় আকারের গল্পও তাঁর গল্পভাণ্ডারের শোভা বৃদ্ধি করেছে। খুব ছোটো পরিসরে রচিত গল্প গুলির মধ্যে 'টিকেট'(৩পাতা), 'পুরুষ'(৪পাতা), 'মালী' (১১/৪/সোওয়া ১পাতা), 'কাঁটা'(২পাতা) প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। অপরদিকে বেশ বড় আয়তনের গল্পও তিনি লিখেছেন তবে সেগুলি বড় আকারের গল্প হলেও ছোটগল্প হিসেবেই সার্থক হয়ে উঠেছে। 'অসবর্ণা' (২৮পাতা), 'বিলম্বিত লয়' (২৯পাতা), 'তৃষ্ণা' (৩৯পাতা) , 'মাধবী মঞ্জুরী' (৩৯পাতা) — এই ছোট গল্প গুলি বেশ বড় মাপের এবং তা তাদের পৃষ্ঠা সংখ্যা থেকেই সহজে অনুমান করা যায়। তবে তাঁর অধিকাংশ গল্পই গড়পড়তা মাঝারি মাপের; যেমন 'যৌথ' (৭পাতা), 'মহাশ্বেতা'(৫পাতা), 'নেতা'(৫পাতা), আবার এদের থেকে আর একটু বড় মাপের গল্প — 'কাঠগোলাপ' (১৩পাতা), 'রস' (১২পাতা), 'পালঙ্ক' (১৭পাতা) প্রভৃতি গল্প। 'অসবর্ণা', 'বিলম্বিত লয়' এবং 'তৃষ্ণা'-এর মত গল্পগুলি তাদের আকারের ব্যাপ্তির কারণে এবং দীর্ঘকালীন সময়কে ধরবার জন্য অনেকক্ষেত্রেই ছোটগল্পের ছোট হবার শর্তকে পরিপূরিত করেনি, তবে সব ক্ষেত্রেই গল্পের একমুখীনতা বজায় রয়েছে। ঘটনার ঘনঘটা কোনো কোনো ক্ষেত্রে গল্পের গতি শ্লথ করে তুললেও পাঠকের আগ্রহকে তা কম হতে দেয় না। ছোট আকারের গল্প নরেন্দ্রনাথ অনেক লিখলেও বনফুলের মত অনুগল্প তিনি খুব বেশি রচনা করেননি, তবে 'বন্ধু'(বৈশাখ,১৩৭১) গল্পটিকে অনুগল্পের মর্যাদা দেওয়া যায়। নিতান্ত ক্ষুদ্রাকৃতি গল্প তিনি বহু লিখেছেন, যেমন উল্লিখিত 'মালী' গল্পটি। 'মালী' গল্পটির আয়তন এক পাতার কিছু অধিক।

এখন দেখা যাক নরেন্দ্রনাথের তথাকথিত বড় গল্পগুলি তাদের আয়তনের দীর্ঘতার জন্য ছোটগল্পের শর্ত বা বৈশিষ্ট্যকে ভঙ্গ করেছে কিনা। এডগার অ্যালান পো (Edgar Alen Poe) ছোটগল্পকারদের উদ্দেশ্যে লেখেন — "Short story writers should always bear in mind, while writing a short story, that they must not use a single word in their writing, which is irrelevent form their main topic, they must aim at writing what is

within their own preview and not otherwise"[৩] অপর দিকে W.H. Hudson তাঁর 'An Introduction to the study of Literature' গ্রন্থে ছোটগল্প সম্পর্কে বলেন — "Singleness of aim and singleness of effect are therefore the two great cannos by which we have to try the value of a short story as a piece of art"[৪]। অতএব একথা বলা যায় প্রতীতিজাত সমগ্রতা, একক উদ্দেশ্য ও একক পরিণাম ছোট গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং ছোটগল্পে এমন কোনো শব্দ ব্যবহৃত হবে না, যা গল্পের সঙ্গে সম্পর্কহীন। এই প্রেক্ষিতে দেখা যায় নরেন্দ্রনাথ বড় আকারের গল্প লিখলেও তা কখনো ছোটগল্পের 'ছোটগল্প' হয়ে ওঠার শর্তকে ভঙ্গ করেনি। এই প্রসঙ্গে 'বিলম্বিত লয়' গল্পটিকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

১৩৫৯ বঙ্গাব্দের 'দেশ' পত্রিকার পূজা সংখ্যায় 'বিলম্বিত লয়' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়। নরেন্দ্রনাথের 'গল্পমালা'র তৃতীয় খণ্ডে দীর্ঘ ২৯ পাতা জুড়ে গল্পটি বিধৃত। গল্পটির আয়তন দীর্ঘ হবার অন্যতম কারণ গল্পের বিষয় ছড়িয়ে আছে একটি বিস্তৃত সময় সীমা জুড়ে। গল্পের মধ্যে ঘটনার ঘনঘটা না থাকলেও টুকরো টুকরো বেশ কিছু ঘটনা রয়েছে কিন্তু গল্পে চরিত্র বাহুল্য বিন্দুমাত্র নেই। গল্পের প্রধান চরিত্র মাত্র দুজন, মৃগাঙ্ক ও অদিতি, মূল পার্শ্বচরিত্র দুজন এডিথ ও মিঃ সেহানবীশ। মোট ১৫টি পরিচ্ছেদে গল্পটি বর্ণিত। এই পনেরোটি পরিচ্ছেদের মধ্যে শেষ পরিচ্ছেদটি মাত্র দুটি পংক্তির, যেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে গল্প কথক গল্প সমাপ্ত করেছেন। আর প্রথম অনুচ্ছেদটি প্রায় গল্পের ভূমিকার মত, যেখানে গল্প লেখক গল্প কথকের সঙ্গে মূল ঘটনাধারার মধ্যে প্রবেশ করেছেন। এই দুটি পরিচ্ছেদ ব্যতীত বাকী ১৩টি অনুচ্ছেদে গল্প এগিয়ে গেছে সমান গতিময়তায়। এর মধ্যে কোথাও বর্ণনার বাহুল্য নেই, এমনকি অনেক সময় কাহিনি বর্ণিত হয়েছে কেবল প্রয়োজনীয় টুকরো টুকরো ছবি রচনার দ্বারা। 'বিলম্বিত লয়' গল্পটির দীর্ঘ আয়তনের আরেকটি কারণ গল্পটিতে Stair Step প্লটের ব্যবহার। গল্প ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছে। গল্পের কাহিনি অংশ সংক্ষেপে এই রকম — দুই শিল্পি মানুষের প্রেমজ বিবাহ, শিল্পি সত্তার সংঘাত, তাদের বিচ্ছেদ, উভয়েরই পৃথক সম্পর্ক তৈরি, উভয়েরই অবৈধ সন্তানের জন্মদান এবং পুনরায় তাদের মিলন। এই মিলন, সংঘাত ও পুনর্মিলনের মাঝে ঘটনাধারা হয়তো জটিলতা লাভ করেছে, কিন্তু মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়নি। তাই দেখা যায় গল্পের অন্যতম পার্শ্বচরিত্র মিস্টার সেহানবীশের প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রদানে মোট চার পাঁচটি পংক্তিও লেখক ব্যয় করেননি। অপরদিকে গল্পের প্রথমেই লেখক যখন গল্প কথকের সঙ্গে গিয়ে মৃগাঙ্ক ও অদিতির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন তখন প্রথম দর্শনে এই দুটি চরিত্রকে লেখকের কেমন লেগেছে তার বিবরণ, বিশেষত বাহ্যিক দর্শনের বিবরণও দেওয়া হয়েছে। কেবল তাদেরই নয় তাদের দুই সন্তানের বাহ্যিক দর্শনের বিবরণও দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে হতেই পারে ছোটগল্পে প্রতিটি চরিত্রের এমন চেহারার বর্ণনা দেবার প্রয়োজন কী, যখন ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় সমালোচক বলেছেন যে, ছোটগল্পকার — "must

not use a single word in their writing, which is irrelevent from their main topic." (Edger Alen Poe) কিন্তু যখনই মৃগাঙ্ক ও অদিতির চেহারার সঙ্গে তাদের সন্তানদের চেহারার বৈসাদৃশ্য আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয় তখনই এর কারণ সম্পর্কে আমাদের মনে কৌতূহল সৃষ্টি হয় এবং এই আগ্রহ গল্পের climax বা শীর্ষবিন্দু পর্যন্ত বজায় থাকে। লেখক প্রথমে অদিতিদেবীর বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাবে — "ছোট্ট একটি একতলা বাড়ির সামনে এসে কড়া নাড়তেই একটি মহিলা এসে দোর খুলে দিলেন। ফর্সা ছিপছিপে চেহারায় তাঁকে বেশ সুন্দরীই মনে হল। তবে তেমন স্বাস্থ্যবতী নন। বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হবে বলে মনে হল। পরনে শাদা খোলের কালো পেড়ে মিলের শাড়ি। তবে পাড়টা চওড়া, জমিটা মিহি। হাতে দু'গাছি চুড়ি আর গলায় সরু এক চিলতে হার ছাড়া দেহে অন্য কোন আভরণ নেই। সমস্ত চেহারায় বেশে-বাসে রুচিসম্মত পরিচ্ছন্নতাটুকু আমার বেশ ভালো লাগে।" এর পরবর্তী অংশে তাদের বসবাসের ঘরটির বর্ণনা আছে, আর তারপরে আছে গল্পের নায়ক মৃগাঙ্কের বর্ণনা — "বছর চল্লিশ বিয়াল্লিশ হবে বয়স। রঙটা শ্যাম। মাথায় ঘন কোঁকড়ানো চুল। দোহারা গড়ন। চেহারায় তেমন কোন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ল না।" অতএব দেখা যায় যে চরিত্রকেই লেখক সামনে আনছেন তার দৈহিক বর্ণনা দিচ্ছেন। এই বিষয়টি ছোটগল্পের পক্ষে একটু বিসদৃশ বলে মনে হতেই পারে কিন্তু এরপর যখন মৃগাঙ্ক ও অদিতির ছেলে মেয়েদের বর্ণনা আছে তখন সেই বর্ণনা থেকেই আমাদের মনে একটি প্রশ্নের উদয় হয়। পিতা মাতার সঙ্গে সন্তানদের দৈহিক বিরাট বৈসাদৃশ্য পরিবারটির অস্বাভাবিকতা সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে আর এই আগ্রহ থেকেই গল্পের সূচনা। মৃগাঙ্ক ও অদিতির পুত্র ও কন্যার বর্ণনা গল্পে দেওয়া হয়েছে এই ভাবে — "আমি ছেলে মেয়েদের দেখতে লাগলাম। আশ্চর্য, ভাইবোনের চেহারায় গায়ের রঙে মুখ চোখের ধরনে একটুও যেন মিল নেই, অদিতি দেবী তো অত ফর্সা, কিন্তু মেয়েটির রঙ খুব কালো। মৃগাঙ্কবাবুর চেয়েও অনেক বেশি ময়লা। ঠিক ময়লা বলা চলে না। কালো পাথরের মতো উজ্জ্বল মসৃণ, মুখ চোখের গড়নও মা বাপের মত নয়। লম্বাটে ধরণের মুখ। বড় কালো কালো চোখ। বছর সাতেক বয়স হবে মেয়েটির। আর ছেলেটির মুখখানা গোলগাল, রঙটা ফর্সা। কিন্তু মায়ের মত অমন গৌর নয়, একটু ফ্যাকাশে ধরনের। ছেলেটির বয়সও বছর সাতেক হবে।" এই বর্ণনা অংশের পরই আমরা বুঝতে পারি যে পূর্ব অংশে মৃগাঙ্ক বা অদিতির বাহ্যিক আকৃতির বর্ণনা লেখক কেন দিয়েছেন। ছেলে মেয়ে দুটি যে মৃগাঙ্ক ও অদিতির যৌথ ভালোবাসার ফসল নয় — এ সম্পর্কে আমরা অনেকটা নিশ্চিত হতে পারি। অতএব বলা যায় চরিত্রদের আকার আকৃতিগত বর্ণনা কিছুটা বড় হতে পারে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিছুটা অপ্রয়োজনীয় বলে বোধ হতে পারে, কিন্তু অন্তরঙ্গ বিচারে এবং গল্পের বিষয়কে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই বিবৃতি কখনো 'irrelevent from their main topic' নয়। এ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা যায় যে গল্পকার প্রথম থেকেই গল্পের শীর্ষবিন্দুর দিকে লক্ষ্য রেখে পরতে পরতে রহস্য সৃষ্টি ও উন্মোচন করে চলেছেন এবং একটি আগ্রহ পাঠকমনে

জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই আমরা দেখি যে, লেখকের কাছে মৃগাঙ্ক ও অদিতির চেহারার সঙ্গে তাদের পুত্র কন্যার যেমন অমিল চোখে পড়েছে, তেমনিভাবে তাদের পুত্র কন্যাদের নিজেদের মধ্যেও কোনো মিল নেই এবং আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তাদের উভয়েরই বয়স লেখকের কাছে সাত বলে মনে হয়েছে।

প্রথমেই বলা হয়েছে যে গল্পের ঘটনার কাল, একটি বড় সময় সীমা জুড়ে ছড়িয়ে আছে। গল্পের কাহিনি অংশের সময়ের এই বিস্তার গল্পের আয়তনগত দীর্ঘতার একটি বড় কারণ। কিন্তু একটি বিস্তীর্ণ সময়কাল জুড়ে কাহিনি দীর্ঘায়িত হলেও লেখকের বর্ণনা কখনো গল্পকে ভারাক্রান্ত করেনি বরং গল্পের তীব্র গতিই গল্পকে দীর্ঘ আয়তন সত্ত্বেও নির্ভার করে তুলেছে। প্রথমে গল্পের চরিত্রদের দৈহিক বর্ণনার দীর্ঘতার কারণ অনুসন্ধান করে বলা হয়েছে যে এই বর্ণনা গল্পের পক্ষে আবশ্যিক। এখন দেখা যাক ছোটগল্পের মূল 'singleness of purpose' কে বজায় রাখতে আবশ্যক কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে লেখক কেমন ক'রে সংক্ষিপ্ত করেছেন।

মৃগাঙ্ক ও অদিতির বিয়ের পর মৃগাঙ্ক ও অদিতি ধীরে ধীরে সংগীত ও চিত্রকলা দুই শিল্পের থেকেই দূরে সরে গেছে। এই শিল্পের সংঘাত প্রথমে শুরু হয়েছে আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য থেকেই। কেমন ক'রে তাদের আর্থিক দৈন্যের সূচনা তার বর্ণনা লেখক সামান্যই দিয়েছেন। যেহেতু এই বর্ণনাকে বিস্তারিত করা এই গল্পের জন্য অনাবশ্যক তাই দেখি লেখক পৃথক পৃথক পরিচ্ছেদে শুধুমাত্র কিছু টুকরো টুকরো বাক্য রচনা করেছেন। যেমন —

২য় পরিচ্ছেদে — ".....বছর খানেকের মধ্যে ভোজবাজির মত সেই পাঁচ হাজার টাকা ওদের উবে গেল।"

৪র্থ পরিচ্ছেদে — "ওদের সঞ্চয় ফুরিয়ে গিয়েছিল।"

৫ম পরিচ্ছেদের সূচনা হয়েছে এই ভাবে — "মাস ছয়েকের মধ্যে সংসারের এমন হাল হল যে ডাল আর আলুভাতের বেশি কিছু জোটে না।"

এই স্বল্প বর্ণনার মধ্য দিয়ে মৃগাঙ্ক ও অদিতির যে আর্থিক স্বচ্ছলতা দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক দূরত্বও বৃদ্ধি পাচ্ছে সে কথাও লেখক উল্লেখ করেছেন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে। কিন্তু এই সুস্পষ্ট বর্ণনা এসেছে সংযতভাবে, মিতভাষণের মধ্য দিয়ে, অতিকথনকে পরিত্যাগ করেই। তাই দীর্ঘ সময়কালের দৈনন্দিন জীবনযাপনকে অনুপুঙ্খভাবে লেখক তুলে ধরেননি, আর এই স্বল্পভাষণ এসেছে ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যকে জয়যুক্ত করেই। কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ relevent বিষয় বা ঘটনাকেই বর্ণনা করবার জন্য লেখক দীর্ঘ সময়ের প্রবাহকে ধরেছেন এইভাবে —

১. "মাস ছয়েকের মধ্যে এমন হাল হল ....."

২. "আমি মাঝখানে আর একদিন খোঁজ নিয়ে জানলাম ....."

৩. "মাস কয়েক আমি আর ওদের কোন খোঁজ খবর রাখতে পারলাম না।"

৪. "এর পর বোধ হয় বছর খানেক কি বছর দেড়েক পরে অদিতির সঙ্গে আমার এক অদ্ভুত অবস্থায় দেখা হয়ে গেল।"

৫. "তারপর কাটল বছর দুই।"

এইভাবে কাহিনিতে সময় এগিয়ে গেছে দ্রুতগতিতে কিন্তু এই দীর্ঘ সময়কে তুলে ধরতে গিয়ে অনুপুঙ্খতার আশ্রয় নেননি, বরং লেখক কেবল মূল ঘটনার বর্ণনাটি করেছেন। তাই গল্পে মৃগাঙ্ক ও অদিতির মধ্যে বিরোধের সূত্রপাতের পর মাসখানেক জুড়ে কী হয়েছে তার বর্ণনা লেখক দেননি কিন্তু তাদের বিরোধের মূল কারণটি যে বজায় রয়েছে তার স্পষ্ট বর্ণনা নরেন্দ্রনাথ দিয়েছেন। যেমন — "আমি মাঝখানে আর একদিন খোঁজ নিয়ে জানলাম অদিতি তার ওস্তাদের বাড়িতেই গান শেখার ব্যবস্থা করেছে।" কিংবা — "মাস কয়েক পরে চৌরঙ্গী টেরাসের ছোট একটা একজিবিশনে রিনি পালিতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে ঘুরতে দেখলাম মৃগাঙ্ককে।"

এইভাবে দেখা যায় যে, নরেন্দ্রনাথ দীর্ঘায়তন ছোটগল্প রচনা করছেন বটে কিন্তু তাতে ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হচ্ছেনা বা Singleness of effect, singleness of purpose ও Singleness of treatment -এর ব্যত্যয় ঘটছেনা। এই ক্ষেত্রে আরও বলা যায় 'বিলম্বিত লয়' গল্পে এডিথের অনুচ্চারিত প্রেম যেহেতু গল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, কিন্তু গল্পের মূল বিষয় নয়, তাই সেখানেও লেখক নিতান্ত স্বল্প পরিসরে তার বর্ণনা দিচ্ছেন। এমনকি এই প্রেমের কোনো পূর্বইঙ্গিত পর্যন্ত কোথাও ফুটে ওঠেনি। কেবলমাত্র নিষ্ঠাবান একজন খ্রিস্টান মেয়ের আত্মোৎসর্গই এখানে পটভূমিকা রচনা করেছে। এমনভাবে আরও দেখা যায় মৃগাঙ্কের মেয়ের চেহারার বর্ণনা গল্পের সূচনা অংশে গুরুত্বপূর্ণ বলে তা লেখক তা দিয়েছেন কিন্তু পরবর্তীকালে অনাবশ্যক বলেই চরিত্রটির উল্লেখ পর্যন্ত খুব স্বল্প স্থানেই রয়েছে। একইভাবে অদিতির ছেলের কঠিন রোগভোগ ও আরোগ্যের ঘটনা বর্ণনায় লেখক ব্যয় করেছেন কেবল দুটি পংক্তি। এই পংক্তির একটি হল— "অদিতি তার শেষ গয়না পর্যন্ত বিক্রি করে ছেলের রোগ সারালো।"

গল্পের সমাপ্তিতে মৃগাঙ্ক ও অদিতির পুনর্মিলন হয়েছে এবং সেই মিলনের ক্ষেত্র রচনা করেছে এডিথের মৃত্যুদিনে তার সমাধিতে ফুল দেবার ঘটনাটি, তাই সেই অংশটি একটু বিস্তার লাভ করেছে। অপরদিকে মৃগাঙ্ক ও অদিতির বিবাহ বিচ্ছেদের বহুদিন পর তাদের পুনরায় সাক্ষাতের বর্ণনাতে বিস্তৃতির বাহুল্য নেই, কেবল বলা হয়েছে— ".....জয়শ্রী অফিসের রাস্তায় প্রায়ই দেখা - সাক্ষাৎ হতে লাগল। দ্বিতীয় তৃতীয় দিনে প্রথম দিনের আড়ষ্টতা আর রইলনা।"

এইভাবে দেখা যায় ২৯পাতা জুড়ে বিস্তৃত একটি ছোট গল্পেও নরেন্দ্রনাথ মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত

হননি এবং আয়তনের দীর্ঘতা সত্বেও ছোটগল্পের মূল সুরটিকে ধরে রাখতে পেরেছেন। প্রতীতিজাত সমগ্রতাই 'বিলম্বিত লয়' গল্পটিকে ছোটগল্প হিসেবে সার্থক করেছে এবং এর বৃহৎ আয়তন এর ছোটগল্প হয়ে ওঠাকে বাধাপ্রাপ্ত করেনি। তাই বলা যায় নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটো আকারের গল্পগুলি যেমন ছোটগল্প হিসেবে উত্তীর্ণ তেমনি বড় আকৃতির গল্প গুলিও ছোটগল্প হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের সীমালগ্ন। 'বিলম্বিত লয়' গল্পটিকে বিশ্লেষণ করেই দেখানো যায় এখানে ছোটগল্পের একটি মাত্র পরিণতি ও ভাবের শর্ত যেমন রক্ষিত হয়েছে তেমনি এখানে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এক নিবিড় ভাব ঐক্যও বর্তমান আর এর সঙ্গে এর কাহিনিও গতিময়। তীব্র গতিময়তায় এর ঘটনাধারা এগিয়ে গিয়েছে আর এই স্রোতপ্রবাহ গল্পের দীর্ঘ আয়তন সত্ত্বেও গল্পকে নির্ভার করে তুলেছে। এই ভাবে নরেন্দ্রনাথ ছোটগল্পের সংহতি, সংক্ষিপ্ততা ও ইঙ্গিতময়তাকে বজায় রেখেছেন এবং পটভূমিগত সকল সম্ভাব্য বিস্তারকে সংকুচিত করে কেন্দ্রমুখী করেছেন, জ্যা মুক্ত তীরের মত নির্দিষ্ট লক্ষ্যে চালিত করেছেন। যেখানে যেখানে পটভূমি, চরিত্র বা বিষয়ের বর্ণনা বিস্তারিত হয়েছে আপাত বিচারে অনেক সময় তাকে থিম বিচ্যুত বলে মনে হলেও গভীরতর বিশ্লেষণে দেখা যায় তা কখনই থিম বিচ্যুত নয়।

গল্পের নামকরণ

সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত ছোটগল্পেও নামকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নামকরণের বৃন্তেই ফুটে ওঠে গল্পের মূল বিষয় ও তাৎপর্যটি। লেখক এই নামকরণের মধ্য দিয়েই নির্দেশ করেন আমাদের দৃষ্টি কোনদিকে আকৃষ্ট হবে। সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট নামকরণ যেমন গল্পের তাৎপর্য বৃদ্ধি করে তেমনি পাঠককে পথনির্দেশও প্রদান করে। এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে নরেন্দ্রনাথের গল্পের সূচনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে গল্পের সূচনা অংশের পূর্বেই যে গল্পের সূচনা তা হল নামকরণ।

গল্পের নামকরণের ক্ষেত্রে মূলত গল্পকারগণ পাঁচটি পদ্ধতির প্রয়োগ করে থাকেন। যথা —

১) চরিত্রপ্রধান নামকরণ।

২) বিষয়ভিত্তিক নামকরণ।

৩) ভাবাত্মক বা ব্যঞ্জনামূলক নামকরণ।

৪) পটভূমিকেন্দ্রিক নামকরণ।

৫) আঙ্গিকনির্ভর নামকরণ।

নরেন্দ্রনাথের অধিকাংশ গল্পেই ব্যঞ্জনামূলক নামকরণ চোখে পড়ে তবে বিষয়ভিত্তিক ও চরিত্রপ্রধান নামকরণও দুর্লভ নয়। চরিত্রপ্রধান নামকরণের দৃষ্টান্ত হিসেবে — 'চাঁদমিঞা', 'রত্নাবাঈ', 'কুন্তল' প্রভৃতি গল্পের কথা আর বিষয়ভিত্তিক নামকরণের দৃষ্টান্ত হিসেবে 'অনাথের কীর্তিকলাপ' বা 'একটি বিনিদ্র রজনী' গল্পের নামকরণের কথা উল্লেখ করা যায়। তবে অধিকাংশ গল্পেই তিনি ভাবাত্মক নামকরণ করেছেন, তাঁর 'রস', 'চড়াই উৎরাই', 'বিকল্প' প্রভৃতি গল্পগুলি তার দৃষ্টান্ত।

নরেন্দ্রনাথের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল তাঁর বহুগল্প গড়ে উঠেছে অনেক তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়ে, যদিও সেই তুচ্ছ বিষয় শেষ পর্যন্ত এক বৃহতের ব্যঞ্জনা দিয়েছে অথবা মানবিক সম্পর্কের এক বিশেষ রূপ বা মুহূর্তকে ব্যঞ্জিত করে তুলেছে। 'টিকেট' গল্পটিকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। এমনই তুচ্ছ বিষয় নিয়ে রচিত গল্পের বস্তুকেন্দ্রিক নামকরণ চোখে পড়ে তাঁর রচনায় আর সেই তালিকাটি নিতান্ত ক্ষুদ্র হয়না। যেমন — 'সিঁদুর', 'কুলপী বরফ', 'পদক', 'পতাকা', 'কাঠগোলাপ', 'চেক', 'ক্রোড়পত্র', 'আলপিন', 'গহনা', 'টিকেট', 'শাল', 'টর্চ', 'জাল', 'বেহালা', 'হার', 'ছবি', 'পালঙ্ক', 'এক পো দুধ', 'চা', 'ঘড়ি', 'দশ টাকার নোট', 'ধূপকাঠি', 'চিঠি', 'জামা', 'আয়না', 'সুহাসিনী তরল আলতা', 'এক্স-রে', 'গোঁফ', 'পাণ্ডুলিপি', 'ক্যালেন্ডার', 'রক্ষাকবচ', 'সিগারেট', 'ক্যামেরা', 'ফোন', 'টেপরেকর্ড', 'ফটো', 'তৈলচিত্র', 'মুখোশ', 'আংটি', 'অ্যালবাম', 'পাশা' প্রভৃতি। যদিও এই সব বস্তুকে কেন্দ্র করে বা অবলম্বন করে গল্পগুলি গড়ে উঠেছে কিন্তু সে সব গল্পের শিল্পবোধ বিন্দুমাত্র ব্যাহত হয়নি। প্রসঙ্গক্রমে 'পালঙ্ক' গল্পটির কথা উল্লেখ করা

যায়। গল্পটি নরেন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প হিসেবে স্বীকৃত। চলচ্চিত্রে রূপায়িত গল্পটির মধ্যে বহু মাত্রা আমরা আবিষ্কার করতে পারি। দেশবিভাগ, দেশবিভাগের পর দেশত্যাগী মানুষের দুরবস্থা, স্বদেশকে আঁকড়ে থাকা মানুষের মানসিকতা, তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের গ্রামীণ চিত্র সবই এই গল্পে বিধৃত হয়েছে অসামান্য শিল্পসম্মতরূপে। কিন্তু গল্পের মূল সংকট ঘনীভূত হয়েছে ধলাকর্তা ও মকবুল মিঞার মধ্যে আর তার কেন্দ্রে আছে একটি পালঙ্ক। ক্ষোভের মাথায় পালঙ্ক বিক্রি করে ধলাকর্তা পুনরায় সেটি ফিরে পেতে চেয়েছেন আর দারিদ্র্যক্লিষ্ট মকবুলও জেদবশত সেটি হাতছাড়া করতে চায়নি। শেষ পর্যন্ত পালঙ্ককে নিয়ে ঘনীভূত সংকটও বিদূরিত হয়েছে পালঙ্ককে কেন্দ্র করেই। যখন মকবুল ক্ষুধার জ্বালায় পালঙ্ক ফিরিয়ে দিতে চেয়েছে ধলাকর্তাকে তখন পালঙ্কের উপর মকবুলের সন্তানদের দেখে তাদের মধ্যে এক ঐশ্বরিক মহিমাকে দেখতে পেয়েছেন ধলাকর্তা আর তাঁর পালঙ্কের মায়াও দূর হয়েছে — "এতদিন চুরি কইরা কইরা তোর ঘরের পালং আমি দেইখা গেছি মকবুল। কিন্তু খালি পালংই দেখছি। আইজ আর আমার পালং খালিনা। আইজ আমার চৌদোলা খালি না। আইজ চৌদোলার ওপর আরো দুইজনরে দেখলাম — দেখলাম আমার রাধাগোবিন্দরে।" — এইভাবে সামান্য পালঙ্ক অসামান্যতা লাভ করে আর গল্পের নাম 'পালঙ্ক' সার্থক ও শিল্পসম্মত হয়ে উঠে।

একই ভাবে 'টিকেট' গল্পে দেখা যায় টিকেটকে কেন্দ্র করে মানুষের মনুষ্যত্বের জাগরণ ঘটেছে, অন্যায় কাজ করে মানুষ বিবেকের দংশনে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। সেই জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে সামান্য একটি ট্রামের টিকিট যেটি শীতাংশু ক্রয়ও করেনি। গল্পে দেখা যায়, অফিসফেরত শীতাংশু ট্রামের টিকেট না কিনে কনডাক্টারকে ফাঁকি দিয়ে আত্মপ্রসাদ ও আত্মগৌরব অনুভব করেছে। কিন্তু সেই গৌরব মুহূর্তে ধূলিস্যাৎ হয়ে অপরাধবোধ গ্রাস করেছে তাকে, যখন তার ছোট্ট ছেলে প্রতিদিনকার মত তার অফিস থেকে ফেরার বাস বা ট্রামের টিকিটটি চেয়েছে। 'টিকেট বাবু' শব্দের মধ্যে যেন বিবেকের আহ্বান শুনতে পেয়েছে শীতাংশু। এইভাবে টিকেটকে কেন্দ্র করে মানুষের জটিল মনস্তত্বকে উদ্‌ঘাটন করেছেন লেখক। আর গল্পের নামকরণও সার্থকতা পেয়েছে।

'এক পো দুধ' গল্পে এক পো দুধকে কেন্দ্র করে মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে সম্পর্কের নতুন সমীকরণ প্রকাশ পেয়েছে। দুধকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রী, দেবর-বৌদি, কাকা-ভাইপো, বাবা-ছেলে প্রভৃতিদের সম্পর্কগুলি যেন পুনরায় বিন্যস্ত হয়েছে। লতিকা স্বামী বিনোদের পরিশ্রমে ক্ষয়ে যাওয়া স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য এক পো দুধ অতিরিক্ত রোজ করে দিয়েছে। বিনোদ সেই এক কাপ দুধকে দেখেছে 'দুধ সাগর' তা যেন — "স্ত্রীর গোপন হৃদয়ের প্রেম-সাগরের প্রতিরূপ।" এরপর এই এক কাপ দুধকে নিয়ে প্রেম-প্রীতি, ঝগড়া, বাদ-বিসংবাদ সকল কিছুই ঘটেছে। এই গল্পের উপসংহারে সংসারে শান্তি স্থাপিত হয়েছে; দুধের কাপ বিনোদ থেকে লতিকা তারপর দেবর বিজন, বিজন থেকে তার ভাইপো সুনীল লাভ করেছে। সুনীলের কাছ থেকে সেই

দুধের কাপ গিয়েছে বন্ধু ফটিকের কাছে দরিদ্র ফটিককে সুনীল দুধের কাপ দিয়ে বলেছে — "তুই খেলেই আমার খাওয়া হবে।"— এই ভাবে এক পো দুধ এক নিম্নবিত্ত পরিবারে কী ভূমিকা গ্রহণ করে, তাকে কেন্দ্র করে কেমন করে পারিবারিক সম্পর্ক নূতন করে বিন্যস্ত হতে পারে তা যেন ফুটে উঠেছে এই গল্পে। এখানেই গল্প তার নামকরণের মতই সার্থকতা লাভ করে।

নরেন্দ্রনাথের গল্পের বিষয় ও আশ্রয় যেহেতু মধ্যবিত্ত বাঙালিসমাজ, স্বাভাবিক কারণেই সেই গল্পে ফুটে উঠেছে বহু বিচিত্র পেশা অবলম্বনকারী চরিত্র। অনেকক্ষেত্রেই কোনো পদ বা কর্মজীবন সম্পর্কিত মানুষকে নিয়ে রচিত গল্পে বৃত্তি বা জীবিকাকেন্দ্রিক নামকরণ চোখে পড়ে। 'নেতা', 'চোর', 'হেডমাস্টার', 'ফেরিওয়ালা', 'অভিনেত্রী', 'হেডমিস্ট্রেস', 'হকার', 'কন্ডাক্টর', 'ডাক্তার', 'ছোট দিদিমণি', 'নুলিয়া', 'ছাত্রী', 'লেখিকা', 'পরিচালক', 'পণ্ডিতমশাই', 'ম্যাজিসিয়ান', 'নাবিক', 'মালাকার', 'মিস্ত্রী', 'মালী' প্রভৃতি ছোটগল্পগুলির কথা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। এছাড়াও তাঁর বহু গল্পে বহু বিচিত্র পেশাধারী মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন — খেজুর গাছের রস সংগ্রহকার ('রস'), ভাস্কর ('প্রতিদ্বন্দ্বী') প্রভৃতি। বৃত্তিমূলক নামকরণের গল্পগুলিতে নামকরণে এই সব বৃত্তিধারীদের স্থান প্রদান করে লেখক সেই সব চরিত্রদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবিকাকেও গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

এই প্রসঙ্গে 'নুলিয়া' গল্পটির কথা উল্লেখ করা যায়। 'নুলিয়া' গল্পটিতে আমরা সাক্ষাৎ পাই "ছ ফুট দেহ, চওড়া বুক, চৌকো চোয়াল, আর চ্যাপটা চিবুকওয়ালা" এক নুলিয়ার। পুরীর সমুদ্রে সে স্নানার্থীদের স্নান করতে সাহায্য করে। গল্পের প্রারম্ভে নুলিয়ার যে পরিচয় আমরা পাই তা হল ভ্রমণ পিপাসু পর্যটকদের সমুদ্রে স্নান করিয়ে উপার্জন করা এক সাধারণ নুলিয়ার, কিন্তু গল্পের শেষে সেই চরিত্রটিই পৃথক মাত্রা নিয়ে এক স্বতন্ত্র উচ্চতা লাভ করেছে। সুধাময়ের স্ত্রী অণিমা ছেলে শিবু ও বন্ধু কন্যা হেনাকে নিয়ে পুরীতে এসেছে ভ্রমণ পিপাসা মেটাতে। দিন পনেরো পর সুধাময়ও এসে যোগ দিয়েছে তাদের সঙ্গে। এরই মধ্যে নুলিয়া গোবিন্দ, অণিমা, শিবু ও হেনাকে সমুদ্রে সন্তরণে পটু করে তুলেছে। সুধাময়ের আগমন ঘটলে তাকেও সমুদ্রে স্নান করিয়ে খুশি করতে চায় গোবিন্দ। একরকম নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ও সমুদ্রস্নানের মধ্যে দিয়ে যখন সুখের দিন গুলি কেটে যাচ্ছিল সেই সময়ই ঘটে এক আকস্মিক দুর্ঘটনা। শিবু একা একা সাঁতার কেটে দূর সমুদ্রে যেতে গিয়ে জলে ডুবে যাবার উপক্রম হয় কিন্তু গোবিন্দ নিজের জীবন বিপন্ন করে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। গোবিন্দের জন্যই 'আর একটা দেবতার গ্রাস' হতে হতে রক্ষা পায় শিবু। কলকাতায় ফিরবার সময় ঠাকুর, পাণ্ডা, চাকর সবাইকে অল্পস্বল্প বকশিস দিয়ে বিদায় করলেও যার পাওনা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ নিজের পুত্রের জীবনদাতা গোবিন্দকে সুধাময় ভুলে যাবার উপক্রম করেছে। গোবিন্দের বকশিসের আব্দারে তাকে মাত্র পাঁচ টাকা বকশিস দিয়ে নিজের কর্তব্য সমাপন করতে চেয়েছে সে। একটি জীবন বাঁচাবার পুরস্কার হিসেবে মাত্র পাঁচ টাকা গোবিন্দ নিতে চায়নি। সে স্বাভাবিক ভাবেই আরও বেশি প্রত্যাশা করেছে,

কিন্তু যখন সুধাময় তাকে অপবাদ দিয়েছে, তার পেশাগত সততার উপর কলঙ্ক লেপন করে বলেছে — "..... জীবন বাঁচিয়েছ না আরও কিছু করেছ। সব তোমার কারসাজি, সব তোমার ব্যাবসা। বাচ্চা ছেলেকে লোভ দেখিয়ে জলে ঠেলে দিয়ে তাকে ফের তুলে এনে পয়সা আদায় করার ফন্দি।" নিজের পেশার উপর এই অসততার মিথ্যে অভিযোগ গোবিন্দ সহ্য করেনি, তাই সে শান্ত অথচ কঠোর স্বরে বলেছে — "জীবন নিয়ে ব্যাবসা আমরা করিনে বাবু।" এরপর সে অণিমার দেওয়া আংটিও গ্রহণ করেনি বরং নিজের এবং নিজের পেশার গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে মাথা উঁচু করে স্থান ত্যাগ করেছে। এর ফলে সামান্য, তুচ্ছ পেশার অধিকারী নুলিয়াও অসাধারণ মাহাত্ম লাভ করেছে। সুধাময়ের অনুভব হয়েছে, প্রথম দিন গোবিন্দকে যেমন চওড়া বুকের অধিকারী মনে হয়েছিল তেমনি তার বিদায়ের দিন মনে হয়েছে — "ওর পিঠটাও ভারি কালো আর চওড়া।"

এই ভাবে গল্পে দেখা যায় একটি বিশেষ পেশার মানুষের পেশার প্রতি দায়বদ্ধতা ও গৌরবের উপর গল্পের ভিত্তি স্থাপিত তাই গল্পের নামও 'নুলিয়া' সার্থক যা প্রধান চরিত্রের পেশাকে নির্দেশ করে।

পেশানির্ভর নামকরণের আরেকটি গল্প হল 'হকার'। এই গল্পের নামকরণের সার্থকতা আলোচনায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এই গল্পের পূর্বনাম 'হকার' ছিল না। ১৩৫৮ এর পূজাসংখ্যা 'ইমরোজ'-এ প্রথম প্রকাশ কালে এ গল্পের নাম ছিল 'সম্বন্ধ'। পরবর্তীতে 'মিশ্ররাগ' গল্পগ্রন্থে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'হকার'। অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় এ গল্পের নামকরণ অতি বেশি পরিমাণে সুচিন্তিত।

গল্পটিতে এক সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের হকারকে কেন্দ্র করে কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। কিন্তু গল্পে হকার পরিতোষের নাম ও চেহারার সামান্য বর্ণনা ছাড়া বিশেষ কোনো প্রত্যক্ষ উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না। মূলত স্ত্রী মণিমালার সঙ্গে হকার পরিতোষের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা — এ বিষয়ে গল্প কথকের সামান্য সন্দেহ এবং সেই সন্দেহের নিরসনে, শান্তি বা স্বস্তি লাভ অপেক্ষা এক বিচিত্র অস্বিস্তকর অনুভূতির উপলব্ধি — এটাই এই গল্পের মূল। সম্ভবত এক অস্তিত্বহীন সম্পর্কের ইঙ্গিতের জন্যই পূর্বে গল্পের নাম রাখা হয়েছিল 'সম্বন্ধ'।

গল্পটি শুরু হয়েছে কাহিনির শেষভাগ থেকে। গল্পকথকের নিজের মনের এক বিক্ষুব্ধ অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করার মধ্য দিয়ে গল্পের কাহিনি অংশ প্রারম্ভ হয়েছে। বিয়ের বছর খানেক পর গল্প কথক তার দূর সম্পর্কের পিসতুত ভাই সুবিমলের কাছ থেকে জানতে পারেন প্রাক্ বিবাহ পর্বে তার স্ত্রী মণিমালার সঙ্গে কোনো এক হকারকে নিয়ে একটি কৌতূহল উদ্দীপক 'হকার এপিসোড' আছে। এই সংবাদকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব না দিলেও কৌতুহলবশত তিনি মণিমালার কাছে কী হয়েছিল তা জানতে চান। মণিমালা তার কাছে অকপটে ব্যক্ত করেন, বাবার বাড়িতে থাকতে তাকে নিয়ে আর খবরের কাগজের হকারকে নিয়ে সংকীর্ণমনা প্রতিবেশিদের রটনা এবং সেই সূত্রে সেই হকারকে পাড়া থেকে

বিতারণের ইতিহাস। এই ঘটনা ছাড়াও তিনি আরও জানতে পারেন বিনাপাপে গুরুদণ্ডলাভকারী সেই হকার পরিতোষকেই মণিমালা এ বাড়িতেও সংবাদপত্র সরবরাহের কাজে নিযুক্ত করেছে। এ সংবাদ জানবার পর সামান্য হলেও মণিমালা ও হকারের প্রকৃত সম্পর্ক নিয়ে কথকের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। মনে হয়েছে — "কে তাকে (মণিমালাকে) এত কাগজ পড়তে শেখাল ? সত্যিই কি কাগজ ভালোবাসে মণিমালা না কাগজের কবিকে।" যদিও এমন চিন্তাকে তিনি প্রশ্রয় দিতে চান না। নিজেকে তিনি আশ্বস্ত করেন — "পরিতোষের সঙ্গে যদিও কোন সম্পর্ক তার গড়েই উঠে থাকে তা নিশ্চয়ই হৃদয় ঘটিত নয়। বড় জোর সহৃদয় সহানুভূতির।"

তবুও সামান্য একটু হলেও একটা অস্বস্তি হয় তার, মনে হয় কাগজ নেবার মধ্যে যেন একটু বেশি রকম উল্লাস মিশে থাকে মণিমালার। এই বোধটিকে তিনি আমল দিতে চাননা, মনে মনে স্বীকার করতেও লজ্জা পান — "হকারের সঙ্গে প্রয়োজনীয় এক আধটুকু কথাবার্তার বিনিময়ে যেন অদ্ভুত এক অন্তরঙ্গতার সুর তার গলায় ফুটে উঠতে শুনি। অত্যন্ত অশোভন অত্যন্ত অবাঞ্ছিত, তবু মনের মধ্যে খুঁৎখুঁতিটা লেগেই থাকে অথচ এই খুঁৎখুঁতিটাকে আমি প্রশ্রয় দিতে চাই না, স্বীকৃতি দিতেও লজ্জা পাই।"

এই সন্দিগ্ধ ভাব সহসাই একদিন কেটে যায়। হঠাৎ গল্পকথক একদিন শুনতে পান হকার পরিতোষের সঙ্গে স্ত্রী মণিমালার কথোপকথন আর সেই সংলাপ মোটেই অনুরাগের রঙে রাঙা নয় বরং পরিতোষকে বারংবার তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করছে মণিমালা। হকারের ঠিকমতো কাগজ না দেওয়াই এর কারণ, শেষ পর্যন্ত মণিমালা তাকে বিদায়ও করে দিয়েছে। সেই মুহূর্তেই কথকের উপলব্ধি হয়েছে যে এতদিন মণিমালা পরিতোষকে নিয়ে কেবল তার সঙ্গে পরিহাস করেছে, তার সন্দিগ্ধতাকে বিদ্রূপ করেছে। গ্রাহক ও পরিবেশক ব্যতীত অন্য কোনো সম্পর্কই কোনোদিন তাদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। এতদিন নিজের অন্তঃকরণের অনুভূতি নিয়ে তিনি লজ্জাবোধ করেছেন, নিজের কাছে নিজে ছোট হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু যে সম্পর্কটিকে কথক মনে মনে কল্পনা করেছেন সেই সম্পর্কের প্রস্ফুটনের আগেই ধূলিসাৎ হবার ঘটনায় বরং বেদনা অনুভব করেছেন, অন্তরে ব্যথিত হয়েছেন। মনে হয়েছে একটি তরুণ ও একটি তরুণীকে ঘিরে মিষ্টি প্রেমের যে গল্পটি তিনি মনে মনে পল্লবিত করে তুলেছিলেন সেই প্রেমের অপমৃত্যু ঘটেছে। একটি সুখস্বপ্নের অবসান ঘটেছে। ফলে যে ঘটনায় তার স্বস্তিলাভ করা উচিৎ ছিল, তাতে তিনি দুঃখিত হয়েছেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে এই গল্পের পূর্বনাম ছিল 'সম্বন্ধ' কিন্তু লেখক তা পরবর্তীকালে পরিবর্তন করে রাখেন 'হকার'। এই পরিবর্তনের কারণ ও নতুন নামের সার্থকতা বিচারে দেখা যায়, গল্পটিতে একটি সম্পর্কের ইঙ্গিত আছে বটে, কিন্তু তা অস্তিত্বহীন। পরিতোষ ও মণিমালার মধ্যে যে সম্বন্ধ তা নিছক গ্রাহক ও পরিবেশকের। তাদের মধ্যে অস্তিত্বহীন একটি সম্পর্কের সন্দেহ আছে বটে কিন্তু পরিতোষ তার বৃত্তি পরিচয়ের উর্ধ্বে উঠতে পারে নি, সে পৃথিবীর সকলের কাছে হকার, একই সঙ্গে মণিমালার কাছেও

হকার। এই কারণেই লেখক গল্পের নামকরণ করেছেন 'হকার'; যে নামকরণ আমাদের ইঙ্গিত দেয় গল্পের পরিণতির দিকে, ইঙ্গিত করে আমাদের দৃষ্টি কোনদিকে নিবদ্ধ করতে হবে তার দিকে আর সেই আলোকেই নামকরণ সার্থক হয়ে ওঠে।

'হকার' গল্পের মতই বহু গল্পের নামকরণ নরেন্দ্রনাথ পরবর্তীসময়ে পরিবর্তন করেছেন আর তেমন গল্পের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। এ থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় নরেন্দ্রনাথ নামকরণ সম্পর্কে, গল্পে নামকরণের গুরুত্ব সম্পর্কে বিশেষভাবে ভাবিত ছিলেন আর যতক্ষণ তিনি এ বিষয়ে পুরোপুরি সন্তুষ্ট ও নিঃসংশয় হতেন না ততক্ষণ তিনি গল্পের নামকে পরিবর্তন করতে পিছুপা হননি। যে সকল ছোটগল্পের নাম তিনি প্রথম প্রকাশের পর গল্পগ্রন্থে স্থান দেবার সময় পরিবর্তন করেছেন তা নির্দেশ করা হল।

ছোটগল্পের পূর্ব নাম	ছোটগল্পের পরিবর্তিত নাম	গল্পগ্রন্থের নাম
১. 'যাত্রা'	'যাত্রাপথ'	'যাত্রাপথ'
২. 'সংশয়'	'যবনিকা'	'বসন্ত পঞ্চম'
৩. 'পুরনো দুনিয়া'	'পুরাতনী'	'রূপসজ্জা'
৪. 'তুফানী'	'সোহাগিনী'	'পত্রবিলাস'
৫. 'কুসুম'	'দ্বিরাগমন'	'ময়ূরী'
৬. 'বিজয়িনী'	'বিদ্যুৎলতা'	'বিদ্যুৎলতা'
৭. 'ধার'	'ঋণ'	'দীপান্বিতা'
৮. 'কুমার কুমারী'	'বসন্ত পঞ্চম'	'বসন্ত পঞ্চম'
৯. 'রূপ'	'রূপলাগি'	'মিসেস গ্রীণ'
১০. 'রূপ না দিলে যদি'	'রূপলাগি'	'রূপলাগি'
১১. 'দ্বৈরথ'	'দুই যোদ্ধা'	'অনাগত'
১২. 'সংসর্গ'	'চোরাবালি'	'অসমতল'
১৩. 'বিষক্ষয়'	'রসাভাস'	'অসমতল'
১৪. 'রান্না'	'শুভদৃষ্টি'	'মিশ্ররাগ'
১৫. 'এপিঠ ওপিঠ'	'একূল ও কূল'	'একূল ও কূল'
১৬. 'হাসপাতাল'	'মালঞ্চ'	'হলদে বাড়ি'
১৭. 'এক খানি দশ টাকার নোট'	'দশ টাকার নোট'	'ওপাশের দরজা'
১৮. 'প্রতিদান'	'কৃতজ্ঞ'	'বিনি সুতোর মালা'

ছোটগল্পের পূর্ব নাম	ছোটগল্পের পরিবর্তিত নাম	গল্পগ্রন্থের নাম
১৯. 'হোটেলের গল্প'	'চিহ্ন'	'বসন্ত পঞ্চম'
২০. 'আমেরিকা'	'পাত্রী'	'রূপসজ্জা'
২১. 'ভিন্ন গল্প'	'অন্যগল্প'	'রূপলাগি'
২২. 'সীমানা'	'সীমান্ত'	'দেবযানী'
২৩. 'সম্পর্ক'	'বন্ধন'	'রূপলাগি'
২৪. 'আতসবাজি'	'আতসকর'	'রূপছায়া'
২৫. 'অধিকন্তু'	'বিজয়ী'	'বিনিসুতোর মালা'
২৬. 'প্রেম'	'দয়িতা'	'অসবর্ণা'
২৭. 'সম্বন্ধ'	'হকার'	'মিশ্ররাগ'
২৮. 'জোলাদুধ'	'মিশ্ররাগ'	'ওপাশের দরজা'
২৯. 'স্মারক'	'স্মৃতি গন্ধ'	'রূপালী রেখা'
৩০. 'পুত্র'	'সন্ধান'	'একটি ফুলকে ঘিরে'
৩১. 'দৈবাৎ'/'দৈব'	'কোন ক্ষণে'	'বিনি সুতোর মালা'
৩২. 'উৎস সন্ধানে'	'উৎস'	'বিনি সুতোর মালা'
৩৩. 'পুনশ্চ'	'সিঁদুর'	'হলদেবাড়ি'
৩৪. 'নৈর্ব্যক্তিক'	'বৃত্ত'	'বিনি সুতোর মালা'
৩৫. 'রূপ'	'সেই মুখ'	'স্বরসন্ধি'
৩৬. 'ওয়েসিস'	'মরুদ্যান'	'বিদ্যুৎলতা'
৩৭. 'কোন একজনের কাহিনী'	'একক'	'দেবযানী'
৩৮. 'প্রতিদান'	'ক্যামেরা'	'স্বরসন্ধি'
৩৯. 'ঈর্ষা'	'ফোটো'	'বিন্দু বিন্দু'

বৃত্তিমূলক নামকরণ করা হয়েছে এমন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ছোটগল্প হল 'হেডমাস্টার'। মানুষ যখন কোনো পেশার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়, তখন সেই পেশা কেবল পেশা থাকে না, নেশা হয়ে যায়। শত বিরুদ্ধ পরিস্থিতি, সহস্র প্রতিকূলতা তার সেই নেশাকে পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয় না। এই বাস্তব সত্যটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে 'হেডমাস্টার' গল্পে, ফলে গল্পের নামকরণও করা হয়েছে 'হেডমাস্টার'। কারণ গল্পের হেডমাস্টার কৃষ্ণপ্রসন্ন সরকার হেডমাস্টারের পদ ত্যাগ করে অন্য পেশা গ্রহণে বাধ্য

হয়েছেন, নতুন পদে এসে অফিসের অনেকেরই বিরাগভাজন হয়েছেন তথাপি তার শিক্ষকতার আদর্শ ও প্রবণতা পরিত্যাগ করতে পারেননি। ব্যাঙ্কের অশিক্ষিত বেয়ারাদের তিনি শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করেছেন। সকলের অগোচরে এই কাজ করেই তিনি আত্মার শান্তি অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

দেশবিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের একটি গ্রামীণ বিদ্যালয়ের হেডমাস্টার মশাই অর্থহীন, সম্বলহীন অবস্থায় কলকাতায় এসেছেন। দীর্ঘ সাতাশ বছর শিক্ষকতা করবার পরও তার পরিবারকে তিনি আর্থিক দৈন্য থেকে মুক্তি দিতে পারেননি, তাই ক্রোধবশত তিনি বলেছেন নতুন কোন কাজ যাই তিনি করুন না কেন, শিক্ষকতা নৈব নৈব চ — "না খেয়ে মরবো, তবু মাস্টারী আর জীবনে করব না। কেরানীগিরী থেকে কুলিগিরি যা বল করতে রাজী আছি। কিন্তু মাস্টারী জীবনে আর নয়। সাতাশ বছর ধ'রে মাস্টারী করার সুখ তো দেখলাম। যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়।" কিন্তু এই সংকল্প নিছক কথার কথা, তার রক্তে রক্তে শিক্ষকতা তাই পুরানো ছাত্রের বদান্যতায় ব্যাঙ্কে কাজ পাবার পর সেই মানসিকতা পুনরায় জাগ্রত হয়েছে, ব্যাঙ্কের উচ্চপদে আসীন ব্যক্তিদেরও তিনি ছাত্র জ্ঞান করেছেন। তার বক্তব্যে ধরা পড়েছে শিক্ষকের পুরনো সুর — "....এক লাইনও ইংরেজী লিখতে পারবেনা। একটা সেনটেন্সে দুটো বানান ভুল, তিনটে গ্রাম্যাটিক্যাল মিসটেক। শুধরে দিলেও শুনবে না, কেবল উড়ো তর্ক।" শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষা নয় তিনি তার বয়স্ক উর্ধ্বতনদের চরিত্র শিক্ষাদানেরও প্রচেষ্টা করেছেন — "কলীগ, তাই বলে স্থানকালপাত্র ভেদ নেই ? অশ্লীল অশ্রাব্য আলোচনায় ছেলের বয়সী ছাত্রের বয়সী সব ছোকরাদের মাথা চিবিয়ে খেতে হবে ? ফের যদি পরিমলবাবুর মুখে আমি এই সব কুৎসিত কথা শুনি, আমি থাপ্পড় মেরে গাল ভেঙে দেব। হাতাহাতি হয়ে যাবে আমার সঙ্গে।" স্বাভাবিক ভাবে ব্যাঙ্কের অন্যান্য কর্মচারীর সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র বনিবনা হয়নি। সমস্ত ডিপার্টমেন্ট ঘুরে তার শেষ পর্যন্ত স্থান হয়েছে বেয়ারাদের সর্দারের স্থানে। তবু তার শিক্ষকতার সত্তা জয়ী হয়েছে, ব্যাঙ্কের বেয়ারাদেরই শিক্ষাদান করেছেন তিনি সংগোপনে। আফিস ছুটি হবার পর ব্যাঙ্কের বাতিল কাগজপত্র, পেন্সিল প্রভৃতি নিয়ে তার ছাত্ররা মাস্টার মশাইকে ঘিরে পড়তে বসেছে। তিনিও তাদের মধ্যে মেধাবী ছাত্রকে চিহ্নিত করেছেন,পড়া ধরেছেন। ছাত্র নিরুপমের কাছে তিনি ধরা পড়ে গেছেন, প্রথমে অপ্রতিভ হলেও মুহূর্ত পড়েই ছাত্রদের গুণপনার কথা বিবৃত করেছেন শিক্ষকের স্বাভাবিক গর্বের অনুভূতির সঙ্গেই — "অদ্ভুত মাথা। ইংরেজী বল, অঙ্ক বল, সব বিষয়ে সমান উৎসাহ। এই সব ছেলেকে দিয়েই স্কলারশিপের এ্যটেম্পট নিতে হয়। প্রায় ক্লাস সিক্সের স্ট্যান্ডার্ডে আছে। জানো, খানিকটা কেয়ার নিতে পারলে ওকেও ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে ফার্স্ট করে তোলা যায়।"

অতএব দেখা যায় গল্পটি চরিত্রকেন্দ্রিক আর কেন্দ্রীয় চরিত্রটির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করেছে শিক্ষকতার সত্তা। এই শিক্ষকতার সত্তার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে দারিদ্র্য, অপমান ও অন্যান্য সকল

কিছুই। কৃষ্ণপ্রসন্ন হেডমাস্টার মশাই, তিনি যেখানেই থাকুননা কেন তার হেডমাস্টারিত্ব ঘুচবার নয় — এই সত্য প্রকাশে গল্পের কাহিনির সঙ্গে সঙ্গে গল্পের নামকরণও সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে।

নরেন্দ্রনাথের বেশ কিছু ছোটগল্পে চরিত্রকেন্দ্রিক নামকরণ চোখে পড়ে। 'রত্নাবাঈ' বা 'চাঁদমিঞা' গল্প তার দৃষ্টান্ত। যেহেতু এই গল্পগুলিতে চরিত্রগুলিই প্রাধান্য লাভ করেছে তার ফলে স্বাভাবিক কারণেই তাদের নামেই গল্পের নামকরণ করা হয়েছে। তবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল উল্লিখিত দুটি গল্পের মুখই অতীতের দিকে ফেরানো। লেখক কোনো কথকের কাছ থেকে এই চরিত্রদের কাহিনি শ্রবণ করেছেন। 'রত্নাবাঈ' গল্পের সূচনায় লেখক বলেন — "কাহিনীটি আবীরচাঁদ রূপচাঁদের আত্মজীবনাত্মক। বিভিন্ন সন্ধ্যায় বিভিন্ন প্রসঙ্গে এ কাহিনীর তিনি আভাস দিলেও প্রধানত একটি বিশেষ দিনের বৈঠকেই আমূল আখ্যানটি তাঁর কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম।" আবীরচাঁদের কাছ থেকে কাহিনি শোনবার পর তিনি বলেন — "উপকথার মত রত্নাবাঈ'র বিগত পনের-ষোল বছরের ইতিবৃত্ত শুনে গেলাম।" — এ থেকেই স্পষ্ট মূল কাহিনি বা 'উপকথা'য় রত্নাবাঈ-ই যেহেতু প্রাধান্য লাভ করেছে সেই হেতু গল্পের নামকরণেও তাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

'চাঁদমিঞা' গল্পের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। গল্পকথক মসিয়র লেখককে চাঁদমিঞার আখ্যান শুনিয়েছেন, আর এ গল্পও অনেকটা উপকথার মত, এ কাহিনি নিয়ে ছড়া গানও বাঁধা হয়েছে — "কাহিনীর নায়ক নশরৎ আলী ছিলেন আমার বাবারই আপন চাচা। ... বেশ মনে আছে, আমাদের অঞ্চলে ছেলেবেলায় এ নিয়ে ছড়া গান পর্যন্ত লোককে বাঁধতে শুনেছি।" স্বাভাবিক ভাবেই কাহিনির নায়কের নামানুসারে গল্পের নামকরণ করা হয়েছে।

নামকরণ প্রসঙ্গের সূচনাতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গল্পের নামকরণে নরেন্দ্রনাথ ব্যঞ্জনামূলক বা ভাবাত্মক নামকরণকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর সুবিশাল গল্পভাণ্ডারের অধিকাংশ গল্পই নামকরণের ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনাধর্মিতাকে পক্ষপাত প্রদর্শন করেছে।

নরেন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প 'রস'। এ গল্পের নামকরণ সম্পর্কে সমালোচক বলেন — "নামকরণের দিক থেকে 'রস' নামটি ছাড়া বুঝি এ গল্পের অন্য কোনো নামই হতে পারে না।"[৫] প্রকৃতপক্ষে 'রস' গল্পে রস শব্দটি বহুমাত্রিকতা লাভ করেছে। এ গল্পের এক রস হল প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত এক 'রস'— খেজুরের রস। আর এক রস হল জীবনরস, রূপাসক্তির রস যা দেহভোগ ও দেহসৌন্দর্যে মূর্ত হয়ে ওঠে। অলংকারশাস্ত্রে রস সম্পর্কে বলা হয় — "নিজের আনন্দময় সম্বিতের আস্বাদ রূপ একটি ব্যাপার। মনের পূর্বনিবিষ্ট রতি প্রভৃতি ভাবের বাসনাদ্বারা অনুরঞ্জিত হয়েই সম্বিৎ আনন্দময় সৌকুমার্য প্রাপ্ত হয়।"[৬] আমরা মোতালেফের আচরণে এই রসের পরিচয়ও লাভ করি।

এ গল্পে একদিকে আছে রূপাসক্তি জাত ভালবাসার কাহিনি, তার সঙ্গে আছে ভালোবাসার সঙ্গে

নিষ্ঠুর প্রতারণা আর আছে সৌন্দর্যময়ী নারীর সঙ্গে জীবিকার চাহিদার দ্বন্দ্ব। এই কাহিনির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে 'রস'। কখনও সেই রস খেজুরের রস কখনও দেহভোগের।

গল্পের প্রধান পুরুষ চরিত্র মোতালেফ খেজুর রস সংগ্রহের একজন অভিজ্ঞ গাছি। এ কাজের জন্য বিশেষ গুণাবলীর প্রয়োজন, কারণ — "যে ধারালো ছ্যান একটু চামড়ায় লাগলেই ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে মানুষের গা থেকে, হতের গুণে সেই ছ্যানের ছোঁয়ায় খেজুর গাছের ভিতর থেকে মিষ্টি রস চুঁইয়ে পড়ে।" মোতালেফ শুধু খেজুরের রস সংগ্রহেই ওস্তাদ তা নয়, সে ব্যক্তি জীবনেও রসের সন্ধানী, এই রস রূপাসক্তির রস। মোতালেফ এই কারণে — "বেছে বেছে সুন্দর মুখের দিকে তাকায়। সুন্দর মুখের খোঁজ করে তার চোখ।" এই রসের অনুসন্ধানেই সে খোঁজ পেয়েছে ফুলবানুর আর তাকে লাভ করবার জন্যও সে সাহায্য নিয়েছে তার রসের, সে রস খেজুরের রস। ফুলবানুকে বিবাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে সে বিবাহ করে নিয়ে এসেছে মাজুখাতুনকে, যে খেজুরের রস থেকে অতি উত্তম গুড় তৈরি করতে সক্ষম। অতএব দেখা যায় গল্পের প্রধান চরিত্রদের পারস্পরিক সম্পর্ক আবর্তিত হয়েছে রসকে কেন্দ্র করেই।

মাজু খাতুনের রসের প্রয়োজন মিটতেই মোতালেফ তাকে তালাক দিয়ে ঘরে এনেছে ফুলবানুকে। মোতালেফের সঙ্গে মাজু খাতুনের সম্পর্ক স্থাপন ও বিচ্ছেদকে নিয়ন্ত্রণ করেছে খেজুরের রস। প্রতারিত হয়ে মাজু খাতুনের ক্রোধ উৎপন্ন হয়েছে আর সেই ক্রোধও সর্বাপেক্ষা অধিক হয়েছে রসের উপর - "রসের সঙ্গে কিছুমাত্র যার সম্পর্ক নেই, শীতকালে খেজুর গাছের ধারে কাছেও যে যায় না, নিকা যদি বসে মাজু খাতুন তার সঙ্গেই বসবে। রসের ব্যাপারে মাজু খাতুনের ঘেন্না ধরে গেছে।" মোতালেফ নতুন রস খুঁজে পেয়েছে ফুলবানুর মধ্যে। খেজুরের রস শীতকালে ছাড়া পাওয়া যায় না কিন্তু ফুলবানুকে মোতালেফের অনিঃশেষ রসের উৎস বলে মনে হয়েছে — "কিন্তু গাছির কাছেও যে গাছের রস দুই-চাইর মাসে ফুরায় ফুলজান, কেবল তোমার রসই বছরে বার মাস, চোঁয়াইয়া পড়ে।" রসের সন্ধানী মোতালেফের জীবন রসে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, তাঁর প্রীতি প্রকাশক সংলাপেও লেগেছে রসের ছোয়া — "পুরুষ মাইনষের ঠোঁট তো ফুলজান কেবল পানের রসে রাঙ্গা হয় না, আর-একজনের পানখাওয়া-ঠোঁটের রস লাগে।"

কিন্তু ফুলবানু ও মোতালেফের এই রসের সম্পর্কে রাহুগ্রাস লেগেছে আর এক রসের মরসুম আসতেই। খেজুরের রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি করবার সময় ফুলবানুর ভূমিকা মাজুখাতুনের সমগোত্রীয় হয়নি, ফুলবানুর তৈরি গুড় সমাদর ও দাম কোনটাই লাভ করেনি, মোতালেফের সুনাম নষ্ট হয়েছে বাজারে। প্রচুর পরিশ্রম সত্ত্বেও মোতালেফের রসিক মন রসশূন্য হয়ে গেছে, মনের সঙ্গে সঙ্গে বাহ্য প্রকৃতিও নীরস হয়ে গেছে তার কাছে — "ঘামে এবারও সর্বাঙ্গ ভিজে যায়, কিন্তু শুকনো পাঁকাটির মত খট খট করে মন, দুপুরের রোদের মত খাঁ খাঁ করে। কোথাও ছিটা ফোঁটা নেই রসের। রসের হাড়িতে ভরে

যায় উঠান, রসবতী নারী ঘরের মধ্যে ঘোরা ফেরা করে, তবু যেন মন ভরে না, কেমন যেন খালি-খালি মনে হয় দুনিয়া।"

এরপর প্রেমের উপর জয়ী হয়েছে প্রয়োজন, 'রসবতী' ফুলজানের থেকে মোতালেফের দূরত্ব তৈরি হয়েছে খেজুরের রসের জন্য। পুনরায় মোতালেফ শরণাপন্ন হয়েছে মাজু খাতুনের, রসের প্রকৃত স্বরূপের উপলব্ধি হয়েছে তার। খেজুরের রস, রূপাসক্তির রস আর সবকিছুর উপর যে জীবনরস, তার দ্বারাই গল্পটি সিক্ত হয়ে নিজের নামকরণের যাথার্থ্য ঘোষণা করেছে। রসের অসামান্য ব্যঞ্জনা প্রকাশে নরেন্দ্রনাথের শিল্পচাতুর্য এখানে শ্রেষ্ঠত্বের সীমালগ্ন।

নরেন্দ্রনাথের 'অসবর্ণা' গল্পেও এমন ভাবাত্মক নামকরণ পরিলক্ষিত হয়। গল্পের বিষয় উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলের সঙ্গে নিম্নবিত্ত ভাড়াটের মেয়ের অনুরাগ এবং শত অনুরাগ সত্ত্বেও আর্থিক ও সামাজিক অবস্থানের পার্থক্যের পাথরপ্রমাণ প্রতিবন্ধকতাকে বিদূরিত করতে না পেরে সে প্রেমের অপমৃত্যু। গল্পের নায়ক প্রবীরদের পারিবারিক ব্যবসা থেকে মোটা অর্থের আমদানি হয়। বর্ণগত মিল থাকলেও একতলার ভাড়াটেদের সঙ্গে আর্থিক অবস্থায় তাদের পার্থক্য পর্বতপ্রমাণ। তবুও সেই ভাড়াটেদের মেয়ে অঞ্জলিকে সম আর্থিক শ্রেণির অনেক মেয়েদের থেকে অন্যরকম লেগেছিল প্রবীরের। "রাসবিহারী এভিনিয়ুর রিটায়ার্ড সাবজজ এইচ চ্যাটার্জির মেয়ে ডলি, কিংবা সাদার্ন এভিনিয়ুর ব্যারিস্টার বীরেন ভাদুড়ীর মেয়ে শুচিস্মিতা, কিংবা সত্য-শিব ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর একডালিয়া প্লেসের পুরন্দরী ভট্চাযের বোন পারমিতা ভট্চাযের চাইতে মোটেই বেমানান মনে হয় না অঞ্জলিকে। বরং দেখে দেখে এই বিশ্বাসই আমার দৃঢ়তর হয়, ডলির মত অঞ্জলির গায়ের রঙ অত সুবর্ণপ্রভ না হলেও, শুচির মত চোখ দুটো অতবড় আর উজ্জ্বল না হলেও, কি পরীর মত ঠোঁট দুটি পেলব আর রক্তাভ না দেখালেও অঞ্জলির মধ্যে এমন কিছু আছে, যা ওদের নেই।"

ধীরে ধীরে প্রবীর ও অঞ্জলির মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু তাতে প্রবীরের পরিবারের সবাই যারপরনাই অবাক ও বিরক্ত হয়েছে। অঞ্জলিকে বিয়ের প্রসঙ্গ উঠতে ভাইকে বোঝাতে প্রবীরের দাদা পরিবারগত ও সমাজগত বৈষম্যকে তুলে ধরতে চেয়েছে। ধীরে ধীরে ঘটনাধারায় প্রবীর ও অঞ্জলি দূরে সরে গেছে, তাদের সম্পর্ক মধুর পরিণতি আর লাভ করেনি।

প্রকৃতপক্ষে লেখক এই কাহিনির মধ্য দিয়ে বর্তমান কালে একমাত্র অর্থনৈতিক কৌলীন্যই যে প্রধান হয়ে উঠেছে সেই দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। রূপ-সৌন্দর্য, জন্মগত জাতিবিচার, প্রেম-ভালোবাসা সব কিছুই অর্থনৈতিক বৈষম্যের কাছে বলিপ্রদত্ত। অর্থনৈতিক মানদণ্ড সামাজিক অবস্থানকে নির্ধারণ করে আর সেই অবস্থানে পার্থক্য থাকলে অন্য কোনো কিছুর সমতাই সেখানে সাম্য আনয়নে সক্ষম হয়না। অর্থের অসাম্যই দুই প্রণয়োন্মুখ হৃদয়কে দূর করে দিয়েছে, অর্থের বর্ণেই অঞ্জলি

অসবর্ণ হয়ে পড়েছে। জাতিগত সাম্য থাকলেও অঞ্জলি বিবেচিত হয়েছে 'পচা শামুক' রূপে। মানবিক সম্পর্ককে এখানে অর্থনীতি ও সামাজনীতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন লেখক, আর নামকরণেও সেই ইঙ্গিত রেখে দিয়েছেন।

এইভাবে দেখা যায় নরেন্দ্রনাথ তাঁর গল্পের নামকরণের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রীতির আশ্রয় নিয়েছেন, কিন্তু সেই নামকরণ নিছক গল্পগুলিকে পৃথক পরিচিতি দান করবার জন্য নয়। সেই নামকরণ যেন গল্পগুলিতে প্রবেশ করবার প্রথম চাবিকাঠি। সবক্ষেত্রেই গল্পের মূল বিষয় ও মূল treatment -এর সঙ্গে তার আশ্চর্য যোগ পরিলক্ষিত হয়। নরেন্দ্রনাথের এমন কিছু গল্প আছে যেগুলির নামকরণ একই। বেশ কয়েক বছরের ব্যবধানে রচিত এই গল্পগুলিতে নামকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। 'চোর' নামে তাঁর তিনটি গল্প রচিত হয়েছে। এই গল্পগুলি রচনার সময়ের মধ্যে ব্যবধান বেশ কয়েক বছরের। প্রথম গল্পটি প্রকাশিত হয়েছে মাঘ ১৩৫১ তারিখে, দ্বিতীয়টি পূজা সংখ্যা ১৩৬৬ তারিখে, শেষের 'চোর' গল্পটি পাই বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫ তারিখে। এমনভাবে আরও বেশ কয়েকটি সম নামের গল্পের কথা উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব।

১. 'রূপলাগি' (প্রকাশ ১৩৬৮) (পূর্বনাম—'রূপ না দিলে যদি')

২. 'রূপলাগি' (প্রকাশ চৈত্র ১৩৬৩) (পূর্বনাম—'রূপ')

৩. 'রূপ' (অগ্রহায়ণ ১৩৭৪)

৪. 'সেইমুখ' (ফাল্গুন ১৩৫৩) (পূর্বনাম—'রূপ')

৫. 'খুঁৎ' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০)

৬. 'খুঁৎ' (বৈশাখ ১৩৬৮)

৭. 'সন্ধান' (১৩৬১)

৮. 'সন্ধান' (১৩৬৬)

৯. 'জাল' (শ্রাবন, ১৩৫৭)

১০. 'জাল' (পূজাসংখ্যা, ১৩৬৪)

১১. 'ফেরিওয়ালা' (বৈশাখ, ১৩৫৬)

১২. 'ফেরিওয়ালা' (ভাদ্র ১৩৮২)

গল্পের সূচনা

ছোটগল্প তার সূচনা থেকেই অনিবার্য গতিতে ছুটে চলে পরিণতির দিকে, তাই গল্পের সূচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশিষ্ট সমালোচকের মতে গল্পের সূচনা বাক্যটিই হবে গল্পের রসনিস্পত্তির ইঙ্গিতবাহী। অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে গল্পের সমাপ্তির মত গল্পের সূচনাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সূচনা-সমাপ্তি ও তার মাঝখানের অংশ অর্থাৎ গল্পের গড়ে ওঠার অংশ —এই তিনটি অংশ নিয়েই ছোট গল্পকে সূচনা-মধ্যভাগ ও সমাপ্তি এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। অবশ্য প্রতিটি ছোট গল্পেই যে এমন সুস্পষ্টভাবে এই তিনটি অংশ বর্তমান থাকবে তার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। আধুনিক জীবনের বিচিত্র জটিলতাকে প্রকাশ করতে গিয়ে ছোটগল্পও বিচিত্র পথানুসারী হয়েছে ফলে ছোটগল্পের গঠন কৌশলও ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে। নরেন্দ্রনাথের ছোটগল্প আলোচনার মাধ্যমে দেখা যেতে পারে তিনি তাঁর গল্পের সূচনার ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পের সূচনা অনেক ক্ষেত্রেই করেছেন বর্ণনামূলক ভাবে। কখনও এই বর্ণনা পরিবেশ বা প্রতিবেশের আবার কখনও কোন চরিত্রের বর্ণনা সূচনা অংশ হিসেবে ব্যবহৃত।

"মহাশ্বেতা" গল্পের সূচনা অংশ এই রকম — "সদ্য চুনকাম করা দেয়ালগুলি শুধু শুভ্রই নয়, শূন্যও। একখানা ফটোগ্রাফ কিংবা ক্যালেন্ডার পর্যন্ত নেই। একপাশে একখানি তক্তপোশে বিছানা পাতা। সাদা চাদরটা মেঝে পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। পাশেই ছোট একটি টেবিলে দু-একখানা বইপত্র আর একটি ফুলদানিতে কয়েকটা চন্দ্রমল্লিকা। তক্তপোশের উপর পা-ঝুলিয়ে-বসা অমিতার দিকে আর একবার তাকাল চিন্মোহন। ঘরের মতই নিরাভরণ শুভ্র ওর সজ্জা।"

গল্পের শুরুতেই যে শুভ্রতা ও শূন্যতার বিবরণ পাওয়া যায় তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই গল্পের নায়িকা অমিতার বেশবাসও শুভ্র ও আভরণ শূন্য। অথচ তার মন আর শুভ্র ও শূন্য নেই, সেখানে চিন্মোহনের ভালোবাসার রং লেগেছে। অমিতার এই শুভ্র বেশই চিন্মোহনকে আকৃষ্ট করেছিল অমিতার প্রতি। উভয়েই একসময় অপেক্ষা করেছে কবে এই শুভ্র বৈধব্যের বেশের পরিবর্তন ঘটবে, কিন্তু যখন মহাশ্বেতা-রূপ অমিতার শুভ্রবেশের পরিবর্তন ঘটছে, বৈধব্যের বেশ পরিবর্তন করে অমিতা নববধূর সাজে সজ্জিত হয়েছে তখন সেই রঙিন রং -এর বাহার চিন্মোহনের কাছে অশ্লীল বলে মনে হয়েছে। তার কাঙ্খিত মহাশ্বেতা রূপ রঙিন অমিতার মধ্যে সে খুঁজে পায়নি। চিন্মোহনের স্বপ্নভঙ্গে বেদনার্ত ও রিক্ত হয়ে পড়েছে অমিতাও। অর্থাৎ যখন অমিতার সাজ-সজ্জা ছিল শুভ্র তখন তার মন ছিল রঙিন কিন্তু যখন তার সাজ-সজ্জা রঙিন হয়েছে তখন তার মন — "এই বিচিত্র বর্ণবাসের অন্তরালে তার মন মরুভূমির রিক্ততায় ধূ ধূ করছে।" এখানে গল্পের এই Climax -এর প্রস্তুতি গ্রহণে গল্পের প্রথম পরিচ্ছদেটি

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গল্পের প্রথম বর্ণনা অংশে শ্বেত ও শুভ্র শব্দের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার গল্পের নায়িকার নিঃসঙ্গতার ও ভয়াবহ শূন্যতার অনুভূতিকে প্রকাশ করেছে। গল্পের শেষ অংশে এসে সেই শূন্যতার অনুভূতির যথার্থ উপলব্ধি হয়েছে অমিতার। এই অনুভূতিলাভের মূহূর্তেই গল্প তার শীর্ষ বিন্দুতে উপনীত হয়েছে তথা গল্প সমাপ্ত হয়েছে। আর গল্পের এই সমাপ্তির ক্ষেত্রে গল্পের সূচনা অংশের মাহাত্ম্য অনন্য সাধারণত্বে মণ্ডিত।

"প্রতিদ্বন্দ্বী" গল্পের শুরুতে নরেন্দ্রনাথ নায়িকা রেবার বর্ণনা দিয়েছেন। তার সৌন্দর্য ও আচরণের বর্ণনা করেছেন ছোট পরিচ্ছদে — "খুশিতে রেবার মুখ আরও সুন্দর দেখায়। দোতলা বাড়িটার সমস্ত ঘরগুলি, ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র সে ঘুরে ঘুরে দেখে। কখনো বা জানালা দিয়ে চেয়ে দেখে বাইরের চলন্ত জনস্রোত, কখনো বা ফুলের টবগুলি হাত দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।" সূচনার এই বাক্যগুলিতেই স্পষ্ট হয় রেবার প্রাণোচ্ছলতা, তার চঞ্চলতা ও অস্থিরতা। এই চপল-চঞ্চল, সকল বিষয়ে কৌতূহলী চরিত্রের বিপরীতে অবস্থান করেছেন তার স্বামী শিল্পি অবিনাশ। বিখ্যাত ভাস্কর্য শিল্পি অবিনাশের স্বভাব রেবার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সে বয়স্ক, ভাবুক, স্থিতধী। স্বামী-স্ত্রীর এই বৈপরীত্যই 'প্রতিদ্বন্দ্বী' গল্পের মূল সংকটকে গড়ে তুলেছে। তাই অবিনাশের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে রেবার প্রাণচাঞ্চল্যকে লেখক গল্পের সূচনা অংশে ব্যবহার করেছেন।

'চোর' গল্পের সূচনায় লেখক একটি পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়েছেন — "ঘরে ঢুকে গা থেকে চাদরটা খুলে অমূল্য বিছানার উপর রাখল, তারপর পকেট থেকে সরু লম্বা সাইজের একটা সাবানের বাক্স আর এক কৌটা স্নো বার ক'রে স্ত্রীর সামনে ধ'রে বলল, নাও তুলে রাখো'।

রেণু হাতখানা বাড়িয়েই তাড়াতাড়ি আবার সরিয়ে নিল, যেন সাপের গায়ে হাত দিতে যাচ্ছিল সে।"

এই সূচনা অংশে অমূল্যের আচরণের সঙ্গে গল্পের নামকরণ মিলিয়ে পড়লেই আমাদের উপলব্ধিতে ধরা পড়ে অমূল্যের চরিত্রটি। এই সূচনা অংশ থেকেই আমরা উপলব্ধি করি অমূল্যর প্রবৃত্তি নীচ, ছোট। চৌর্যবৃত্তি তার পেশা না হোক নেশা। "যেন সাপের গায়ে হাত দিতে যাচ্ছিল সে" — এই অংশ থেকেই বুঝতে পারি রেণু তার এই কাজ সমর্থন তো করেই না বরং ঘৃণার চোখে দেখে। এই সূচনা অংশ থেকেই গল্প অনিবার্য গতিতে ছুটে গিয়েছে তার শীর্ষবিন্দুর দিকে। যখন রেণু সত্য সত্যই অমূল্যের যথার্থ সহধর্মিণী হয়েছে, চুরি করে এনেছে বিনোদবাবুর হাত ঘড়ি, তখন স্ত্রীর এই কাজ অমূল্যকে উল্লসিত করেনি বরং পৃথিবী তার কাছে শ্রীহীন হয়ে গেছে। এতদিন ধরে সে প্রত্যাশা করেছে যে, রেণুও হাতসাফায়ের কাজে তাকে সাহায্য করুক কিন্তু তার প্রত্যাশা সফল হবার পর রেণুর সেই পতন তার কাছে সহ্য হয়নি। অমূল্য স্ত্রীর বাহুবেষ্টনের মধ্যে আড়ষ্ট হয়ে থেকেছে — "পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত

মাধুর্য যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর যে চির-পরিচিত দু'খানি হাত তার কণ্ঠ জড়িয়ে রয়েছে তা কোন সুন্দরী তরুণীর কঙ্কণ-কৃণিত মৃনালভুজ নয় — তাও আজ শ্রীহীন, কলঙ্কিত।"

গল্পের শেষাংশে রেণুর পতনে অমূল্যের মানসিক অবস্থার বর্ণনায় গল্প যখন শীর্ষবিন্দুতে উপনীত হয়েছে তখন গল্পের সূচনার পংক্তিগুলি যেন এই আকস্মিকতাকে আমাদের মনে আরও গভীরভাবে আঘাত করবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয়। এছাড়া গল্পের সূচনার এই অংশ গল্পের শুরুতেই গল্পের প্রধান দুই চরিত্র ও তাদের পরিণতি সম্পর্কে আমাদের উৎসাহিত করে তোলে।

কোন কোন ক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথ প্রতিবেশ বর্ণনার মধ্য দিয়ে গল্পের সূচনা করেছেন। 'পতাকা' গল্পটির সূচনার ক্ষেত্রে এই প্রতিবেশ বর্ণনার দিকটি উদ্‌ভাসিত — "উদ্যোগ আয়োজন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। স্বাধীনতা দিবসের কার্যসূচির একটা ছক কেটে রেখেছেন শচীবিলাস। গাঁয়ের নানা বয়সী উৎসাহী ছেলেদের আনাগোনার বিরাম নেই। ঝাড় থেকে বেছে বেছে সবচেয়ে লম্বা এবং সবচেয়ে সোজা একটি তল্লা বাঁশ কেটে আনা হয়েছে। নমঃশুদ্র পাড়ার গগন ঘরামি তার ধারাল দাঁ নিয়ে নিখুঁতভাবে ছোট ছোট গিঁটগুলি চেঁছে সমান করে দিয়েছে বাঁশটির।"

একই ধরনের সূচনা পরিলক্ষিত হয় 'স্রোতস্বতী' গল্পে — "পাড়াটা দেখতে দেখতে কিরকম ভরে উঠেছে। রাস্তার দুদিকে একটু জায়গাও আর খালি পড়ে নেই। সব দোতালা তিনতালা বাড়ি উঠে গেছে। নতুন নতুন বাড়ি আরও উঠছে। আর সে সব বাড়ি শেষ হতে না হতে ভাড়াটে এসে যাচ্ছে। প্রতিদিন না হোক প্রতিমাসেই নতুন নতুন লোক আসছে পাড়ায়। নতুন নতুন মুখ রাস্তায় নামলেই চোখে পড়ে। বাসস্টপে দাঁড়ালেও অনেক অদেখা মানুষ অচেনা মানুষ দেখা যায়।"

নরেন্দ্রনাথ তাঁর কোন কোন ছোটগল্পের সূচনা করেছেন চরিত্রের পরিচয় দিয়ে। দু-এক পংক্তিতে চরিত্রটির পরিচয় দিয়ে চরিত্রটির প্রতি আমাদের আগ্রহ সৃষ্টি করেছেন গল্পের শুরুতেই। 'কুশল' গল্পটির কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। বাল্যবন্ধু কুশলকে নিয়ে রচিত গল্পটির সূচনা হয়েছে এইভাবে— "তার আসল নাম ছিল কুশল সাহা। কিন্তু সবাই তাকে ডাকত বোকা কুশা, কি কুশা বোকা।" এই ধরনের চরিত্রের বর্ণনা দিয়ে গল্পের সূচনা আমরা পাই আরও বেশ কিছু গল্পে। যেমন —

১) "আজ প্রথম নয়, গত দশ-বারো বছর ধরে, গোবিন্দ আমার দাক্ষিণ্যপ্রার্থী। তখন আমি আর — একটি ছোট কাগজের অফিসে কাজ করতাম। গোবিন্দ সেই অফিসের বেয়ারা ছিল। তখন থেকেই ওর মাথার চুল আধপাকা, চেহারা জীর্ণ। জরায় নয়, অভাবে অনটনে দারিদ্র্যে দুশ্চিন্তায়।" ('সীমান্ত')

২) "প্রদীপের বউ দেখে সবাই খুশি হলো। অনীতা বেশ সুন্দরী। লম্বা ছিপছিপে চেহারা। গায়ের রঙ চাঁপা ফুলের মত না হলেও তার কাছাকাছি যায়। বি এ পাশ করেছে। প্রদীপ আলাপ করে দেখেছে তার পরিচিত আরো অনেক গ্রাজুয়েট ছেলে মেয়ের চেয়ে অনীতার বুদ্ধি শুদ্ধি সাধারণ জ্ঞান বেশ

বেশি।"('চুম্বন')

৩) "ক্লাস সিক্সে অঙ্ক কষিয়ে টিচার্স রুমে ফিরে এল ননীমাধব, ছেলেগুলি বড় দুষ্টু অশান্ত। বড্ড বেশি গোলমাল করে। বিশেষ করে ননীকে দেখলে ওরা যেন পেয়ে বসে। মোটেই ইমপ্রেসিভ চেহারা নয় ননীর। ছোট খাটো মানুষ। রোগাটে ও একটু তোতলামি আছে। ছেলেরা সেই দুর্বলতার সুযোগ নিতে ছাড়ে না।" ('ঊর্ধ্বলোক')

৪) ভদ্রলোকের সঙ্গে মাঝে মাঝে এখনো দেখা হয়। কি দরকারে যেন আমাদের অফিসে তিনি কখনো কখনো আসেন। দীর্ঘাঙ্গ, শ্যামবর্ণ, সুদর্শন পুরুষ। অবশ্য তাঁর রূপটা আর এখন স্পষ্ট করে চোখে পড়ে না। ভদ্রলোক প্রৌঢ়ত্ব পার হয়ে বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে গেছেন। বয়স কত হবে ? পঁয়ষট্টি থেকে সত্তরের মধ্যে বলেই তো মনে হয়।" ('স্মারক')

পরিবেশ, প্রতিবেশ বা কোনো চরিত্রের মধ্য দিয়ে বহু গল্পের সূচনা হলেও নরেন্দ্রনাথের অধিকাংশ গল্পই শুরু হয়েছে একটি কি দুটি বাক্যের একটি অনুচ্ছেদ দিয়ে, কখনও তা কোনও প্রত্যক্ষ সংলাপ কখনও বা একটি নির্দিষ্ট ক্ষণের বর্ণনা, যার শুরু অনেকটা কথকতার ভঙ্গিতে। প্রত্যক্ষ সংলাপ দিয়ে সূচনা হয়েছে এমন গল্পগুলির মধ্যে 'দ্বিচারিণী' গল্পের সূচনা এইরকম — "অ বউঠাইরেন, শোনেন, এইডা কি তেত্রিশ নম্বরের বাড়ি।" 'ক্ষতিপূরণ' গল্পের প্রারম্ভিক অংশ — "বউদি, এই নিন আপনার বই। তিন তিন খানা আনকোরা উপন্যাস, মাথা-ধরা আর অনিদ্রা রোগের অব্যর্থ ওষুধ।" 'ফটো' গল্পের সূচনাও এই রকম এক প্রত্যক্ষ সংলাপে — "স্যার, আপানার এই ফটোখানি সত্যই খুব ভালো হয়েছে।"

প্রত্যক্ষ সংলাপের দ্বারা সূচনা ছাড়া নরেন্দ্রনাথের অনেক গল্পই শুরু হয়েছে ছোট অনুচ্ছেদে, গল্প বলার ভঙ্গিতে। যেমন, 'গোঁয়ার', 'দম্পতি', 'বনভোজন', বা 'মৃত্যু' গল্পটি। এই গল্পগুলির সূচনা অংশটি এইরকম -

১) "ঘাঁড় গুঁজে ইংরেজি টেলিগ্রাফ বাংলায় তর্জমা করছিলাম। হঠাৎ কাঁধে চাপড় পড়ায় চমকে উঠলাম। দেখি আমার ছেলে বেলার সেই স্কুলের সহপাঠি রাজেশ্বর চক্রবর্তী।" ('গোঁয়ার')

২) "সর্বাণী চাটুজ্যের সঙ্গে উৎপল সোমের বিয়ের খবর যখন বন্ধুমহলে প্রচারিত হল কেউ বিস্ময় জানাল, কেউ পরিহাস করল, কেউ বিরক্ত হল, ব্যথিত হওয়ার মতো বন্ধুর সংখ্যাও নিতান্ত কম হল না।" ('দম্পতি')

৩) "বাসটা বাগান বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াবার পর গোলমালে কি ঝাঁকুনিতে শঙ্করের তন্দ্রা ভেঙে গেল। সে নড়চড়ে সোজা হয়ে বসে বলল, 'আমরা পৌঁছে গেছি তাহলে' ?" ('বনভোজন')

৪) "টেলিফোনেই প্রথম খবরটি পেলেন প্রণবেশ। বেলা দুপুর গড়িয়ে গেছে। স্নান করে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা আঁচড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ ফোনটি এল, 'আপনি প্রণব রায়' ?" ('মৃত্যু')

গল্পের সূচনার এই সকল বিচিত্র পদ্ধতির মধ্যে কখনও দেখা যায় গল্পের সূচনা হয়েছে ঘটনাধারার মাঝখান থেকে। এমন সূচনার পর অতীত ঝলক বা Flash Back এর মধ্য দিয়ে পূর্ববর্তী ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তারপর ঘটনা ধারা অগ্রসর হয়েছে কাঙ্ক্ষিত পথে। আবার কখনও গল্পের সূচনা হয়েছে ঘটনা ধারার শেষ থেকে আর তারপর পুরো ঘটনাই অতীত ঝলকের মধ্য দিয়ে অথবা স্মৃতি রোমন্থনের পথে উঠে এসেছে। 'রস' গল্পের সূচনা হয়েছে কাহিনির মধ্যস্থান থেকে, সেই সূচনা আকস্মিক কিন্তু অত্যন্ত সরল গদ্যে বর্ণিত — "কার্ত্তিকের মাঝামাঝি চৌধুরীদের খেজুর বাগান ঝুরতে শুরু করল মোতালেফ। তার পর দিন পনের যেতে না যেতেই নিকা করে নিয়ে এল পাশের বাড়ির রাজেক মৃধার বিধবা স্ত্রী মাজুখাতুনকে।" এরপর অতীত ঝলকে পূর্বের ঘটনা ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়েছে। অপর দিকে 'অসবর্ণা' গল্পের শুরু হয়েছে ঘটনাধারার শেষাংশ থেকে, তার পর পুরো ঘটনাই স্মৃতি রোমন্থনের পথে প্রকাশিত হয়েছে। এই গল্পের সূচনা অংশ এইরকম — "আজ আবার একতলার অঞ্জলিদের ঘরে পুলিশ এসে হানা দিয়েছিল। আধঘণ্টা যাবৎ ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র তছনছ করে অঞ্জলির ছোটভাই হাবুলকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে। সেদিনের মত আজও পুলিস-সাব্-ইনস্পেক্টরের অনুরোধে সার্চ লিস্টে আমাকে সই করতে হয়েছে। বিনিময়ে আমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য দুঃখ জ্ঞাপন করে তিনি আমার সামনে সিগারেট কেস খুলে ধরে মৃদু হেসে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।"

'অপঘাত' গল্পের সূচনা হয়েছে একটি ভয়াবহ সংবাদ বা তথ্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে, তার পর ফ্ল্যাশব্যাক বা অতীত ঝলকের মধ্য দিয়ে সেই ভয়াবহ ঘটনার কারণ ও সূচনার অনুসন্ধান করা হয়েছে। যেমন — "সারা মহকুমা শহরটি সরকারী হাসপাতালের সমুখে এসে ভেঙ্গে পড়ল। একটু আগে খবর পাওয়া গেছে ভুখা মিছিলের ওপর পুলিশের লাঠি চার্জের ফলে যারা গুরুতর রকমে জখম হয়েছিল তাদের মধ্যে হরপ্রসন্ন হাইস্কুলের মাস্টার সুধীর দাসের স্ত্রী, বেলা দাস মারা গেছেন। আরো দু'তিনজনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক।" — এই অংশটি পড়লে মনে হয় যেন সংবাদপত্রের প্রতিবেদন রচিত হয়েছে। এই সংবাদ পরিবেশনের পর বেলাদেবীর পূর্বের জীবন ও কর্মপ্রবণতার বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে।

একটু পৃথক ধরনের সূচনা আমরা পাই 'দ্বিরাগমন' গল্পে, যদিও এই গল্পেরও সূচনা হয়েছে তাৎক্ষণিক পরিস্থিতি বর্ণনার মধ্য দিয়ে। গল্পের সূচনা হয়েছে কথকথার ভঙ্গিতে আর এই ভঙ্গিটি নরেন্দ্রনাথের একটি বহু ব্যবহৃত কৌশল — "বছর সাতেক আগে পূর্ববঙ্গের একটি মহকুমা শহরে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছিলাম। ঘটনা না বলে তাকে দৃশ্য বলাই ভালো কেননা, কোন প্রসঙ্গে সেইঘটনার কথা মনে হলে আজও ছবির মত তা আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।" এইভাবে গল্প বলার ভঙ্গিতে প্রথমে একটি দৃশ্য ফুটে উঠেছে। কিন্তু সে দৃশ্যটি লেখক দেখেছেন আর তার পূর্বের ঘটনা লেখক শুনেছেন তার বন্ধু যতীশের কাছে। উত্তমপুরুষীয় রীতিতে লেখা এই গল্পের দ্বিতীয় অংশটির সূচনা

হয়েছে এই ভাবে — "ছেলেবেলা কুসুম আর রোশেনা আমার কাছে পড়ত।" অতএব দেখা যায় গল্পের মূল সূচনা হয়েছে একটি তাৎক্ষণিক পরিস্থিতি বর্ণনার মধ্য দিয়ে আর গল্পের মধ্যে যে গল্পটি লুকিয়ে আছে তার সূচনা হয়েছে পূর্বসূচিত ঘটনার বর্ণনার মধ্য দিয়ে। গল্পটির সমাপ্তিতে গল্পলেখকের বন্ধু, যিনি কাহিনির যে অংশ লেখকের অজ্ঞাত ছিল তা লেখককে জানিয়েছেন এবং যিনি লেখক বর্ণিত গল্পাংশের একজন চরিত্রও বটে, তার সঙ্গে গল্পের মূল পাত্রী কুসুমের একটি অনুমোচিত সম্পর্কের ইঙ্গিত আছে। সেই ইঙ্গিতটিই গল্পের শীর্ষবিন্দু বা Climax। এই গল্পের শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করার জন্য গল্পের গড়ে ওঠার অংশটি বিশেষ আলোকপাত করতে পারে না ঠিকই কিন্তু গল্পের সূচনা অংশের স্থানেই গল্পের এই পরিসমাপ্তির ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে — তা স্বীকার করতে হয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে লেখক থাকবেন শ্রোতার ভূমিকায় আর তাঁর কোনো বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তি কোন একটি প্রসঙ্গ উত্থাপনের মধ্যে দিয়ে একটি গল্পের সূচনা করবেন — এই পদ্ধতি নরেন্দ্রনাথের অতিপ্রিয় ও সুপরিচিত গল্প প্রারম্ভের কৌশল। এই পদ্ধতিতেই নরেন্দ্রনাথের সর্বাধিক গল্পের সূচনা হয়েছে। 'সংস্কারক' গল্পটির সূচনা অংশ উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় — "লেকের ধারে খানিকক্ষন ঘুরে বেড়ালাম আমরা। আমি আর আমার সদ্যোলব্ধ বন্ধু সুধাবিন্দু রায়। আমার এই বন্ধুটি চক্রাকারে ভ্রমণ ভালবাসেন না ....." এইভাবে লেখক ও সুধাবিন্দুবাবুর বার্তালাপ হয়েছে এবং এর জন্য লেখক সুদীর্ঘ একটি পরিচ্ছদ রচনা করেছেন। এই অনুচ্ছেদের শেষ বাক্যটি হল — "সুধাবিন্দুবাবু বলতে লাগলেন।" — এরপর গল্পের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ থেকে মূল কাহিনি অংশের সূচনা হয়েছে আর এই সূচনা অংশও হয়েছে উত্তমপুরুষীয় রীতিতে, সুধাবিন্দুবাবুর জবানিতে — "আমার ভাগ্নে সরোজের কথা। ওই বাপ-মা-মরা ছেলেকে সাত বছর বয়স থেকে আমি মানুষ করেছি। ওর ভরণপোষণের ভার যখন নিলাম আমার নিজের ঘাড় তখনও শক্ত হয়নি।" প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, এই সবক্ষেত্রে লেখক নিজের যে চরিত্রটি উপস্থাপন করেন বা নিজের যে প্রতিমূর্তিটি শ্রোতার ভূমিকায় অবতীর্ণ করেন সেই চরিত্রটিও একজন সাহিত্যিক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার নাম কল্যাণ। এই সাহিত্যিক ব্যক্তিটি শ্রোতা হিসেবে অন্য কোনো ব্যক্তির গল্পকে **সর্বজ্ঞরীতিতে** প্রকাশ করেন এবং সেই বন্ধুস্থানীয় বা পরিচিত ব্যক্তিটিই হন গল্পের কথক। ফলে গল্পের সূচনা আর গল্পের মূল কাহিনি অংশের সূচনা অনেক ক্ষেত্রেই পৃথক হয়ে যায়। কেবল কথক ব্যক্তি কোনো চরিত্র হিসাবে বা কাহিনির দ্রষ্টা হিসাবে গল্পের সূচনা ও মূল কাহিনির মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বক্তা ও শ্রোতার সাক্ষাৎ হওয়া বা যে পরিস্থিতিতে গল্পের সূচনা হয় তার সঙ্গে মূল কাহিনি অংশের যোগসূত্র থাকে।

বক্তা ও শ্রোতা এবং কথকের মুখে গল্পের সূচনা হয়েছে যে সব গল্পে তার মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্নধারার সূচনা লক্ষ করি 'জৈব' গল্পে। এই গল্পের সূচনা হয়েছে রেডিওতে প্রচারিত একটি বক্তৃতার মধ্য দিয়ে

— "..... সুতরাং হেরেডিটি বা বংশানুক্রমণ সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে যে প্রচলিত ধারনা আছে তার ভিত্তি এবং সত্যতা আমাদের বিচার ক'রে দেখতে হবে। প্রকৃতপক্ষে পিতামাতা এবং ঊর্ধ্বতন পিতৃকুল মাতৃকুলের শারীরিক গঠন বিন্যাস থেকে সুরু করে মানসিক গুণাগুণ, বৃত্তি-প্রবৃত্তির কতখানি অংশ বংশানুক্রমের সূত্রে উত্তর পুরুষ এসে পৌছতে পারে" এই বক্তৃতা শ্রবণ করে বক্তৃতাকারী সম্পর্কে গল্পের কথক নিজের অভিজ্ঞতা লেখককে বিবৃত করেছেন।

এইভাবে দেখা যায় নরেন্দ্রনাথ তাঁর গল্পের সূচনার ক্ষেত্রে বহু বিচিত্র পন্থা অনুসরণ করেছেন, কখনও কোনো চরিত্রের বর্ণনা দ্বারা, কখনও পরিবেশ বা প্রতিবেশ বর্ণনার দ্বারা কখনও বা কোনো তাৎক্ষণিক ঘটনা বা তাৎক্ষণিক অথচ পূর্বসূচিত ঘটনার মধ্য দিয়ে। কখনও তিনি গল্পের সূচনা করেছেন কাহিনির মধ্যস্থল থেকে আবার কখনও কাহিনির শেষাংশ থেকে। কোন কোন গল্প প্রারম্ভ হয়েছে সংলাপের মধ্য দিয়ে। তবে যে পদ্ধতিটি তিনি সর্বাধিক ব্যবহার করেছেন তা হল গল্পটিকে কোনো কথকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা। যে সকল ক্ষেত্রে তিনি গল্প রচনার রীতিকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করেছেন সেখানে গল্পের সূচনাও বদলে গেছে যেমন 'ধূপকাঠি' গল্পটি। গল্পটি রচিত হয়েছে একটি চিঠির আদলে, তাই এর সূচনা অংশ এই রকম — "মান্যবরেষু, আমি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিতা" তবে এই ধরনের গল্প এবং সূচনা নরেন্দ্রনাথের গল্পের সুবিশাল ভাণ্ডারে সুলভ নয়।

'ধূপকাঠি' — গল্পের মতই সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতির প্রয়োগ দেখা যায় 'উন্মোচন' গল্পটিতে। স্বভাবতই সেখানেও সূচনা অংশ বিশেষ বৈশিষ্টপূর্ণ।গল্পটি লেখা হয়েছে ডায়ারির আদলে, তাই সূচনায় একটি তারিখ ও তারপর দিনলিপির ধাঁচে গল্প সূচনা হয়েছে —

"১৬ই জুলাই, ১৯৬৮

আশ্চর্য, ওরা শেষ পর্যন্ত আমাকে পাগলা গারদে এনে ছেড়ে দিল।"

'মিশ্ররাগ' গল্পের সূচনায় দেখা যায় কাহিনির এক চরিত্র গল্প লেখককে একটি প্রশ্ন করেছে আর তারপর সমগ্র গল্প জুড়ে সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার ঢঙে পুরো কাহিনি বিবৃত হয়েছে। গল্পটিতে প্রথমে উত্তমপুরুষীয় রীতির বর্ণনা থাকলেও গল্পের মূল কাহিনি বিবৃত হয়েছে সর্বজ্ঞরীতির মাধ্যমে। গল্পের সূচনা অংশ এই রকম — "আচ্ছা প্রিয়তোষ, দুধে জল মিশিয়ে গয়লা কোনদিন খুব দুঃখ পেতে পারে একথা তুমি বিশ্বাস করো ?" — প্রশ্নটি যে করেছে সে নিজে একজন গয়লা এবং সে দুধে জল মিশিয়ে দুঃখ পেয়েছে বলেই বন্ধু প্রিয়তোষকে এই প্রশ্ন করেছে। এরপর প্রিয়তোষের জবানিতে সদানন্দের দুধে জল মিশিয়ে দুঃখ পাবার কাহিনি বিবৃত হয়েছে।

।। গল্পের গঠনকৌশল ।।

এর পূর্বে নরেন্দ্রনাথের গল্পের সূচনা ও সমাপ্তি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেই আলোচনায় একটি বিষয় স্পষ্ট যে, গল্পের সূচনায় লেখক যতখানি স্বাধীনতা উপভোগ করেন গল্পের সমাপ্তির ক্ষেত্রে সেই স্বাধীনতা অনেকটাই খণ্ডিত।তার কারণ, সূচনা ও গল্পের মধ্যভাগ যদি তার অনিবার্য পরিসমাপ্তিতে যথাযথ রস সংবেদনা সৃষ্টি করতে অসমর্থ হয়, তবে গল্পের মূল আবেদনটিই ব্যর্থ হয়। অতএব গল্পের পরিসমাপ্তি ও সূচনার ভারসাম্য রক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আর এই ভারসাম্য রক্ষা করে গল্পের মধ্যভাগ, যেখানে গল্প গড়ে উঠে এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে যাত্রা করে। এই কারণে গল্পের প্রকরণগত আলোচনায় গল্পের মধ্যভাগ বা গড়ে ওঠা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গল্পকার এই অংশে কাহিনি বিন্যাসের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন আর গল্পকারের কাহিনিবিন্যাসের এই কৌশলটিই গল্পের গঠনে রূপায়িত হয়। এ বিষয়ে আলোচক বলেন — "লেখক তাঁর গল্প বলবার সময় যে ঘটনার স্তর বিভাগের ও জাল বয়নের পরিকল্পনা করেন তাকেই আমরা বলি প্লট।"[৭]

প্রেক্ষণবিন্দুর মত গঠনের অভিনবত্বও গল্পে ভিন্নমাত্রা সংযোজন করে। প্রারম্ভিক ঘটনা বর্ণনা বা 'Initial incident', কাহিনির ক্রমবর্ধিষ্ণু ক্রিয়া বা 'Rising Action', শীর্ষবিন্দু বা সন্ধিকাল বা 'Climax' বা 'Critical Period', সমাপ্তির গতি বা 'Falling Action', এবং সমাপ্তি বা 'Catastrophe' এই পাঁচটি স্তর বা অংশে গল্পের কাহিনি বিন্যস্ত হতে পারে। তবে এটি কোনো বাধ্যতামূলক শর্ত নয়, লেখকের ব্যক্তিগত প্রয়োগ কৌশল ভিন্নতর ভাবে কাহিনি বিন্যাস করতেই পারে, তাতে গঠনকৌশল ব্যর্থ হয় না। তবে আলোচনার সুবিধার জন্য গঠনের এই ধ্রুপদী বিন্যাসের একটু পরিচয় দেওয়া হল। আধুনিক ছোটগল্প যেমন বিষয়ের দিক থেকে বিচিত্র পথানুসারী হয়েছে তেমনি Form বা বিন্যাস কৌশলেও এই বৈচিত্র্যের অনুসন্ধান পরিলক্ষিত হয়, ফলে আধুনিক ছোট গল্পের গঠনের ক্ষেত্রে আমরা ভিন্ন ভিন্ন ও বিচিত্র বিন্যাস কৌশল লক্ষ করি। উল্লিখিত পাঁচটি অংশ বিশিষ্ট নক্সাটি নিম্নরূপ হয়–

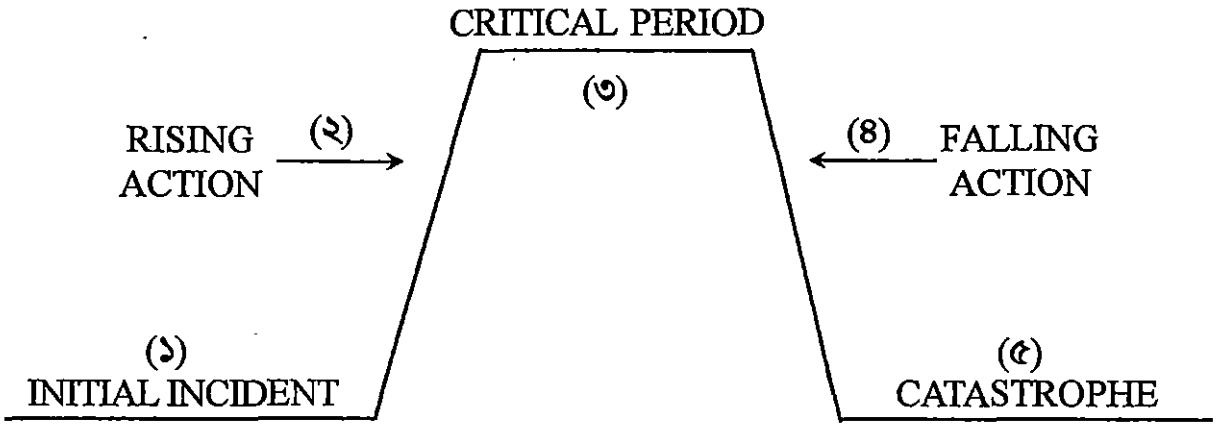

সাহিত্যের বহুপ্রচলিত এই প্লটটি অপরিবর্তনীয় তা নয়। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন গল্পে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বা স্থানে শীর্ষবিন্দু(Climax)- থাকতে পারে, ভিন্ন রকম ভাবে গল্পের অংশ গুলি বিন্যস্ত হতে পারে, অনেক ক্ষেত্রে কোন অংশ বিলুপ্তও হতে পারে।

অন্যান্য গল্পকারের মত নরেন্দ্রনাথও তাঁর ছোট গল্পের কাহিনি বিন্যাসে ভিন্ন ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছেন। গল্পের সাধারণ আদি-মধ্য-অন্ত বিশিষ্ট প্রচলিত প্লটের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পদ্ধতির প্রয়োগের সঙ্গে অতীত ঝলক বা ফ্ল্যাশব্যাক এবং ফ্ল্যাশ ফরোয়ার্ড পদ্ধতির প্রয়োগ করে গল্পের কাহিনি বিন্যাস করেছেন। এখন নরেন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্পের কাহিনিবিন্যাস আলোচনা করে তাঁর গল্পের গঠন কৌশলের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করা যেতে পারে।

নরেন্দ্রনাথের 'নেতা' গল্পটিতে পূর্বে উল্লিখিত গল্পের পাঁচটি অংশ সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে। প্রারম্ভিক ঘটনা অংশে সাধারণভাবে গল্পের স্থান, কাল ও পাত্রের একটি সাধারণ পরিচয় ফুটে উঠে। এ গল্পেও সূচনা অংশে এই পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে গল্পের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব নিহিত আছে তার আভাস পাওয়া গিয়েছে। এখন নেতা' গল্পের কাহিনিগত বিন্যাসক্রম দেখা যেতে পারে –

১. প্রারম্ভিক ঘটনা (Incidents) ঃ

স্থান ঃ যুদ্ধে সৈনিকদের ব্যবহার্য জিনিসপত্রের পরীক্ষার স্থান।

কাল ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল।

পাত্র ঃ চন্দ্র চাটুয্যে, ভট্টাচার্য ও অন্যান্য পরীক্ষক এবং ডসন, উইলসন প্রভৃতি শ্বেতাঙ্গ পরিচালকগণ।

গল্পের এই অংশে স্থান কাল পাত্রের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে গল্পের মূল দ্বন্দ্বের আভাস আছে।এক্ষেত্রে দেখা যায় কাজে ফাঁকি দিয়ে বাজে গল্প করবার জন্য শেতাঙ্গ ক্যাপ্টেন উইলসন চন্দ্র চাটুয্যের একদিনের মজুরি জরিমানা করেছে।

২. কাহিনির ক্রমবর্ধিষ্ণু ক্রিয়া (Rising Action) ঃ

সকল পরীক্ষকের প্রতিনিধি হয়ে ভট্টাচার্য গিয়েছে ডসনের কাছে দরবার করতে। চন্দ্র চাটুয্যের জরিমানা মকুব করা নিয়ে কর্মীদের দাবীতে শ্বেতাঙ্গ পরিচালক ও কর্মীদের মধ্যে বিরোধ ঘনীভূত হয়েছে। কর্মীরা কাজে বিরত থেকেছে।

৩. সন্ধিকাল (Critical Period) ঃ

ক্যাপ্টেনের সামান্য ভীতি প্রদর্শনে মেরুদণ্ডহীন পরীক্ষকের দল চন্দ্রচাটুয্যে প্রমুখের বিনা বাক্যব্যয়ে কাজে যোগদান। কেবল নিজের আদর্শে অনড় ভট্টাচার্যকে চাকরি থেকে বিতাড়নের আদেশ।

৪. সমাপ্তির গতি (Falling Action) ঃ

ডসনের সৌজন্যে ভট্টাচার্যের জেদ পরিত্যাগ ও কয়েকঘণ্টা সাসপেন্ড থেকে পরের দিন পুনরায় কাজে যোগদানের জন্য আপস করা।

৫. সমাপ্তি (Catastrophe) ঃ

ভট্টাচার্যের সিদ্ধান্তে অন্যান্য সহকর্মীদের হতাশা ও আশঙ্কা।

এইভাবে দেখা যায় নরেন্দ্রনাথ তাঁর 'নেতা' গল্পের বিন্যাসকৌশলে পঞ্চ অঙ্গের এই গঠন কৌশলকে ব্যবহার করেছেন। গল্পের পাঁচটি পরিচ্ছেদে প্লটের এই পাঁচটি অংশকে পৃথক ভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

'নেতা' গল্পের মত পঞ্চ অঙ্গের প্লট ও গল্পের কেন্দ্রস্থলে গল্পের শীর্ষবিন্দুতে উন্নয়ন লক্ষ করা যায় 'কাঠগোলাপ' গল্পেও। 'কাঠগোলাপ' গল্পের প্লটের স্তরবিন্যাস দেখানো যেতে পারে।

১. প্রারম্ভিক ঘটনা — নীরদ ও অণিমার কলকাতায় আগমনের পর, এদেশে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রচেষ্টা।

২. কাহিনির ক্রমবর্ধিষ্ণু ক্রিয়া —কলকাতায় অণিমার আচার ব্যবহার ও চাল চলনের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এবং টেলিফোন ব্যবহারের বাহুল্য।

৩. সন্ধিকাল — অফিসের টেলিফোন ব্যবহারের জন্য নীরদের অপমান ও চাকুরি পরিত্যাগ।

৪. সমাপ্তির গতি—নীরদ ও অণিমার কঠোরতর জীবন সংগ্রাম।

৫. সমাপ্তি — অণিমার কাগজের ঠোঙা তৈরির দ্বারা অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা ও নীরদের কাছে এ সত্যের উদ্‌ঘাটন।

এই গল্পের গঠনটি চিত্রের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে —

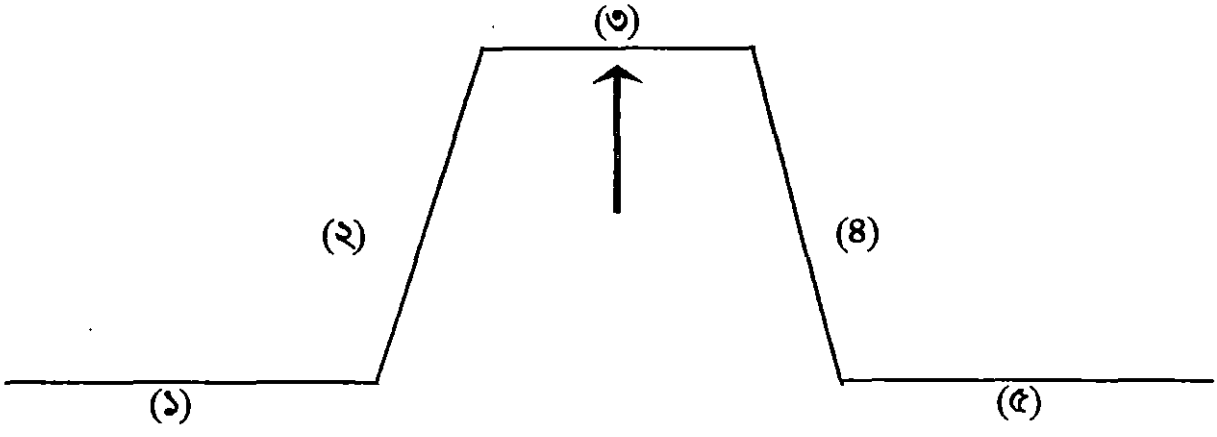

উপরোক্ত চিত্রের নক্সার ন্যায় গঠনসম্পন্ন আরেকটি গল্প হল 'বিকল্প'। 'বিকল্প' গল্পের পাঁচটি অঙ্ক ১ থেকে ৫ সংখ্যা উল্লেখ ক'রে দেখানো হল —

১. প্রারম্ভিক ঘটনা — হরগোবিন্দের কন্যা সুধা ও পুত্র হাবুলকে নিয়ে সুখের সংসার। কন্যা সুধার

জন্য হরগোবিন্দের ভাল ঘরে বিবাহের স্বপ্ন।

২. কাহিনির ক্রমবর্ধিষ্ণু ক্রিয়া — ভাই হাবুলের জন্য গৃহশিক্ষক হিসেবে ইন্দুভূষণের আগমন এবং ইন্দুভূষণের সঙ্গে সুধার প্রণয় সঞ্চার।

৩. সন্ধিকাল বা শীর্ষবিন্দু — সুধা ও ইন্দুভূষণের প্রণয়ে পিতা হরগোবিন্দের ক্রোধ, ইন্দুভূষণকে প্রহারের ব্যবস্থা, ফলস্বরূপ ইন্দভূষণের মৃত্যু।

৪. সমাপ্তির গতি — ইন্দুভূষণের মৃত্যুতে শোকাহত সুধার জীবন্মৃত অবস্থা।

৫. সমাপ্তি — অন্যত্র বিবাহের জন্য সুধাকে সম্মত করতে অসমর্থ ইন্দুভূষণের অসহায়তা ও শেষ পর্যন্ত পুত্র হাবুলের জন্য পুনরায় এক গৃহশিক্ষকের অন্বেষণ।

এইভাবে দেখা যায় 'নেতা', 'কাঠগোলাপ' ও 'বিকল্প' গল্পে নরেন্দ্রনাথ উপরোক্ত চিত্রের ন্যায় নক্সার গঠনের অবতারণা করেছেন যেখানে গল্পের তৃতীয় অংশে এসে কাহিনি তার শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছে।

'নেতা', 'কাঠগোলাপ' ও 'বিকল্প' গল্পে কাহিনি তার শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছে গল্পের মধ্যবর্তী অংশে। কাহিনি শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করবার পর এসব গল্পের ক্ষেত্রে কাহিনি পরিণতির পথে এগিয়ে গেছে। এ গল্পগুলি ব্যতীত নরেন্দ্রনাথের বহু গল্পে এমন বিন্যাস কৌশলের সন্ধান পাওয়া যায়, যেখানে দেখা যায় প্রাথমিক পরিস্থিতি বা প্রারম্ভিক ঘটনার পর কাহিনি শীর্ষবিন্দুতে উপনীত হবার পূর্ব পর্যন্ত বহু দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে এবং এই সকল দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়ে গল্পের কাহিনি ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছে। এ সকল গল্পের ক্ষেত্রে গল্পের শীর্ষবিন্দু লাভের পর গল্পের পরিণতির সূচনা হয়না বরং একেবারে শেষ অংশেই গল্প শীর্ষবিন্দুতে উপনীত হয়েছে। 'নাম', 'দীপান্বিতা', 'অবতরণিকা' প্রভৃতি গল্পের ক্ষেত্রে এমন সিঁড়ির ধাপের মত গঠন বা 'Stair Step Structure' - এর সন্ধান পাওয়া যায়। এই গল্পগুলির ক্ষেত্রে গঠনটি চিত্রের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে —

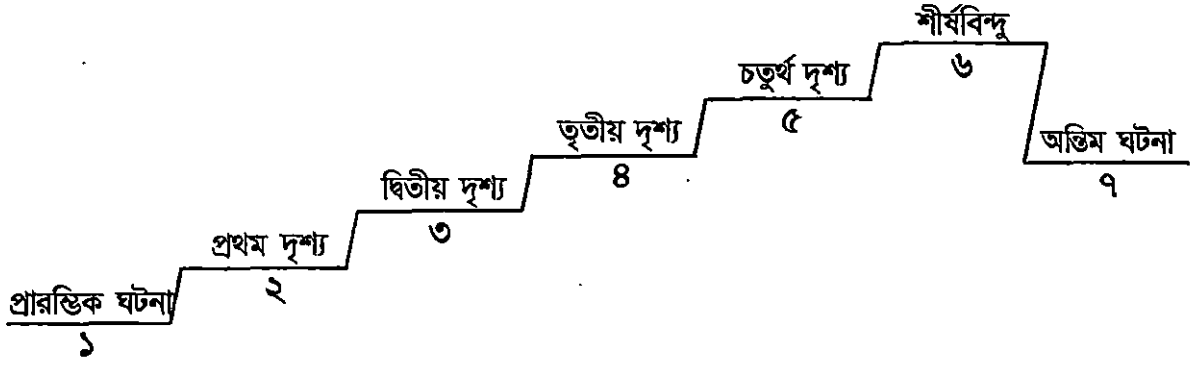

গঠন বিন্যাসের ক্ষেত্রে এমন প্লটের ব্যবহার কালে প্রারম্ভিক ঘটনা থেকে শুরু করে কাহিনি শীর্ষবিন্দুতে উপনীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যতগুলি দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে, গল্পের গঠন বিন্যাসের সিঁড়ির

ধাপও তত সংখ্যক হয়েছে।

'নাম' গল্পটির গঠন বিন্যাসকে এই সিঁড়ির ধাপের মতো ক'রে বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

'নাম' গল্পের প্রারম্ভিক পর্যায়ে রয়েছে স্থান, চরিত্র ও পরিবেশের বর্ণনা।

১. স্থান — লেখকের পৈতৃক বাড়ির গ্রাম।

২. চরিত্র — লেখক, তার স্ত্রী ও দুই বোন এবং কাজের মেয়ে রসো।

প্রথম দৃশ্য — মাস দুয়েকের জন্য পৈতৃক গ্রামে এসে কাজকর্মের লোকের অভাবে কথক ও তার পরিবারের সমস্যা।

দ্বিতীয় দৃশ্য — পার্শ্ববর্তী গ্রামের পিসেমশাইয়ের দ্বারা কাজের ঝি রসোর আগমন।

তৃতীয় দৃশ্য — রসোর কর্মতৎপরতা এবং চেহারা ও আচরণে পৌরুষের আধিক্য।

চতুর্থ দৃশ্য — কুঞ্জ কবিরাজের অশালীন ব্যবহারের জন্য রসোর কুঞ্জ কবিরাজকে আক্রমন।

শীর্ষবিন্দু তথা অন্তিম ঘটনা — বসন্তের টীকাদানকারীদের কাছে রসোর নিজের রসমঞ্জুরী নাম প্রকাশ। এই রসমঞ্জুরী নাম সে লাভ করেছিল কুঞ্জ কবিরাজের নিকট থেকেই।

'নাম' গল্পের এই গঠনগত বিন্যাস কৌশলটি লক্ষ করলেই স্পষ্ট হয় যে গল্পটি প্রারম্ভিক ঘটনা থেকে বিভিন্ন দৃশ্য পরম্পরায় ধাঁপে ধাঁপে অগ্রসর হয়ে গল্পের শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছে।

'দীপান্বিতা' গল্পটিতেও এমন Stair Step গঠনের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। এই গল্পেও কাহিনি সূচনা অংশের পর ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে সমাপ্তির শীর্ষবিন্দু তথা Climax কে স্পর্শ করেছে। 'দীপান্বিতা' গল্পটি খুব বড় আয়তনের নয় বলে সিঁড়ির ধাপ বা দৃশ্য সংখ্যা অধিক নয়। অপরপক্ষে একই ধরনের বিন্যাস কৌশল পরিলক্ষিত হয় 'বিলম্বিত লয়' গল্পটিতেও। অতি বৃহদায়তন 'বিলম্বিত লয়' গল্পটির বিন্যাস কৌশলে প্রথমে গল্পের মধ্যে গল্প বলার কৌশলটি ব্যবহার করা হয়েছে আর গল্পের মূল অংশটি অগ্রসর হয়েছে Stair Step প্লট গঠনের মধ্য দিয়ে। কাহিনিগত জটিলতা ও আয়তনের আধিক্যের কারণে এই গল্পের সিঁড়ির ধাপও অধিক।

এই ভাবে দেখা যায় নরেন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন ছোটগল্পের গঠনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার বিন্যাস কৌশলের অবতারণা করেছেন। বিভিন্ন প্রকার স্তর পরম্পরায়, কাহিনির শীর্ষবিন্দুতে উপস্থিত হবার পার্থক্যে বিভিন্ন গল্পে ভিন্ন ভিন্ন সংগঠন কৌশল ব্যবহৃত হলেও নরেন্দ্রনাথ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গঠনের সুসংগঠিত ও সুসামঞ্জসপূর্ণ রূপায়ণে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর গল্পের সার্থক শিল্পিত রূপলাভের অন্যতম কারণ তাঁর গল্পের সুসামঞ্জসপূর্ণ গঠন কৌশল। গঠনের এই পারদর্শিতার জন্যেই নরেন্দ্রনাথের গল্পের অগ্রগতি হয়েছে বাধাহীনভাবে আর কাহিনির বাঁধন হয়ে উঠেছে সবল।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পের বিন্যাস কৌশলের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল গল্পের মধ্যে গল্প বলার

কৌশল। এই গল্পের মধ্যে গল্প বিবৃত হবার গল্পগুলির মধ্যেও কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কখনও দেখা যায় গল্পের সূচনা, গল্পের মূল কাহিনির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো ঘটনা দ্বারা হচ্ছে। এরপর সেই সূচনা অংশের কোনো কথক চরিত্র গল্পের মূল কাহিনি অংশকে বিবৃত করেছেন, এই কাহিনি কথকের ব্যক্তিগত কাহিনি হতে পারে, আবার অন্য কোনো অভিজ্ঞতা বা ভিন্ন ব্যক্তির কাহিনিও হতে পারে। আবার কখনও অন্য কোনো মজলিস বা আসরে কোনো ব্যক্তি গল্পের ছলে গল্পের মূল কাহিনির অবতারণা করেন। শ্রোতার বৈশিষ্ট্য অনুসারেও এই গল্পগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। কখনও দেখা যায় শ্রোতা নীরব থেকে নিছক শ্রোতা হিসাবে বর্তমান থাকেন, আবার কখনও কথক ও শ্রোতার সংলাপ বিনিময়ে গল্পটি ভিন্নমাত্রা লাভ করে।

'চেক' গল্পটিতে দেখা যায় লেখক শ্রোতা হিসেবে বর্তমান আছেন আর গল্পের মূল কাহিনির কথক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছেন পরিতোষবাবু। শ্রোতা তথা লেখকের কাছ থেকে পরিতোষবাবু কিছু টাকা পেতেন,সেই ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে এক চায়ের দোকানে চা খেতে খেতে লেখক একটি চেক লিখে দেন। সেই চেকটি দেখে পরিতোষ বাবুর স্মৃতিতে একটি ঘটনার কথা উদয় হয় আর বন্ধু সুবিমলের জীবনের সেই কাহিনিকেই পরিতোষবাবু গল্পের ছলে ব্যক্ত করেছেন। গল্পের মূল কাহিনি অংশে পরিতোষবাবু বা শ্রোতার কোনো ভূমিকা নেই কিন্তু পরিতোষবাবুর জবানিতে ব্যক্ত গল্পের মাঝে মাঝে শ্রোতার সংলাপ গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে আর এর ফলে একটু মজলিসি আমেজের সঞ্চার হয়েছে। গল্পের একেবারে শেষ অংশে কথক ও শ্রোতার প্রত্যক্ষ সংলাপে মূল কাহিনি অংশের একটি রহস্যের ইঙ্গিতে গল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।

'চেক' গল্পের মত একই রকম বিন্যাস কৌশল পরিলক্ষিত হয় 'চাঁদমিঞা' গল্পটিতেও। সেখানে চলন্ত বাসে একটি অনভিপ্রেত ঘটনা বর্ণনার মধ্য দিয়ে গল্পের সূচনা, কিন্তু তার সঙ্গে গল্পের মূল কাহিনির কোনো সংযোগ নেই। চলন্ত বাসে একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করে 'পুরুষের ঈর্ষা' ও 'মেয়েদের সহানুভূতি' সম্বন্ধে গল্প করতে করতে দুই বন্ধুর একজন একটি কাহিনির অবতারণা করেন। বন্ধু মসিয়র কথিত সেই কাহিনিই গল্পের মূল। নশরৎ আলী, তার বৃদ্ধ বয়সের তরুণী ভার্যা রাবেয়া ও চাঁদমিঞার কাহিনি দ্বারাই গল্পের মূল অবয়বটি গড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে শ্রোতা তথা লেখক নিশ্চুপ শ্রোতা হিসাবে বর্তমান থেকেছেন তবে গল্পের শেষাংশে কাহিনি অংশ সমাপ্ত হবার পর পুনরায় শ্রোতা ও কথকের বার্তালাপ শুরু হয়েছে আর সেই সংলাপ অংশ থেকেই নশরৎ আলী ও চাঁদমিঞার সম্পর্কের অকথিত দিকটি কিছুটা আভাসে ব্যক্ত হয়েছে। এই ভাবে গল্পের মধ্যে গল্প বলবার আদলে ছোট গল্পটির বিন্যাস ঘটেছে।

'বিলম্বিত লয়' গল্পটি একটি বৃহৎ গল্প আর এর সূচনার প্রথম পরিচ্ছেদটি ব্যবহৃত হয়েছে মূল

কাহিনি অংশে প্রবেশের পথ হিসেবে। গল্পটি উত্তমপুরুষীয় জবানিতে ব্যক্ত, তবে গল্পের প্রথম পরিচ্ছদের 'আমি' দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে শ্রোতার ভূমিকায় অবতীর্ণ। এক্ষেত্রে গল্পের মূল কাহিনি অংশ বিবৃত হয়েছে সুব্রত চক্রবর্তী নামক চরিত্রের জবানিতে। বন্ধু সুব্রতর সঙ্গে লেখক সুব্রতবাবুর বন্ধু শিল্পি মৃগাঙ্ক চাটুজ্যের বাড়িতে গিয়েছিলেন, সেই বাড়িতে মৃগাঙ্কবাবু, তার স্ত্রী অদিতি ও তাদের দুই সন্তান কৃষ্ণকলি ও আনন্দকে নিয়ে তৈরি সুখের সংসারের দর্শনে লেখকের উপলব্ধি ব্যক্ত হয়েছে গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদে, দীর্ঘ এই পরিচ্ছেদের পর গল্পের মূল কাহিনি অংশের সূচনা আর সেই কাহিনি অংশের প্রধান চরিত্র মৃগাঙ্ক বাবু, অদিতি ও এডিথ, এক্ষেত্রে সুব্রত চরিত্রটি সাক্ষী কথক শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, এইভাবে এই গল্পে গল্পের মধ্যে গল্পের বিন্যাস কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে।

'জৈব' গল্পটিতেও এমন বিন্যাস কৌশল পরিলক্ষিত হয়। লেখকের বাড়িতে তাঁর বন্ধু ডাক্তার বাসব মুখুয্যে এসেছেন, রেডিওতে ডাক্তারবাবুর বন্ধু কলেজের প্রফেসর মৃগাঙ্ক মজুমদারের বক্তৃতার অংশ শ্রবণ করে বাসববাবু তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন এবং সেই সূত্রেই লেখক ও তার স্ত্রী করবীকে বাসববাবু মৃগাঙ্কবাবুর কাহিনি ব্যক্ত করেছেন। বাসববাবুই এখানে কথকের ভূমিকা পালন করেছেন আর এক্ষেত্রেও গল্পের সূচনার উত্তমপুরুষীয় 'আমি' গল্পের মূল কাহিনি অংশের 'আমি'র থেকে পৃথক হয়ে নিছক শ্রোতার ভূমিকা লাভ করেছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে গল্পের মধ্যে গল্প বলার এই বিন্যাস কৌশল নরেন্দ্রনাথ- রচিত গল্পের একটি বহু ব্যবহৃত পদ্ধতি। উপরোক্ত গল্পগুলি ব্যতীত 'রত্নাবাঈ', 'এ্যাজমা', 'যবনিকা', 'পুরাতনী', 'সোহাগিনী' প্রভৃতি অসংখ্য গল্পে এই বিন্যাস কৌশল ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রত্যক্ষ বর্ণনা রীতিতে আদি-মধ্য-অন্ত এই স্বাভাবিক ক্রম মান্য করে যেমন নরেন্দ্রনাথ গল্প রচনা করেছেন আবার তেমনি বহু গল্প রচিত হয়েছে এই স্বাভাবিক রীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে। নরেন্দ্রনাথের বেশ কিছু গল্প রচিত হয়েছে বর্তমানে বসে অতীতের কাহিনি বর্ণনার মধ্য দিয়ে । এই সকল ক্ষেত্রে ফ্লাশব্যাক বা অতীত ঝলকের মাধ্যমে কাহিনির অংশ বিবৃত হয়েছে । উদাহরণস্বরূপ 'অসবর্ণা' গল্পটির কথা উল্লেখ করা যায়। উত্তম পুরুষীয় রীতিতে বর্ণিত এই গল্পের সূচনা অংশটি এইরকম — "আজ আবার এক তলায় অঞ্জলিদের ঘরে পুলিস এসে হানা দিয়েছিল। আধঘন্টা যাবৎ ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র তছনছ করে অঞ্জলির ছোট ভাই হাবুলকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে। সেদিনের মত আজও পুলিস-সাব্-ইনস্পেক্টরের অনুরোধে সার্চ লিষ্টে আমাকে সই করতে হয়েছে। ..... বছর খানেক আগে অঞ্জলির বাবা কালীমোহনবাবু যেদিন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন দৃশ্যটা সেদিনও প্রায় অবিকল এই রকমই ছিল।" এই অংশটি প্রকৃতপক্ষে কাহিনিধারার শেষাংশ। এরূপ সূচনার পর পুরো কাহিনি অংশ অতীত ঝলকের মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে। অতীত ঝলকের মধ্য দিয়ে গল্প অন্তিম বিন্দু স্পর্শ করেছে। অতএব দেখা যাচ্ছে 'অসবর্ণা'

গল্পে কাহিনি বর্ণনার ক্রম এরূপ — অন্ত-আদি-অন্ত। এই ভাবে গল্পটির পূর্ণবৃত্ত সম্পূর্ণ হয়েছে।

'আশ্রয়' গল্পটিতেও অতীত ঝলকের ব্যবহার হয়েছে তবে এই অতীত ঝলক আছে গল্পের মধ্যবর্তী অংশে। গল্পের সূচনার পর কাহিনিধারা অগ্রসর হয়েছে, মধ্যপর্বে অতীত ঝলকের মধ্য দিয়ে পূর্ব ইতিহাস বিবৃত হয়েছে, তারপর পুনরায় কাহিনি স্বাভাবিক গতিতে অগ্রসর হয়েছে। এক্ষেত্র কাহিনি বর্ণনার ক্রমটি হল — মধ্য-আদি-অন্ত।

'ফিরে দেখা' গল্পটিতেও অতীত ঝলকের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কাহিনির মধ্যবর্তী অংশে পূর্বের কাহিনি বিবৃত হয়েছে। এই গল্পের সূচনা অংশে বৃদ্ধ সুরপতির কাছে তার যৌবনকালে পরিত্যাগ ক'রে যাওয়া স্ত্রীর আগমনের ঘটনা আছে আর শেষাংশে স্ত্রী সর্বাণীর ফিরে যাওয়ার ঘটনা আছে। এই আদি ও অন্তের মধ্যবর্তী অংশে অতীত ঝলক বা ফ্লাশব্যাকের মাধ্যমে সুরপতি ও সর্বাণীর বিবাহ ও বিবাহ-পরবর্তী জীবনকাহিনি বর্ণিত হয়েছে। আর এই অতীত ঝলকের মধ্যেই কাহিনি তথা গল্পের মূল সংকটটিও ঘনীভূত হয়েছে। এই গল্পের ক্ষেত্রেও কাহিনি বর্ণনার ক্রম মধ্য-আদি-অন্ত।

উপরোক্ত গল্পগুলির ক্ষেত্রে, অর্থাৎ 'অসবর্ণা', 'আশ্রয়', বা 'ফিরে দেখা' গল্পগুলির ক্ষেত্রে অতীত ঝলকের ব্যবহার হয়েছে মূলত কাহিনির মধ্যবর্তী অংশে। নরেন্দ্রনাথের বেশ কিছু গল্পে কাহিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে দেখা যায় বর্তমানে বসে অতীত কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এমন একটি গল্প হল 'বিজয়ী'। 'বিজয়ী' গল্পটি প্রারম্ভ হয়েছে এই ভাবে — "কয়েক বছর আগে আমি যখন কাঁটাপুকুর লেনে থাকতাম, বাড়িওয়ালা শশধর মল্লিক আমার নামে এক ট্রেসপাসের কেস ঠুকে দিয়েছিলেন" উত্তমপুরুষীয় রীতিতে বর্ণিত এই গল্পটিতে এর পর সেই ট্রেসপাসের মামলার পরিণাম, সেই মামলা চালাতে গিয়ে উকিলের হাতে যৎপরোনাস্তি হয়রান হওয়া, সেই উত্যক্ত হবার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উকিলবাবুর স্ত্রীর অসুস্থতার সুযোগে তাকেও হয়রান করা ইত্যাদি নিয়েই 'বিজয়ী' গল্পের কাহিনি অংশ গড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে কাহিনির সমস্ত অংশটিই অতীত কাহিনি বর্ণনার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে।

'বিজয়ী'র মত গল্পে যেমন বর্তমানে বসে অতীতের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে তেমনি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কাহিনি ধারা অগ্রসর হয়েছে এমন গল্পও নরেন্দ্রনাথের গল্পের ভাণ্ডারে প্রচুর। উদাহরণস্বরূপ 'নাম', 'হেডমাস্টার' 'চড়াই উৎরাই' প্রভৃতি গল্পের নাম উল্লেখ করা যায়। স্বাভাবিকভাবেই এই সব গল্পে কাহিনি বর্ণনার আদি-মধ্য-অন্ত এই স্বাভাবিক ক্রম মান্য করে গল্প অগ্রসর হয়েছে।

গল্পের সমাপ্তি

ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যই হল সূচনা অংশ থেকে শুরু হয়ে অনিবার্য তীব্র গতিতে সমাপ্তির দিকে ছুটে যাওয়া। তবে সূচনা অংশে লেখক যে স্বাধীনতা উপভোগ করেন, সমাপ্তির ক্ষেত্রে সেই স্বাধীনতা যে অনেক অংশেই সীমিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। গল্পের সূচনা যে কোনো পদ্ধতিতেই হতে পারে, কিন্তু যদি সমাপ্তি গল্পের পরিণতি হিসাবে সংগতিপূর্ণ না হয় তবে গল্পের মূল রস সংবেদনা ব্যাহত হয়, কারণ গল্পের সূচনা অপেক্ষা সমাপ্তিই গল্পের মূল বক্তব্য প্রকাশে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। এছাড়া সাধারণ পাঠক ও সমালোচক উভয়েই স্বীকার করবেন, ছোটগল্পের যে মূল treatment তা লুকিয়ে থাকে গল্পের সমাপ্তিতেই।

রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প প্রসঙ্গে 'বর্ষাযাপন' কবিতায় বলেছেন —

"অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।"

প্রকৃতপক্ষেই ছোটগল্প যেহেতু বিন্দুর মধ্য সিন্ধুর আস্বাদ প্রদান করে সেইহেতু অনেক্ষেত্রেই তা আমাদের এক অনিঃশেষ প্রতীতিতে এনে ছেড়ে দেয় আর সেই অনিঃশেষ প্রতীতি বা এর জন্য দায়ী গল্পের সমাপ্তি অংশ। যেহেতু ছোটগল্প তার সমস্ত উপাদানকে একত্রে সংহত করে অনিবার্যভাবে সমাপ্তির দিকে বহন করে, যেহেতু তার গতি জ্যা মুক্ত তীরের মত হওয়াই কাঙ্ক্ষিত, সেইহেতু এই তীরের লক্ষ্যভেদই হল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তাই তীরের জ্যা মুক্ত করা অর্থাৎ গল্পের সূচনা গুরুত্বপূর্ণ হলেও তার লক্ষ্যভেদ অর্থাৎ গল্পের সমাপ্তি অংশই অধিকতর দৃষ্টি ও অনুভূতিগ্রাহ্য বলে মনে হয়।

সাধারণভাবে ছোটগল্পের পরিণতির ক্ষেত্রে গল্পলেখকেরা দু'টি প্রচলিত পদ্ধতির ব্যবহার করেন। এক হল ক্ল্যাইম্যাকটিক পরিণতি অর্থাৎ চমকপ্রদ বিদ্যুৎ উদ্ভাসনীতে গল্পের পরিসমাপ্তি আর আরেকটি হল চমকহীন সমাপ্তি যা পাঠককে অন্তহীনতার ব্যঞ্জনার উপলব্ধি প্রদান করে। এই দুই সমাপ্তির পদ্ধতিই সাফল্যের সঙ্গে ছোটগল্পকারেরা ব্যবহার করেছেন তাঁদের গল্পে। চমকপ্রদ সমাপ্তির ছোটগল্পকার হিসাবে ও হেনরি বা মোপাসাঁ এবং চমকহীন সমাপ্তির ছোটগল্পকার হিসাবে চেকভের নাম উল্লেখ করা যায়। এখন দেখা যাক নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর ছোটগল্পের ক্ষেত্রে সমাপ্তির কোন পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন এবং তা কতটা শিল্প সার্থকতা লাভ করেছে।

সহজ সরলতায় জীবনের বাস্তব চিত্রকে ফুটিয়ে তোলাই ছিল নরেন্দ্রনাথের রচনার বৈশিষ্ট্য।বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য না থাকাই তাঁর রচনার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। তিনি গল্পের সমাপ্তির ক্ষেত্রে কোনো একটি বিশেষ পদ্ধতির প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করেননি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গল্পের একেবারে শেষ প্রান্তে,

শেষবাক্য বা শেষ অনুচ্ছেদে গল্পের মূল রস সংবেদনকে ঘনীভূত করেছেন তবে সমাপ্তির আলগা চমক তার রচনায় নেই। হয়তো শেষ মুহূর্তের কোনো উপলব্ধি, কোনো ঘটনার উদ্ভাসনে এক বোধ জাগ্রত হয় এমন সমাপ্তিই নরেন্দ্রনাথের অধিকাংশ গল্পে পরিলক্ষিত হয়। খুব সাধারণভাবে বিবৃত একটি কাহিনিতে শেষ সময়ের এক দীপ্তি গল্পটিকে বিশিষ্ট করে তোলে— এই হল নরেন্দ্রনাথের গল্পের সমাপ্তির সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তবে এই চমক আমাদের আনন্দ দেয়, নতুন বোধের জগতে মুক্তি দেয়— হতচকিত করে তোলে না। গল্পের শেষ চমকের জন্যই তিনি গল্পকে গড়ে তোলেন না। চমকহীন ত্বরিত উদ্‌ভাসন তাঁর গল্পের বৈশিষ্ট্য যা এক গভীর ব্যঞ্জনাকে দ্যোতিত করে। সমালোচক তাই বলেন— "গল্পের শেষ হয়ে যাওয়া আর অকথিত অন্তিম অর্থটির হঠাৎ ঝলকিত হয়ে ওঠা, দুই-ই যেখানে একসঙ্গে ঘটে, সংশয় নেই, প্রশ্ন নেই, ব্যাখ্যা নেই, বাক্য নেই। এই আর্টে নরেন্দ্রনাথের সিদ্ধি অবিসংবাদিত।"[৮] নরেন্দ্রনাথের গল্পের আলোচনা দ্বারা এই বক্তব্যের যাথার্থ্য নিরূপণ করা যেতে পারে।

নরেন্দ্রনাথের 'মহাশ্বেতা' গল্পটির সমাপ্তি বাক্যটি এইরকম — "স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অমিতা। এই বিচিত্র বর্ণবাসের অন্তরালে তার মন মরুভূমির রিক্ততায় ধূ ধূ করছে।" এই গল্পের সমাপ্তি আপাত দৃষ্টিতে চমকহীন কিন্তু অমিতার জীবনের এক গভীর উপলব্ধির আলোকে উজ্জ্বল। গল্পের সূচনায় অমিতার শুভ্র বেশবাসের বর্ণনা দ্বারা তার হৃদয়ের শুভ্রতা ও রিক্ততাকে প্রকাশ করেছেন লেখক।ধীরে ধীরে বিধবা অমিতার জীবনে চিন্মোহনের আর্বিভাব ঘটেছে, ধীরে ধীরে শুভ্র বেশবাশের আড়ালে শুভ্র অমিতার হৃদয়ে রং- এর ছোপ লেগেছে। অমিতার শুভ্র বেশবাস চিন্মোহনের ভালোবাসার অন্যতম কারণ, তাই অমিতার নাম রেখেছে সে মহাশ্বেতা।অপরদিকে অমিতাও সেই নামকে সার্থক করে তুলতে শাড়ির প্রান্ত থেকে কালো রেখাটুকু পর্যন্ত তুলে দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই চিন্মোহনের সাঙ্গে অমিতার পুনর্বিবাহের দিন অমিতার এই শুভ্র বেশের পরিবর্তন ঘটেছে।আত্মীয়াদের উৎসাহের আতিশয্য তাকে রঙিন করে তুলতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি; "আলতায় দুটো পা একেবারে লেপে দিয়েছে সুনন্দা।কপাল আর সিঁথি নিয়ে পড়েছে সরমা। সিঁদুরের সূক্ষ্ম রেখায় তার তৃপ্তি নেই। নিজের মত করে অমিতার সিঁথিও সে আয়তির চিহ্নে উজ্জ্বল করে তুলল। কপালে বড় করে এঁকে দিল সিঁদুরের ফোঁটা।" কিন্তু অমিতার এই বিচিত্র বর্ণবাস দেখে চিন্মোহন তার পূর্বের মুগ্ধতাকে ধরে রাখতে পারে নি। অমিতার শুভ্র, রিক্ত রূপই তাকে আকর্ষণ করেছিল। শুভ্রবেশের অমিতাকে তার মনে হত 'স্তব্ধ গম্ভীর মর্মরমূর্তির' মত যার প্রশান্ত মাধুর্যে মন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, কোন ক্ষোভ ও চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয় না। অমিতার এমন শুভ্র বেশের পরিবর্তনে চিন্মোহনের সেই ভালবাসার বোধ আঘাত পেয়েছে, তার মহাশ্বেতাকে অমিতার বধুবেশের মধ্যে সে খুঁজে পায়নি। অমিতাও চিন্মোহনের এই মনোভাবকে উপলব্ধি করেছে ফলে তার অন্তরকে ও মরুভূমির রিক্ততা গ্রাস করেছে। অমিতার এই সহসা বোধের উপলব্ধিতেই গল্পের সমাপ্তি আর এই সমাপ্তিতে লেখকের বর্ণনা বাক্য

অসামান্য শিল্প সৌকর্য লাভ করেছে।

'টিকেট' গল্পটি নরেন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প হিসাবে স্বীকৃত। মধ্যবিত্ত শ্রেণির দ্বিধাদীর্ণ মানসিকতা, ছদ্ম নীতিবোধ— একদিকে নীতিনিষ্ঠতা আবার অন্যদিকে নীতিবিগর্হিত কাজে বিশেষ আকর্ষণ, নিয়ম ভেঙে গর্ব ও পৌরুষের উপলব্ধি শেষ পর্যন্ত এক সরল নিষ্পাপ শিশুর সরলতায় সেই আত্মতৃপ্তি চুরমার হয়ে যাওয়া, মোটের উপর এই নিয়েই 'টিকেট' গল্পের কাহিনিগত অবয়ব গড়ে উঠেছে। নরেন্দ্রনাথ শীতাংশু চরিত্রের মধ্য দিয়ে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির চরিত্রকেই ফুটিয়ে তুলেছেন, তার চরিত্রে আদর্শ পুরুষের মহত্ব নয়, বরং ফুটে উঠেছে বাঙালি মধ্যবিত্তের বাস্তব চিত্র আর বাস্তব বলেই তা দ্বন্দ্বদীর্ণ, স্ববিরোধী, রুক্ষ ও অসুন্দর। গল্পের এই মূল বক্তব্য প্রকাশে সমাপ্তির অংশটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

গল্পের শুরুতেই দেখা যায় অফিস ফেরত শীতাংশু এক বিচিত্র ছদ্ম মর্যাদাবোধে আক্রান্ত হয়েছে। মাসের শেষে পকেটে পাঁচটি পয়সা সম্বল তবুও শীতাংশু কলেজের বান্ধবী মানসীর সামনে ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণিতে উঠতে পারেনি, নিজের অন্তরের দৈন্যের কারনে আর্থিক দৈন্যকে ঢাকতে প্রথম শ্রেনিতে গিয়ে উঠেছে। কিন্তু উঠেই নিজের ভুয়ো আত্মসম্মান বোধকে ধীক্কার দিয়েছে।কন্ডাকটার টিকিটের জন্য হাত পাততে শুরু করতেই — "মনটা আবার হাহাকার করে উঠল শীতাংশুর — পাঁচটি পয়সার সবকটিই তুলে দিতে হবে ওর হাতে। যদি বুদ্ধি করে সেকেন্ড ক্লাসে উঠত তাহলে তিনটি পয়সাতে কাজে চলত। ..... কিন্তু কি কুক্ষণেই আজ চোখাচোখি হয়েছিল মানসী মিত্রের সঙ্গে। আর হলেই বা কি। দেখিনি দেখিনি করে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সেকেন্ড ক্লাসেই তো দিব্যি উঠতে পারত শীতাংশু। যে সহপাঠিনি দেখা হলে মুখের কথাটি পর্যন্ত খসায় না, তার জন্য বোকা শীতাংশু কেন বিড়ি খাওয়ার দুটি পয়সা খসাতে গেল।" এরপর কন্ডাকটার তার কাছে পয়সা চেয়েছে কিন্তু দিতে দেরি হওয়ায় নিজেই সরে গিয়ে অন্যের টিকেট দিতে শুরু করেছে। শীতাংশু নিজে কখনও ট্রাম বাসের ভাড়া ফাঁকি দেয়নি, কন্ডাকটার ভুলে গেলেও নিজে যেচে গিয়ে টিকেট কেটেছে, 'দুনিয়া জোড়া দুর্নীতির' রাজ্যে প্রবেশের বুদ্ধি বা প্রবৃত্তি কোনটিই তার নেই, বরং 'সততায় অনেক সান্ত্বনা' আছে বলেই মনে করে এসেছে। কিন্তু আজ তার নীতিবোধের কাঁটা ঘুরে গেছে। কন্ডাকটার সরে যেতেই সে ভেবেছে, যদি সে একদিন টিকিটের দাম ফাঁকি দিতে পারে তবে দেবে না কেন? অতিস্বল্প বেতনে উদয়াস্ত খাটুনি, মাসের অর্ধেক পার হতে না হতেই ধারের জন্য হাত পাতা, স্ত্রী মল্লিকার অভাবের তাড়নায় ক্ষুরধার বাক্যবাণ সবই স্মৃতিপথে ধরা পড়ল। তার মনে হল— "কেন ফাঁকি দেবে না ? তাকে কি কেউ ফাঁকি দিতে বাকি রেখেছে ?" আরও মনে হয়েছে তার নীতিনিষ্ঠতা নিছক মিথ্যে — "তার এই ভুয়ো নীতিবোধ নির্বোধ অক্ষমতারই নামান্তর, কোন মানে নেই, কোন মানে হয় না।" কন্ডাকটরকে ফাঁকি দিতে সে এক স্টপেজ আগেই বাস থেকে নেমে গেছে আর এই

পাঁচ পয়সা ফাঁকি দিয়ে বাঁচাতে পেরে অভূতপূর্ব উল্লাস অনুভব করেছে অন্তরে, কালোবাজারে পাঁচ লক্ষ টাকা রোজগার করেও হয়তো কোনো লক্ষপতি এতখানি উন্মাদনা অনুভব করে না। এক অপরিমেয় পৌরুষের অনুভূতি সে অনুভব করেছে অন্তরে অন্তরে। তার চলাফেরার ভাব বদলে গেছে। মাসের শেষে সে কোন দিন সিগারেট কেনে না। আজ নতুন কিছু করতে পারার উত্তেজনায় দুটো সিগারেট কিনে নিয়েছে। তারপর সিগারেট মুখে দিয়ে অন্যান্য দিনের মত ঘরের দোরগোড়ায় জুতো না খুলে গট গট শব্দ করে জুতো পরেই ঘরে ঢুকে গেছে সে। কিন্তু বাড়িতে ফিরেই এই আত্মগৌরবের উপলব্ধি শীতাংশু ধরে রাখতে পারে নি, কন্ডাকটরকে ফাঁকি দিয়ে সে দিগ্বিজয়ের অনুভূতি নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল ছোট ছেলে বিনুর একটি কথায় সেই আত্ম মর্যাদার ফানুস ফুটো হয়ে চুপসে গেছে। মাসের প্রথম দিকে চকলেট, বিস্কুট বা কমলালেবু এনে ছেলের হাতে তুলে দেয় সে আর মাসের শেষের দিকে অর্থের অভাবে বাস বা ট্রামের টিকিটটি দিয়েই ছেলেকে ভোলানোর চেষ্টা করে সে। আজও বিনু এগিয়ে এসে বলেছে — "বাবা টিকেট?"সহসা যেন শীতাংশুর মুখে চপেটাঘাত পড়ে গেছে। সে যে নীতিচ্যুত হয়েছে, ফাঁকি দিয়েছে, এই দুনিয়া জোড়া দুর্নীতির অংশীদার হয়ে পড়েছে তার উপলব্ধি হয়েছে শীতাংশুর। ছেলের প্রশ্নের জবাবে নিরুত্তর শীতাংশুকে দেখে মল্লিকাও উপলব্ধি করেছে প্রকৃত সত্য, সে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাড়াতাড়ি;কিন্তু 'শীতাংশুর ক্ষুদে কন্ডাকটারটি' নাছোড়বান্দা জাগ্রত বিবেকের মতই বারবার উচ্চারণ করেছে 'টিকেট বাবু।' এইভাবে নরেন্দ্রনাথ গল্পের শেষাংশে এসে তার গল্পের মূল রস সংবেদনাকে ঘনীভূত করে তুলেছেন। এক নিষ্পাপ ক্ষুদ্র শিশুর দ্বারা নীতিবিচ্যুত এক নীতিনিষ্ঠ মানুষের সাময়িক পদস্খলন যেন চিহ্নিত হয়ে পড়েছে, ছদ্ম পৌরুষের উপলব্ধি ভেঙে পড়েছে, সাময়িক পদস্খলন যে ভয়াবহ ভাঙনের দিকে মানুষকে ঠেলে দিতে পারত সহসা বিবেকের আঘাতে তা থেকে রক্ষার যেন পথ দেখা দিয়েছে আর এ সবই সূচিত হয়েছে গল্পের সমাপ্তির অংশ দ্বারা।

প্রথমেই বলা হয়েছে নরেন্দ্রনাথের বহু গল্পই শুরু হয়েছে অত্যন্ত সাধারণভাবে এবং গড়েও উঠেছে বৈশিষ্ট্যহীন — স্বাভাবিক গতিতে। কিন্তু গল্পের সমাপ্তি অংশের অনবদ্য উদ্ভাসনী গল্পকে এক ভিন্নমাত্রা দান করেছে, যা হয়ত গল্পের ধারার মধ্যে আকস্মিক কিন্তু একই সঙ্গে শিল্প সুষমামণ্ডিত ও মানবিকতার জয় ঘোষণাকারী। এমনই এক সূচনা পাই 'বিজয়ী' গল্পে। উত্তমপুরুষীয় রীতিতে রচিত এই গল্পে লঘু ভঙ্গিতে এক প্রতিশোধ গ্রহণের বর্ণনা আছে। এই বর্ণনা অনেক সময় আমাদের মধ্যে কৌতুক রসের সঞ্চার করে, কিন্তু গল্পের সমাপ্তি অংশ এই গল্পের মানবিক সংবেদনাকে প্রকাশ করে আর গল্পও সেখানে শীর্ষবিন্দুতে উপনীত হয়। এক সময় হাসপাতালের এ্যাসিস্ট্যান্ট হাউস সার্জন ডাঃ সোম বাড়িওয়ালার সঙ্গে এক মামলায় জড়িয়ে পড়েন। স্বভাবতই তাকে শরণাপন্ন হতে হয় উকিলবাবুর। সুযোগ বুঝে উকিল শ্রীবিলাসবাবু ডাক্তারবাবুকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন এবং প্রচুর অর্থ আত্মসাৎ করে

নেন। বিপক্ষের থেকে স্বপক্ষের উকিলের ব্যবহারেই ডাক্তারবাবু অধিক দুর্ভোগ সহ্য করেন। লেখক বলেন — "যৎপরোনাস্তি হয়রান হলাম। কিন্তু সবচেয়ে উত্যক্ত হলাম শ্রীবিলাসবাবুর ব্যবহারে। বলব কি, দিনের পর দিন তিনি আমাকে একেবারে জোঁকের মত শুষতে লাগলেন।" শুধু আর্থিক দিক দিয়েই নয় উকিলবাবু ডাক্তার বাবুকে শুষতে লাগলেন সব দিক দিয়েই। মানসিক উদ্বেগের দিনগুলিতে নিজের নথি পত্রের বোঝা এমনকি একদিন বাজারের থলেও শ্রীবিলাসবাবু ডাক্তারবাবুকে দিয়ে বহন করিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত মামলাতে হার হয়েছে ডাক্তারবাবুর, মামলার খরচ ও জরিমানার টাকা দিয়ে রেহাই পেয়ে, ডাক্তারবাবু উকিলবাবুর ব্যবহারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে মনে মনে ভেবেছেন — "দাঁড়াও, সময় যদি আসে, মজা একদিন তোমাকে দেখাব।" এবং "ওৎ পেতে রইলাম, শোধটা কি ভাবে নেওয়া যায়।" এই প্রতিশোধ নেবার সুযোগ সহসা একদিন তিনি পেয়ে গেলেন অভাবিতভাবে। মামলাপর্ব শেষ হবার মাস তিনেক পরে একদিন রাতে উকিল শ্রীবিলাসবাবু ডাক্তারবাবুকে কল দিয়ে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়িতে। তার স্ত্রীর শরীর খারাপ। এই সুযোগ ডঃ সোম হাতছাড়া করলেন না, অত্যন্ত কঠোর ভাবে অতিরিক্ত ফিজ আদায় করলেন। মুখে মধুর ভাব বজায় রেখে অতি সামান্য অসুস্থতা সত্ত্বেও রোগিণীকে হাসপাতালে ভর্তি করলেন। শুধু তাই নয় অনাবশ্যক ভাবে প্রচুর অনাবশ্যক ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা দিলেন। অন্যান্য ডাক্তার বন্ধুরাও এই প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করায় ডাক্তারবাবুকে সাহায্য করলেন। মাঝারি পশারের উকিলবাবুর দিন কয়েকের মধ্যেই নাভিশ্বাস উঠে গেল। তবু ডঃ নিরুপম সোম দীর্ঘ দু-মাস রোগিণীকে হাসপাতালে রেখে দিলেন। এরপর, সিট খালি করবার তাড়া আসায় উকিল গিন্নি হাসপাতাল থেকে মুক্তি পেলেন। ডাক্তার ভাবলেন তার প্রতিশোধ সম্পন্ন হয়েছে, উকিলবাবুকে যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া গেছে। বিজয় গর্ব বুকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পূর্ব দিন সন্ধ্যায় তিনি উকিলবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। তিনি ডাক্তারকে নিজের কৃতজ্ঞতা জানালেন কিন্তু জয়গর্বী ডাক্তার দুর্বুদ্ধিবশত তার কাছে সমস্ত সত্য প্রকাশ করে ফেললেন। বিজয়গর্বে হাসতে হাসতে শ্রীবিলাসবাবু স্ত্রীকে সবিস্তারে বর্ণনা করলেন কেমন করে শ্রীবিলাসবাবু তাকে নাস্তানাবুদ করেছিলেন, খরচের একশেষ করেছিলেন এবং এই নাজেহাল হবার প্রতিশোধ নিতেই তিনি অনাবশ্যক ভাবে তার স্ত্রীকে হাসপাতালে আটকে রেখে দিয়েছিলেন। এই কথা শুনে উকিলবাবুর স্ত্রী হতবাক হয়ে গেছেন, কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বলেছেন — "আপনি কি সেইজন্য আমাদের এত বড় শাস্তি দিলেন ? কিন্তু ডাক্তার বাবু আমরা যে আপনাকে বন্ধু বলে ভেবেছিলাম।" এই বলে তিনি পাশ ফিরে শুয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। মুহূর্তে ডাক্তারবাবুর উপলব্ধি হয়েছে, যে বিজয়গর্ব তিনি এতক্ষণ উপলব্ধি করছিলেন তা আর বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই বরং চরম অনুতাপে তিনি দগ্ধ হয়েছেন, প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে তিনি নিজের চিকিৎসক বৃত্তি থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। আর এক রোগিণীর বিশ্বাসভঙ্গের উপলব্ধি তাকে পুনরায় মনুষ্যত্ববোধে জাগ্রত করেছে। গল্পের এটাই মূল আর এই মূলের

রসনিস্পত্তি ঘটেছে গল্পের সমাপ্তির অংশে। বিশেষ করে তার শেষ দিকের বাক্যবন্ধগুলিতে — "আর আমার মনে হল, আমার সমস্ত কৃতিত্ব সেই মুহূর্তে একেবারে নস্যাৎ হয়ে গেছে। যাকে বিজয়ীর বরমাল্য ভেবেছিলাম, তা সোলার ফুল ছাড়া কিছু নয়।" ডাক্তারবাবুর শেষ মুহূর্তের উপলব্ধির মত শ্রীবিলাসবাবুর স্ত্রীর শেষ বাক্যটি আমাদের মধ্যে এক উপলব্ধির সঞ্চার করে, আমাদের অন্য এক বোধের জগতে মুক্তি দেয়। বিশ্বাসভঙ্গের যে কারণই থাক না কেন, সেই বিশ্বাসভঙ্গ যে অন্যায়-পাপ- নীতিবিগর্হিত তা যেন গল্পের অসাধারণ সমাপ্তির দ্বারাই লেখক সঞ্চারিত করেন।

'বিকল্প' গল্পটির ক্ষেত্রেও লেখক গল্পের শীর্ষবিন্দুতে স্পর্শ করবার স্থানটি গল্পের শেষাংশেই বিধৃত করেছেন। গল্পের সূচনায় দীর্ঘ পরিচ্ছদ জুড়ে পিতা হরগোবিন্দের সঙ্গে মাতৃহারা কন্যা সুধার মধুর সম্পর্কের বিবরণ রয়েছে। বাবা, ভাই হাবুল ও সুধা— এই তিনজনকে মিলিয়ে এক সুখ শান্তি পূর্ণ সংসারের চিত্র এঁকেছেন লেখক যেখানে পিতা হরগোবিন্দের একমাত্র ভাবনার বিষয় হল একটি সদ্‌ব্রাহ্মণ সু-উপায়ী পাত্রের সঙ্গে সুধার বিবাহ দেওয়া। এরপর এই তিনজনের সংসারে প্রবেশ করেছে আর একটি চরিত্র, হাবুলের প্রাইভেট টিউটর ইন্দুভূষণ। মাতাপিতাহীন দরিদ্র ইন্দুভূষণ ও সুধা ধীরে ধীরে কাছে এসেছে, তাদের মধ্যে প্রণয়ের সঞ্চার হয়েছে আর হরগোবিন্দের কাছে তা গোপন থাকেনি। তিনি এ সম্পর্ক কিছুতেই স্বীকার করেননি, বরং শূদ্র হয়ে বামুনের মেয়ের দিকে তাকাবার জন্য গুরুদণ্ড দেবার ব্যবস্থা করেছেন। পাড়ার ছেলেদের সহায়তায় তিনি ইন্দুভূষণকে মার খাইয়েছেন। আহত ইন্দুভূষণ, অনাত্মীয়- অসহায় ইন্দুভূষণ হাসপাতালে জ্বরবিকারে মারা গিয়েছে। এর পরেই সুধা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে স্বাভাবিক জীবন থেকে। সকল কাজই আগের মতই সে নিষ্ঠাভরে করে, কিন্তু তাতে আনন্দ নেই, প্রীতি নেই, শ্রদ্ধা নেই। লেখক বলেন— "ওপর থেকে সবই ঠিক আগের মতই চলতে লাগল। কিন্তু ভিতর থেকে কোন কিছুই আর আগের মত রইল না। একটি মেয়ে রাঁধে বাড়ে, ঘর গুছোয়, বিছানা পাতে — সবই করে। হরগোবিন্দ চেয়ে চেয়ে দেখেন। এ যেন তাঁর চির আদরের সুধা নয়, তারই একখানা অবিকল পাথরের প্রতিমূর্তি। সেই মূর্তির চোখ আছে, তাতে পলক নেই; সে মুর্তির অপরূপ দুটি সুন্দর রক্তাভ ঠোঁট আছে, কিন্তু তাতে স্নেহ মমতা প্রীতি শ্রদ্ধার চিহ্ন মাত্র নেই।" হরগোবিন্দ শত চেষ্টা করেও সুধার এই পরিবর্তনকে বদল করতে পারেনি বরং সে পোষাক পরিচ্ছেদে, আহারে, আচরণে সম্পূর্ণ বৈধব্যের বেশ ধারণ করেছে। সুধার নিশ্চুপ শোকস্তব্ধতা আর সহ্য হয়নি হরগোবিন্দের। নিজের কন্যার এই রূপ ধীরে ধীরে অসহ্য হয়ে ওঠায়, কিছুতেই মেয়ের অবস্থা পরিবর্তন করতে না পেরে হরগোবিন্দ শেষ পর্যন্ত বিকল্প ব্যবস্থা খোঁজার চেষ্টা করেছেন। সহকর্মী সুরেন সমাদ্দারের কাছে হরগোবিন্দ একটি ছেলের খোঁজ করেছেন যে, বামুন হলে ভাল হয়, তবে বামুন না হলেও চলবে, এম এ পাশ হলে ভাল হয়, তবে বিএ পাশ হলেও চলবে। সুরেন সমাদ্দার যখন বলেছেন, এমন ছেলেকে কি নিজের মেয়ের জন্যই

হরগোবিন্দ খুঁজছেন, তখন হরগোবিন্দ ম্লান ভাবে বলেছেন, তা নয় তিনি খুঁজছেন — "একজন প্রাইভেট টিউটর — ছেলের জন্য একজন প্রাইভেট টিউটর।"

অতএব দেখা যায় মেয়ের নীরব আত্মাহুতিকে সহ্য করতে না পেরে পিতা হরগোবিন্দ শেষ পর্যন্ত কন্যা সুধার জন্য ইন্দুভূষণের বিকল্প হিসেবে আরেকজন প্রাইভেট টিউটর খোঁজ করেছেন, যে হয়ত হাবুলকে পড়াবে কিন্তু যার মূল প্রয়োজন সুধার — পুনরায় সুধা যদি কোনো বন্ধনপাশে জড়িয়ে পড়ে সে আকাঙ্ক্ষাই এখন হরগোবিন্দের একমাত্র অন্বিষ্ট। হয়তো তা কোনোদিনই সম্ভব হবে না, তবুও পিতা হরগোবিন্দ শেষ চেষ্টা করে যাচ্ছেন, বিকল্প খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

ছোটগল্পের কথনরীতি (Point of view)

ছোটগল্পের প্রকরণগত দিকের আলোচনায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় Point of view -এর আলোচনা, যাকে বাংলায় বলা হয়'নিরীক্ষণবিন্দু' বা 'প্রেক্ষণবিন্দু' বা 'দৃষ্টিকোণ'। গল্পের কাহিনির সঙ্গে গল্প কথকের অবস্থান এই প্রেক্ষণবিন্দুকে গড়ে তোলে। সমালোচকের মতে — "কাহিনীর যিনি কথক, তাঁর সঙ্গে ওই কাহিনীর যে অবস্থানগত সম্পর্ক — তাকেই বলা চলে 'পয়েন্ট অফ ভিউ' বা নিরীক্ষণবিন্দু, প্রচল ভাষায় 'দৃষ্টিকোণ'।[৯]

গল্পের মূল বক্তব্য বা থীমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় গল্প কথকের দৃষ্টিকোণ আবার বিপরীতক্রমে এও বলা যায় যে দৃষ্টিকোণই গল্পের স্থান কাল ও পাত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে; ঘটনা সংস্থাপন, পটভূমি নির্ধারণ, চরিত্রদের সার্বিক ক্রিয়াকলাপ এ সকলেরই নিয়ন্ত্রা প্রকৃতপক্ষে প্রেক্ষণবিন্দু। প্রেক্ষণবিন্দু বা দৃষ্টিকোণের এই গুরুত্বের কথা আলোচকেরা স্বীকার করেন — "একটি গল্পের অস্তিত্ব গড়ে ওঠে গল্প-কথকের দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে। কথকের পরিবর্তন একদিক দিয়ে সামগ্রিকভাবে গল্পেরই পরিবর্তন।"[১০] এখন নরেন্দ্রনাথের গল্পের দৃষ্টিকোণের দিকটি আলোচনা ক'রে তার প্রয়োগ - বৈশিষ্ট্যটি অন্বেষণ করা যেতে পারে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর গল্পরচনার ক্ষেত্রে মুখ্যত সর্বজ্ঞরীতির দৃষ্টিকোণ এবং উত্তমপুরুষের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করছেন। যদিও এই দুই রীতির মধ্যেও উপবিভাগ আছে। অনেক মাত্রা ও প্রয়োগগত সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে।

নরেন্দ্রনাথের অধিকাংশ গল্পই রচিত হয়েছে সর্বজ্ঞরীতিতে, 'যৌথ', 'রস', 'পালঙ্ক' 'মহাশ্বেতা', 'দীপান্বিতা' প্রভৃতি গল্পগুলি সবই এই সর্বজ্ঞরীতি বা প্রথমপুরুষ কথনরীতি (Third person point of view)-তে রচিত।

অপরদিকে 'নাম', 'হেডমাস্টার', 'অসবর্ণা' প্রভৃতি গল্পগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছে উত্তমপুরুষের কথনরীতি। মধ্যমপুরুষের কথনরীতির গল্প নরেন্দ্রনাথের সুবিশাল গল্প ভাণ্ডারে নেই।

উত্তমপুরুষের কথনরীতিতে বর্ণিত গল্পগুলির মধ্যে কিছু গল্প, গল্পের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত কোনো চরিত্রের আত্মকথনের ভঙ্গিতে বর্ণিত। চরিত্রের আত্মকথনমূলক গল্পগুলিতে আবার দুটি পৃথক শ্রেণি পরিলক্ষিত হয়। কতকগুলি গল্পে কথক কাহিনিতে আছেন শুধু দ্রষ্টা হিসেবে, নিজে সরাসরি কাহিনির সঙ্গের অর্ন্তবৃত বা 'ইনভল্‌ভড' নন। 'বিলম্বিত লয়' গল্পটির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। কথকচরিত্রমূলক গল্পগুলির মধ্যে কথক চরিত্রটি গল্পের কাহিনির কেবলমাত্র বহিরঙ্গ দর্শক মাত্র নয়, চরিত্রটি কাহিনিটির সঙ্গে বিজড়িত বা 'Involved'। 'অসবর্ণ', 'হেডমাস্টার', 'বিজয়ী', প্রভৃতি

গল্পগুলি এই শ্রেণিভুক্ত।

এখন প্রথমে উল্লেখিত 'বিলম্বিত লয়' গল্পটির কথনরীতির আলোচনা প্রসঙ্গে এর বিশিষ্টতা আলোচনা করা যেতে পারে। দীর্ঘ এই গল্পটি ছোট বড় পনেরোটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত, এর মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা লেখকের উপস্থিতি দেখতে পাই। প্রথম পরিচ্ছেদটি যেন একটি কাহিনি শুরু হবার ভূমিকা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে গল্প লেখকের স্থানে তার বন্ধু হিসেবে উপস্থাপিত সুব্রত চক্রবর্তী গল্পের সূত্রধর হয়েছেন। অতএব এখানে দেখা যাচ্ছে গল্পটি উত্তমপুরুষীয় রীতিতে রচিত হলেও এই উত্তমপুরুষের 'আমি' প্রকৃতপক্ষে দুজন। প্রথম পরিচ্ছেদে গল্প কথক ও লেখক অভিন্ন 'আমি' হিসেবে এবং তারপরের পরিচ্ছেদ থেকে গল্প কথক ভিন্ন 'আমি' হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ এই নতুন 'আমি'র প্রবেশের ভূমিকা লেখক করেছেন প্রথম পরিচ্ছেদের শেষ বাক্যটিতে—"সিগারেট ধরিয়ে সুব্রতদা এরপর শুরু করলেন।"

ভিন্ন কথকের জবানীতে গল্পের মূল কাহিনি অংশ বিবৃত হয়েছে আর এই কাহিনিতে কথক একজন চরিত্রও বটে, কিন্তু কাহিনি অংশের তিনি কেবল সাক্ষী চরিত্র হিসেবে বিবেচিত। এ গল্পের প্রধান চরিত্র মৃগাঙ্ক, অদিতি ও এডিথের কাহিনিতে কথক চরিত্রটি যেন কেবল বহিরঙ্গ দর্শক রূপে, নির্মোহ দৃষ্টিতে ঘটনা বর্ণনার চেষ্টা করেছেন। গল্পের বর্ণনা অংশে এমন অনেক স্থান আছে যেখানে সর্বজ্ঞরীতির বর্ণনার ছায়াপাত ঘটেছে, ফলে কথনরীতির বিশ্বাসযোগ্যতা অনেকক্ষেত্রেই ব্যাহত হয়েছে। যেমন — "একটা তীর যেন বিঁধল অদিতির বুকে। মৃত্যুর কাছে হার হল প্রাণের। ম্লান মুখে বলল, 'আচ্ছা যাও'।" এছাড়াও মৃগাঙ্ক-অদিতি বা মৃগাঙ্ক-এডিথের সংলাপ অংশেও যেন উত্তমপুরুষীয় রীতি সঠিকভাবে সর্বত্র রক্ষিত হয়নি বলে মনে হয়। তবে কথক চরিত্রটি যেহেতু কাহিনির প্রধান দুটি চরিত্রেরই অন্তরঙ্গ বন্ধুস্থানীয়, সেইহেতু চরিত্রদের মনের খবর ও কথাবার্তার বিস্তারিত বর্ণনা তার অধিগত হতেই পারে আর লেখক সেই চেষ্টাই করেছেন। গল্প থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করে বিষয়টি দেখানো যেতে পারে —

১। "মাঝে মাঝে যখন আমার কাছে মন খুলত মৃগাঙ্ক, ওর সেই ভিতরের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গকামী মানুষটি বেরিয়ে আসত।"

২। "একদিন তো আমার সামনেই ওরা দারুণ ঝগড়া করল দুজন।"

৩। "ওদের ঝগড়ার ফাঁকে ফাঁকে আমি মোটামুটি বিবরণটা জেনে নিলাম।"

৪। "আমি মাঝখানে আর একদিন খোঁজ নিয়ে জানলাম.....।"

৫। "বুঝতে আমার আর কিছু বাকি রইল না।"

৬। "অদিতি খবর যা কানে আসতে লাগল তাও ভালো নয়।"

— এই সকল বাক্যবন্ধ ব্যবহার ক'রে উত্তমপুরুষীয় রীতির এই বর্ণনাকে লেখক বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করিয়েছেন।

'বিজয়ী' গল্পে লেখক ও কথক অভিন্ন 'আমি' রূপে উপস্থিত। এই গল্পের 'আমি' গল্পের কাহিনির প্রধান চরিত্র 'Involved-I'। গল্পের সূচনায় নিজের পূর্ব অভিজ্ঞতার বর্ণনা, সমাপ্তিতে কথকের এক বিশেষ উপলব্ধির অনুভবের মধ্যে কাহিনি অংশ সীমাবদ্ধ।

'হেডমাস্টার' গল্পেও কথক কাহিনির সঙ্গে বিজড়িত অন্তর্বৃত চরিত্র রূপে উপস্থাপিত। অবস্থা বৈগুণ্যে দেশত্যাগ ক'রে পূর্ব পেশা ত্যাগ ক'রে শিক্ষক কৃষ্ণপ্রসন্ন নিজের ছাত্রের শরণাপন্ন হয়েছেন। এই ছাত্র নিরুপমের কথনেই পুরো কাহিনি অংশ বিবৃত। গল্পের চতুর্থ পরিচ্ছেদের কিছু অংশ, যেখানে শিক্ষক মহাশয়ের যৌবনকালের কথা, তার বিবাহের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে সেইখানের বর্ণনা অংশ ঠিক উত্তমপুরুষীয় কথনরীতির নয় বরং সর্বজ্ঞরীতিই যেন অনুসৃত হয়েছে। বাল্যের শিক্ষকের অতীত জীবনের বর্ণনা যেন ছাত্রের জবানীতে যথাযথ ভাবে উপস্থাপিত হতে পারে না বলে মনে হয়, তবে "কথায় কথায় এম.ই.স্কুলের হেডমাস্টারের জীবনের আর এক গোপন অধ্যায় আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত হল।"— এই বাক্যের ভূমিকা দ্বারা লেখক সেই ত্রুটি দূর করেছেন।

'মুখ্য চরিত্রের আমি' দ্বারা বর্ণনার গল্প হিসেবে 'চড়াই - উৎরাই', বা 'অসবর্ণা' গল্পটির কথা উল্লেখ করা যায়। 'বিলম্বিত লয়' গল্পটিতে উত্তম পুরুষীয় নিরীক্ষণবিন্দু প্রযুক্ত হলেও মূল কাহিনির সঙ্গে প্রায়ই তিনি 'ইন্‌ভলভ্‌ড' নন। কিন্তু 'বিজয়ী', 'হেডমাস্টার', 'চড়াই-উৎরাই' বা 'অসবর্ণা' গল্পে কথক গল্পের কাহিনির সঙ্গে সম্পুর্নরূপে ইনভ্‌লভ্‌ড আই ('Involved I') রূপে উপস্থাপিত। তবে এক্ষেত্রেও গল্পগুলির নিরীক্ষণবিন্দুতে আরেকটি পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়, এই পার্থক্য হল পশ্চাদগামিতার। 'হেডমাস্টার' ও 'চড়াই-উৎরাই'-এ গল্প এগিয়ে গেছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আর 'অসবর্ণা' ও 'বিজয়ী' গল্পের কাহিনি বিবৃত হয়েছে ঘটনা ঘটবার বেশ পরে। ফলে উভয় ক্ষেত্রে যেন আত্মসচেতনতার পার্থক্য দেখা যাচ্ছে, পুরো ঘটনা জানবার ফলে পরবর্তীকালে বর্ণনার সময় সেই ঘটনার মূল্যায়নও যেন সঙ্গে সঙ্গে হয়ে চলেছে। "আমার লাইব্রেরী ঘরের জানালা থেকে প্রায়ই চোখে পড়ত অঞ্জলিকে। যেদিন কলেজ থাকত না, সেদিন সকালেই মায়ের রান্না জোগান দিতে আসত।" এই অতীত কালের ব্যবহারেই বোঝা যায় যে 'অসবর্ণা' গল্পের কথনরীতিতে পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ রয়েছে। যেহেতু কথকের বর্ণনা ও ঘটনার মূল সময়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, সেইহেতু ঘটনার বর্ণনা অপেক্ষা অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে কথকের মনে সেই ঘটনার প্রতিক্রিয়া; ফলে যে গল্প ঘটনা ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, আর যে কাহিনি ঘটনা ঘটবার পরে বর্ণিত হয়েছে সেখানে একই উত্তম পুরুষের বর্ণনারীতি অনুসৃত হলেও কথনরীতির পার্থক্য হয়ে গেছে। 'অসবর্ণা' গল্পে কথকের দীর্ঘ

ভাবনার স্থান তাই 'চড়াই-উৎরাই' গল্পে নেই। 'অসবর্ণা' গল্প থেকে এমনই এক স্বগত ভাবনার উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিস্কার করা যেতে পারে — "না, ব্যস্ত হইনি, কতবার ইচ্ছে হয়েছে ওর ছোট সুন্দর নরম হাতখানা নিজের মুঠির ভিতর ভরে রাখি, কতবার ইচ্ছে হয়েছে ওই পরিপূর্ণ পেলব দুটি ওষ্ঠাধারের স্বাদে বুভুক্ষ অন্তর ভরে নিই। কিন্তু সেই উদগ্র বাসনাকে সংযত করবার শিক্ষা আর সামর্থ্য আমার আছে। ... আর একটি ভীরু মেয়ের ভয়কে আমি ভালোবেসেছি, সম্মান করেছি। আমি ব্যস্ত হব না, ভুল বুঝবার কোন অবকাশ দেব না ওকে।" ঘটনাধারার সঙ্গে সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে বলে 'চড়াই-উৎরাই' বা 'হেডমাস্টার' গল্পে এ ধরনের ভাবনার স্তর প্রকাশিত হবার সুযোগ হয় নি।

উত্তমপুরুষীয় কথনরীতির একটি গুণ ও বৈশিষ্ট্য হ'ল এই রীতিতে গল্প কথক ও পাঠকের মানসিক ব্যবধান অনেকখানি কমে আসে, সর্বজ্ঞরীতি অপেক্ষা অনেক বিশ্বাসযোগ্যভাবে কথক নিজের অভিজ্ঞতা বা কাহিনি পাঠককে শোনাতে পারেন। ফলে বিশ্বাসযোগ্যতার আলোকে গল্পগুলি উদ্ভাসিত হয়। এই কথনরীতিতে কথক যেমন নিজের ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যা দিতে পারেন তেমনি নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা বা আলোচনামূলক স্বীকারোক্তির প্রকাশও এই কথনরীতিতে দুর্লভ নয়। এমন গ্লানিবোধ-এর প্রকাশ আছে 'বিজয়ী' গল্পে। এ গল্পে কথক নিজের এক বিশেষ দুঃখময় অভিজ্ঞতার প্রকাশ ক'রে সেই ঘটনার প্রতিশোধকল্পে নিজের কৃতকর্মের বর্ণনা দিয়েছেন। গল্পের সূচনাতেই কথক পাঠককে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভাবে নিজের কাহিনি বলতে শুরু করেছেন — "কয়েক বছর আগে আমি যখন কাঁটাপুকুর লেনে থাকতাম, বাড়িওয়ালা শশধর মল্লিক আমার নামে ট্রেসপাসের কেস ঠুকে দিয়েছিলেন।" এরপর কথক আদালতে ছোটাছুটি করতে করতে গলদঘর্ম হলেন এবং বিশেষ করে নিজের উকিল শ্রীবিলাস বাবুর ব্যবহারে তিনি সবচেয়ে বেশি বিরক্ত হলেন। গল্পে পাঠককে সরাসরি সম্বোধন করে কথক পাঠকের সঙ্গে নিজের দূরত্ব আরও কমিয়ে এনেছেন। যেমন —"কোন দিন কোর্টে যাওয়ার দুর্ভাগ্য আপনাদের হয়েছে কিনা জানিনা, কিছুদিনের মধ্যেই আমার ব্লাড ডিসেন্ট্রি হল।" কোর্টে ছোটাছুটি ও উকিলের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে মামলা শেষ হবার পর কথক মনে মনে বলেন — "দাঁড়াও, সময় যদি আসে, মজা একদিন তোমাকে দেখাব।" এরপর অভাবিতভাবে সে সুযোগ এসেগেছে। উকিলবাবুর স্ত্রীর সামান্য অসুস্থতার কারণে চিকিৎসক কথক, উকিলবাবুকে মাস দুয়েক হাসপাতালে দৌড় করিয়েছেন আর অনাবশ্যক ঔষধের তালিকা দিয়ে অকারণে খরচান্ত করেছেন। যখন লেখক ভেবেছেন তার প্রতিশোধ নেওয়া যথেষ্ট হয়েছে তখন সহসা রোগিণীকে সমস্ত কিছু প্রকাশ করে দিয়েছেন। যেহেতু কাহিনি ঘটে গেছে পূর্বে এবং তার অভিঘাত কথকের অন্তরে তখনও বর্তমান তাই উকিলবাবুর স্ত্রীকে সকল সত্য প্রকাশ করবার আগে বলেন — "তারপর কী যে আমার দুর্বুদ্ধি হল, হাসতে হাসতে বললাম, 'আপনাকে আমি অনেক আগেই ছেড়ে দিতে পারতাম'।" এখানে দেখা যাচ্ছে কথক প্রকৃতপক্ষে নিজের 'দুর্বুদ্ধি'র

বর্ণনাই দিচ্ছেন। তিনি প্রতিশোধস্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে যে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছিলেন তারই স্বীকারোক্তি যেন গল্পটি আর তার অনুশোচনার অনুভব হয়েছে রোগিণীর কথায় যেখানে রোগিণী হতবাক হয়ে গেছেন তার বিশ্বাসী বন্ধু চিকিৎকের প্রকৃত রূপটি জানতে পেরে। কথকের উপলব্ধির আলোকে গল্পের পরিসমাপ্তি —"আর আমার মনে হল, আমার সমস্ত কৃতিত্ব সেই মুহূর্তে একেবারে নস্যাৎ হয়ে গেছে। যাকে বিজয়ীর বরমাল্য ভেবেছিলাম, তা সোলার ফুল ছাড়া কিছু নয়।" অতএব দেখা যাচ্ছে নিজের ত্রুটি বা অন্যায়ের জন্য গ্লানিবোধ বা অনুশোচনার বিবৃতিতে কথক নিজের বক্তব্যকে বিন্যস্ত করেছেন।

কথনরীতির দিক থেকে নরেন্দ্রনাথের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গল্প হল 'ধূপকাঠি'। উত্তম পুরুষীয় কথনরীতির এই গল্পটির একটি দিক হল এইযে, গল্পটি লেখা হয়েছে পত্রের আকারে আর একটি দিক হল এই গল্পে পত্রের রচনাকার একজন মহিলা। নরেন্দ্রনাথের আত্মকথনরীতির গল্পে কথক অধিকাংশই পুরুষ, এই গল্পের ক্ষেত্রে একজন মহিলার কথনে গল্প উঠে এসেছে, শুধু তাই নয় এই পত্রে যার কাহিনি বিবৃত হয়েছে সেও একজন নারী। যদিও গল্পটি উত্তমপুরুষীয় রীতির কিন্তু এই গল্পের 'আমি' একজন 'নৈর্বক্তিক আমি' যিনি ঘটনাধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত নন। অন্য একজনের বক্তব্যকে বা কাহিনিকে একজন পত্রলেখিকা ব্যক্ত করেছেন ফলে গল্পটিতে প্রথমপুরুষীয় কথনরীতির ছোঁয়াই যেন অনুভূত হয়। গল্পের সূচনায় এই 'নৈর্বক্তিক আমি'র স্বীকারোক্তিতেই স্পষ্ট যে, পত্র লিখলেও পত্র লেখিকা নিজের কাহিনি বলছেন না —

"মান্যবরেষু,

আমি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিতা। বিনা পরিচয়ে আপনাকে এই চিঠি লিখতে বসেছি, আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। তবে আমার পক্ষ থেকেও একটি বলবার কথা আছে। আমি আপনার একটি পরিচিতা মেয়ের অনুরোধেই তার বক্তব্য আপনাকে লিখে জানাচ্ছি। প্রথমে তার জবানীতেই লিখতে শুরু করেছিলাম; কিন্তু সে এমন অগোছালো এলোমেলো ভাবে বলতে আরম্ভ করল যে, আমার পক্ষে তা গুছিয়ে লেখা অসাধ্য। তাই আমি তার কাছ থেকে সমস্ত ঘটনাটা জেনে নিয়ে তার বলবার কথা সাধ্যমত বুঝতে চেষ্টা করে আপনাকে এই চিঠি লিখছি।জানি না এতে উদ্দেশ্য কতটা সিদ্ধ হবে; তার মনের কথা কতটুকু আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো।"

এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে গল্পের লেখক পত্র লিখেছেন কিন্তু পত্রের এই 'আমি', 'সাক্ষী চরিত্রমূলক আমি'। এক অশিক্ষিতা, অনাথা নিরাশ্রয় গ্রামের মেয়ে নিজের কথা কোনো শ্রোতাকে বলছে বা পত্র লিখে প্রকাশ করছে — এ জিনিসটি মোটেই বিশ্বাসযোগ্য হত না তাই লেখক এমন 'সাক্ষী চরিত্রমূলক আমি'কে কথনরীতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। চিঠিতে বর্ণিত হলেও রেণুর কাহিনিতে লেখিকা যে কেবলমাত্র সাক্ষী চরিত্র, তার পরিচয় আছে পত্রের প্রত্যেকটি অংশেই, যেমন — "জানলার

একটি শিক আপনিই ভেঙে গিয়েছিল (রেণু তাই বলে), কি সে নিজেই তুলে ফেলেছিল (চৌধুরীদের অভিযোগ তাই) জানি না।" বা

"ব্যাপারটি নিয়ে যে পাড়ায় নানারকম কানাকানি, হাসাহাসি চলছে, তা আমিও লক্ষ্য করেছিলাম।" যাই হোক কথনরীতির দিক থেকে 'ধূপকাঠি' গল্পটি যে নরেন্দ্রনাথের গল্প ভাণ্ডারে একটু স্বতন্ত্র তা স্পষ্টতই অনুভবযোগ্য।

'ধূপকাঠি' গল্পটিতে যেমন 'পত্ররচনামূলক আমি'-এর প্রয়োগ হয়েছে তেমনই পত্ররচনামূলক কথনরীতির প্রয়োগ দেখা যায় 'পরীক্ষা' (প্রকাশ-পৌষ, ১৩৬৭) 'প্রথম পুরুষ' (প্রকাশ-শ্রাবণ ,১৩৭০), 'অঙ্গীকার' (প্রকাশ-অশ্বিন, ১৩৬২), প্রভৃতি গল্পগুলিতেও। এই গল্পগুলির প্রত্যেকটিই পত্র রচনার রীতিতে রচিত আর এর মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হল 'ধূপকাঠি' সহ এই চারটি গল্পের পত্ররচনাকারী মহিলা এবং পত্ররচনা করা হচ্ছে একজন পুরুষকে উদ্দেশ করে। প্রথমেই বলা হয়েছে উত্তমপুরুষীয় রীতির অধিকাংশ গল্পেই কথক হিসেবে নরেন্দ্রনাথ পুরুষ চরিত্রদেরই প্রাধান্য দিয়েছেন তবে এই পত্ররীতির গল্পগুলি ছাড়াও 'একুল-ওকূল', 'ভেনাস', 'অপরাধিনী' প্রভৃতি গল্পেও মহিলা চরিত্রের উত্তমপুরুষীয় কথনে গল্পের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। উপরে উল্লেখিত তিনটি গল্পে পত্ররচনামূলক আমির জবানি ব্যবহৃত হলেও তিনটি পত্রের মধ্যেই কথনরীতি গত বিশিষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। 'প্রথম-পুরুষ' গল্পটির সূচনা অংশ এইরকম — "আমি আপনার অপরিচিতা।" এখানে দেখা যায় যে, পত্র লেখিকা এমন একজনকে পত্র লিখেছেন যার কাছে তিনি পরিচিত নন, পত্র রচনার আদলে বক্তব্য প্রকাশিত হলেও এ পত্রে প্রকৃত পক্ষে ব্যক্ত করা হয়েছে বক্তা তথা পত্র লেখিকার নিজের জীবন কাহিনি। এর সমর্থন আমরা পাই গল্পের মধ্যেই — "আমার এই কাহিনীর প্রথম অংশটুকু যত সহজে লিখতে পারলাম তার পরের অংশটুকু তেমন করে লিখতে পারব না।" পত্র লেখিকা যার উদ্দেশ্য এই পত্র লিখেছেন তাকে ছাড়াও যে কোনো ব্যক্তিকে এই পত্র লেখা যেতে পারত, কারণ এই পত্ররীতির গল্পে পত্রের মূল উদ্দেশ্যটি ধ্বনিত হয় না। অপর দিকে 'অঙ্গীকার' গল্পটিতে পত্র রচনাকারী তার স্বামীকে পত্র লিখছেন যদিও সেই স্বামীর থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। পত্র অপেক্ষা এই আত্মকথনে নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়ার দিকটি যেন অধিক পরিমাণে প্রকাশিত। এই পত্র রচনার উদ্দেশ্য কেবল কুশল আদান প্রদান নয়, স্বীকারোক্তি করাই এর মূল উদ্দেশ্য। পত্র রচনা ব্যতীত নিজের ব্যক্তিগত ডায়ারিতেও এই বক্তব্য প্রকাশ করা যেত, গল্পের মধ্যে সেই সংকেতও বিদ্যমান — "প্রথমে ডায়েরি নিয়ে বসেছিলাম।... কিন্তু দু'চার লাইন লেখার পর মনে হল, দূর ছাই, নিজের মনে বসে বসে কেন মিছে বক বক করব, তাতো প্রায় রোজই করি। তার চেয়ে তোমাকে চিঠি লিখি।" অতএব এখানে দেখা যাচ্ছে পত্র লেখিকা 'প্রথম পুরুষ' গল্পের মত কোনও অচেনা ব্যক্তিকে চিঠি লিখছেন না বরং

নিজের অন্তরকে যার কাছে প্রকাশ করা যায় তার কাছেই চিঠি লিখছেন। অন্যের উদ্দেশ্যে লেখা পত্র তাই নিজের কাছে লেখা পত্র বলে বোধ হয়েছে — "নিজের কাছে লেখা আর তোমার কাছে লেখা এক হয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে।তুমিও যা আমিও তাই। তাই তুমি আর আমি অভিন্ন হৃদয়।" এইভাবে দেখা যাচ্ছে 'প্রথম পুরুষ' ও 'অঙ্গীকার' উভয় গল্পই পত্র রচনার রীতিতে রচিত হলেও যথার্থ পত্র নয় বরং প্রথমটিতে নিজের জীবনের গল্প প্রকাশ ও দ্বিতীয়টিতে আত্মভাষণমূলক স্বীকারোক্তি ফুটে উঠেছে। 'পরীক্ষা' গল্পে পত্রলেখিকা তার পূর্ব প্রণয়ীর উদ্দেশ্যে পত্র রচনা করেছেন। এই পত্রও প্রেরণ করা অপেক্ষা রচনা করার উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছে অধিক পরিমাণে। প্রকৃতপক্ষে 'ধূপকাঠি' ব্যতীত অন্য তিনটি গল্পের পত্রই প্রেরণ করার উদ্দেশ্যে রচিত হয় নি। সেখানে 'পত্ররচনামূলক আমি'র জবানিতে নিজের জীবন কাহিনি বর্ণনাই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

একটু ভিন্ন বা স্বতন্ত্র ধারার উত্তমপুরুষীয় কথনরীতি আমরা পাই 'উন্মোচন' গল্পে। গল্পটি ডায়ারির ধাঁচে লেখা। কথকের আটদিনের দিনলিপিই এ গল্পের অবয়ব গঠন করেছে। একটি মানুষের সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ পরিচয় বা নিগূঢ় আভাস পাওয়া যায় তার ব্যক্তিগত ডায়ারিতে। ডায়ারিতে সাধারণত মানুষ মিথ্যা কথা লেখে না, ভালোমন্দে মেশানো একান্ত ব্যক্তিগত পরিচয়টি তাই লিপিবদ্ধ থাকে ডায়ারির পাতায়। এই কারণেই গল্পে 'কথক আমি'র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক অবস্থার চিত্রণও প্রকাশিত আর একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই 'কথক আমি' ঠিক সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ নন, কিছুটা মনোবিকারের শিকার। যে আট দিনের কাহিনি দিনলিপিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে তা আসলে পাগলা গারদে তার অবস্থিতির কাল। মানসিক বিকারের রোগীর মনের অবস্থা, তার অভিজ্ঞতার আত্মভাষণ তাই গল্পে একটি পৃথক মাত্রা যোগ করেছে যা সর্বজ্ঞ কথনরীতিতে কখনও সম্ভব হত না। নিজের পাগলামি সম্বন্ধে সেখানে সংশয় আছে, সন্দেহ আছে আবার উপলব্ধিও আছে, যেমন — "আশ্চর্য, ওরা শেষ পর্যন্ত আমাকে পাগলা গারদে এনে ছেড়ে দিল। আমি কি এমনই উন্মাদের মত ব্যবহার করতে শুরু করেছিলাম?.... নিজের অজ্ঞাতসারে আমি কি তেমন উন্মত্ত হয়েছিলাম?" আবার কখনও গল্প কথক নিজের অসুস্থতাকে স্বীকারও করে নিয়েছেন — "আমি অবশ্য বদ্ধ উন্মাদ নই। আমাদের এই ব্লকে যারা আছে তারা কেউ তা নয়। আমরা সবাই অল্পসল্প মনোবিকারের শিকার।" একজন আংশিক মানসিক অসুস্থ ব্যক্তির ভাবনার স্তরটি পরিস্ফুট করতে এই কথনরীতি যে বিশেষ উপযোগী হয়ে উঠেছে তা বলা বাহুল্য। "লিখছি নিজের কাছে নিজের প্রকৃতিস্থতা প্রমাণ করতে কিন্তু সবাইতো নিজেকে প্রকৃতিস্থ বলেই ভাবে। শুধু আমার পাশের উকিলবাবু নন — ডাইনে বাঁয়ে দুদিকের ঘরগুলিতে আরো যে চার পাঁচজন পেশেন্ট আছেন তাঁরাও আমাকে বলেছেন তাঁরা সম্পূর্ণ সুস্থ তাঁদের কোনো মনের রোগ নেই। তাঁদের জোর করে এখানে ধরে রাখা হয়েছে।সুতরাং নিজেকে নিজে

সুস্থ মনে করাটাই যথেষ্ট নয়। আরো পাঁচজনেরও তা মনে করা চাই।তাহলে আমি হলাম আমাকে আর পাঁচজন যা বলে মনে করে আর আমাকে আমি যা বলে মনে করি তার সমষ্টি। কিন্তু আর পাঁচজনের ধারণার সঙ্গে আমার সম্বন্ধে আমার নিজের ধারণা নাও মিলতে পারে। তাছাড়া পাঁচজনের ধারণাই যে এক রকম তাই বা কে বলল?" উত্তমপুরুষের 'আমি' সম্পর্কে এমন আত্মবিশ্লেষণ অন্য কোনো কথনরীতিতে প্রায় অসম্ভব বলেই বোধ হয়। আত্মকথনের সঙ্গে সঙ্গে এখানে প্রবেশ করেছে চেতনাপ্রবাহরীতির আভাস।

উত্তমপুরুষীয় রীতিতে রচিত এসব গল্প ছাড়াও এমন কিছু গল্প আছে যেখানে কথকের স্মৃতিচারণায় কোনো কাহিনি বা চরিত্রের কাহিনি উঠে এসেছে। স্মৃতিচারণমূলক এমন উত্তমপুরুষরীতির গল্প হিসেবে 'মালাকর' বা 'যাত্রাপথ' গল্পদুটির কথা উল্লেখ করা যায়। উভয় গল্পেই দুজন চরিত্র কথকের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই দুই চরিত্রই গল্পের প্রধান, তাদের সম্পর্কে কথকের স্মৃতিই গল্প দুটিকে গড়ে তুলেছে।

বিয়ের এক মরশুমে পথচারী এক ভদ্রলোকের হাতে একটি শোলার মুকুট দেখে লেখক তথা কথকের বাল্যকালের গ্রামের এক মালাকারের কথা মনে পড়েছে ; সেই স্মৃতি পথেই গল্পের অগ্রগতি ও পরিসমাপ্তি। স্মৃতিচারণমূলক এই গল্পের সুচনা বাক্যটি এইরকম — "লিখতে বসে আজ আমার যাদব মালাকারের কথা মনে পড়ছে।" কোনো সুস্পষ্ট বা সুনির্দিষ্ট কাহিনি এ গল্পে নেই। কেবল স্মৃতিচারণই সম্বল, তাই গল্পের সমাপ্তি বাক্যটিও সেই স্মৃতিচারণকেই চিহ্নিত করে — "আজ লিখতে বসে আমার সেই যাদব মালাকারের কথা বড়ই মনে পড়ছে।" 'সেই' শব্দটির প্রয়োগে বোঝা যায় একটি বিশেষ চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলাই এই আত্মকথনের উদ্দেশ্য।

অপরদিকে 'যাত্রাপথ' গল্পটিও একটি বিশেষ চরিত্রকে পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্দেশ্য কথকের স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সুসাহিত্যিক অনন্তচরণ মালোর প্রথম স্মৃতিবার্ষিকী উদ্‌যাপনে কথক অংশ নিয়েছেন, তারপর সভা শেষে কথকের স্মৃতিচারণায় অনন্ত মালো চরিত্রটির নানা দিক ও কথকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ও তাঁর জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে। কথক সেই কাহিনি বর্ণনার পূর্বে কিছুটা ভূমিকাও করে নিয়েছেন —"ওকে নিয়ে আমি কাল্পনিক গল্প বানাবো না। ওর সাধারণ আটপৌরে জীবনের কথাই আমি লিখব।" এইভাবে ভূমিকার পর লেখক অনন্ত মালোর কাহিনি বিবৃত করেছেন— "অনন্ত আমাদের একই গাঁয়ের ছেলে, কিন্তু একই পাড়ার ছেলে নয়।" এখানে কথক আমি 'বিশেষ আমি' থেকে 'সাধারণ আমি'র দিকে অগ্রসর হয়েছে। নিজের স্মৃতিচারণা থাকলেও অনন্ত চরিত্রটিই প্রাধান্য লাভ করেছে এই কথনরীতিতে।

পূর্বেই বলা হয়েছে নরেন্দ্রনাথের গল্প রচনার একটি বহু প্রচলিত রীতি হল গল্পের সূচনায়

লেখক কথক হিসেবে বর্তমান থাকেন অর্থাৎ গল্পটি শুরু হয় উত্তমপুরুষ কথনরীতিতে তারপর সূচনার কথক শ্রোতা হয়ে যান এবং গল্পের সূচনার কথকের কোনো পরিচিত ব্যক্তি বা বন্ধু স্থানীয় কেউ কথকের দায়িত্ব পালন ক'রে গল্পের মূল কাহিনিঅংশ বিবৃত করেন, রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত ও রহস্যধর্মী গল্পে মানব মনস্তত্ত্বকে যথাযথভাবে পরিস্ফুট করতে গিয়ে এই কথনরীতিটির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। উদাহরণ হিসাবে 'নিশীথে', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'কঙ্কাল', 'মণিহারা' — এই চারটি গল্পের উল্লেখ করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে এই মূল কাহিনি অংশটি বিবৃত হয় সর্বজ্ঞরীতিতে। 'চাঁদমিঞা' গল্পটিতে এই পদ্ধতির কথনরীতির পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পের সূচনায় উত্তমপুরুষীয় কথনরীতির প্রয়োগ দেখা যায় — "ট্রামের মধ্যে দাঁড়াবার জায়গা ছিল না। নানা কসরতের পর দুই বন্ধুতে কোন রকমে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়েছিলাম।" এর পরবর্তীকালে কথকের বন্ধু মসিয়র গল্পের মুল কাহিনি অংশ বর্ণনার দায়িত্ব নিয়েছে কিন্তু গল্পে তার অস্তিত্ব মাত্র নেই বরং সর্বজ্ঞরীতিতেই গল্পে অগ্রসর হয়েছে। শেষ পরিচ্ছেদে এসে পুনরায় গল্প কথক ও বন্ধু মসিয়রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এবং সেই অংশটি পুনরায় উত্তমপুরুষীয় কথনরীতির প্রয়োগে বিবৃত।

প্রায় একই ধরনের কথনরীতির পরিচয় পাওয়া যায় 'রত্নাবাঈ' গল্পে। এখানে গল্পের সূচনা অংশের কথক গল্পের কাহিনি অংশে শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এবং তার পরিচিত আবীরচাঁদ রূপচাঁদ গল্পের মূল অংশের কথক হিসেবে কাহিনি বর্ণনা করেছেন। তবে এক্ষেত্রে গল্পের মূল অংশ 'চাঁদমিঞা' গল্পের মত সর্বজ্ঞকথনরীতিতে বর্ণিত নয় বরং আত্মকথনরীতিতেই বর্ণিত এবং কথক আবীরচাঁদ রুপচাঁদ কাহিনির একজন অন্তর্বৃত চরিত্র(Involved Charecter)। গল্পের শেষ পরিচ্ছেদে 'চাঁদমিঞা' গল্পের মত পুনরায় লেখক তথা কথকের সাক্ষাৎ মিলেছে যিনি গল্পের সূচনা অংশের কথক ছিলেন।

একইভাবে গল্পের সূচনা অংশের কথক এবং গল্পের মূল কাহিনি অংশের ভিন্ন কথকের উত্তমপুরুষীয় কথনরীতির গল্প আমরা পাই 'জৈব' গল্পটিতেও। তবে এখানে 'চাঁদমিঞা' বা 'রত্নাবাঈ' গল্পের মত গল্পের দ্বিতীয় কথক টানা গল্প বলে যান নি, মাঝে গল্পের প্রথম অংশের কথকেরও অনুপ্রবেশ আছে। গল্পের মূল কাহিনি অংশের কথক বাসবের বর্ণিত কাহিনি শুনে গল্পের মূল কথকের স্ত্রী করবীর কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তা গল্পের মূল কথকের জবানিতেই বর্ণিত হয়েছে। তিনি একাধারে গল্পের সূচনা অংশের কথক আবার মূল কাহিনি অংশের শ্রোতাও বটে। বন্ধু বাসব বর্ণিত উত্তমপুরুষীয় কথনরীতির কাহিনির প্রতিক্রিয়া তিনি নিজের আত্মকথনে বর্ণনা করেছেন —"বাসব একটু থেমে করবীর মুখের দিকে তাকাল। করবী একটি মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাচ্ছে। মুখে কোনো কথা নেই। কিন্তু শুনবার আগ্রহ যে তেমনি আছে সে সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ রইল না। বললুম, 'তারপর'?"

এইভাবে দেখা যায় নরেন্দ্রনাথের বহু গল্পে উত্তমপুরুষীয় কথনরীতি ব্যবহৃত হয়েছে, তবে তার মধ্যেও বহু বৈচিত্র্য আছে। কখনও উত্তমপুরুষের এই 'আমি' কাহিনির 'মুখ্য চরিত্র মূলক আমি' কখনও 'সাক্ষী চরিত্র মূলক আমি' কখনও বা 'পত্র রচনাকারী আমি'। আবার মুখ্য বা সাক্ষী চরিত্র মূলক আমির মধ্যেও কথনরীতির বৈচিত্র্যমূলক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই প্রসঙ্গের অবতারণার সময়েই বলা হয়েছে যে সর্বজ্ঞরীতি অপেক্ষা উত্তমপুরুষ কথনরীতিতে চরিত্রদের মানসিক অবস্থা ও আচার আচরণ আরও অন্তরঙ্গ ভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। এই সুবিধার সঙ্গে আরেকটি অসুবিধাও এই রীতিতে বর্তমান, সেটি হল কাহিনি গড়ে উঠবার ক্ষেত্রে হয়তো কোনো পরিস্থিতি প্রয়োজনীয় কিন্তু গল্প কথক চরিত্রটি সেই পরিস্থিতিতে উপস্থিত থাকতে পারেন না, এমন ঘটনা বা পরিস্থিতি বর্ণনার ক্ষেত্রে লেখককে বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রেখে বিভিন্ন কৌশলের সাহায্যে নিতে হয়। আমাদের গর্বের কথা, নরেন্দ্রনাথ এমন পরিস্থিতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। 'অসবর্ণা' গল্পটি থেকে এর উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। 'অসবর্ণা' গল্পের কথক চরিত্রটি তার সামাজিক অবস্থানের জন্যই মাছের বাজারে উপস্থিত হতে পারেন না। কিন্তু তিনি উত্তমপুরুষ কথনরীতিতে কর্ণনা করেছেন কালীমোহন বাবুর বাজার করবার কথা —

"গণেশ একেক দিন জিজ্ঞেস করে, 'কি চক্কোত্তি মশাই — মাছ নিলেন না?"

কালীমোহন বাবু জবাব দেন, 'না! ওই বরফ দেওয়া মাছগুলি আর নেব না গণেশ। একেবারে টেস্টলেস। তার চেয়ে গ্রীন ভেজিটেবলস্ অনেক ভালো,। খেতেও বেশ। স্বাস্থ্যের পক্ষেও উপকারী।'"

— এই বর্ণনা গল্পকথকের পক্ষে মোটেই স্বাভাবিক নয়, কিন্তু নরেন্দ্রনাথ এই বর্ণনাকে বিশ্বাসযোগ্য কেমন ক'রে করে তুলেছেন তা পরবর্তী অংশটির দিকে নজর দিলেই উপলব্ধি হবে — "গ্রীন ভেজিটেবলস্ কথাটার মানে কি বউদি ঠাকরুন -?'— গনেশ একদিন আমার সামনেই জিজ্ঞাসা করছিল বউদিকে।

বউদি মৃদু হেসে বললেন, 'কেন রে?'

কাহিনীটা তখন শোনা গেল।"

প্রথমেই বলা হয়েছে যে, নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর অধিকাংশ গল্প রচনা করেছেন সর্বজ্ঞকথন রীতিতে। তাঁর 'রস', 'পালঙ্ক', 'যৌথ', 'অবতরণিকা' প্রভৃতি গল্পগুলির সবই সর্বজ্ঞকথনরীতির। এই কথনরীতির গল্পগুলিতে এমন কিছু গল্প রয়েছে যেখানে লেখক প্রথমপুরুষীয় কথনরীতিতেই কোনো একটি চরিত্রের সত্তার সঙ্গে অন্তর্লীন হয়ে গল্পকে ফুটিয়ে তুলেছেন। সেই ক্ষেত্রে গল্পটি উত্তম পুরুষের কথনরীতির না হলেও একক একটি চরিত্রের দৃষ্টিকোণে বিধৃত। 'চিলেকোঠা' গল্পটির কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। গল্পটি প্রথমপুরুষ কথনরীতির হলেও গল্পটি গড়ে উঠেছে অমলেন্দু চরিত্রটির দৃষ্টিকোণ থেকে। একক চরিত্রের দৃষ্টিকোণ প্রাধান্য পাওয়ায় গল্পটিতে যেন প্রথমপুরুষীয়

কথনরীতি ও উত্তমপুরুষীয় কথনরীতির মিশ্রণ ঘটেছে বলে মনে হয়। অমলেন্দু চরিত্রটির দীর্ঘ অন্তর্ভাষণ দ্বারা উত্তমপুরুষীয় কথনরীতির বোধটি অধিক পরিমাণে সঞ্চারিত হয়, যেমন — "এই যে রীণার কিছু বলে না ডাকা, অমলেন্দুকে দেখে উল্লসিত হয়ে উঠা, তার সঙ্গে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করা, বেড়ানো, বয়সের ব্যবধান ডিঙিয়ে একেবারে সমবয়সী বন্ধু হয়ে যাওয়া — এ সব কি একান্তই অর্থহীন? এর মূলে কি আর কিছুই নেই? কিছুই আশা করবার মত নেই অমলেন্দুর?"

একইভাবে 'কাঁটা', 'শিখরে সুখ', 'আংটি' বা 'একক' গল্পগুলিতেও সর্বজ্ঞ কথনরীতির প্রয়োগ ঘটেছে কিন্তু মূলত গল্পের একটি চরিত্রের দৃষ্টিকোণই গল্পগুলির বর্ণনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। 'কাঁটা' গল্পের অনীতা, 'শিখরে সুখ' গল্পে সুজিত, 'আংটি' গল্পে বিজন এবং 'একক' গল্পে যোগেশ্বরের দৃষ্টিকোণেই গল্পগুলি বিবৃত।

সর্বজ্ঞরীতির গল্পগুলিতে যে চরিত্রের মন মানসিকতাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করা একটু দুরূহ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, তবু সর্বজ্ঞরীতির গল্পে নরেন্দ্রনাথ এমন কিছু চরিত্র অঙ্কন করেছেন যাঁদের মধ্য দিয়ে লেখক নিজের ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন। এই চরিত্রদের সংলাপ বা মানসিকতার বর্ণনায় লেখকের স্বরন্যাস অনেক সময়েই স্পষ্ট রূপে ধরা পড়েছে।

ছোটগল্পে সময়ের প্রয়োগরীতি

কোনো একটি ছোট গল্পের গড়ে ওঠার পশ্চাতে তার গঠন, চরিত্র ও স্থান যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি আর একটি মাত্রাকে গুরুত্ব সহকারে বিচার করা যেতে পারে সেই মাত্রা হল সময়। সময়ের এই গুরুত্বের কারণ "ছোট গল্পের মধ্যে জীবনের যে বিন্যাস ধরা পড়ে, কাহিনী বা চরিত্রের যে উন্মোচন ঘটে, তাকে যত সীমিতই হ'ক না, সময়ে গতিশীলতা কিছুটা মেনে চলতে হয়।"[১১] এই কাল বা সময়কে শক্তিমান গল্পকার বিভিন্ন ভাবে তার গল্পে ব্যবহার করতে পারেন। কালসচেতন ছোটগল্পকার গল্পে তার নিজের সময় বা কালকে যথাযথ ভাবে ব্যবহার ক'রে কাহিনিকে আরও ইঙ্গিতবহ ও তাৎপর্যময় ভাবে গড়ে তুলতে পারেন। এই সময়, এক হতে পারে গল্পের ঘটনাধারার সময়কাল, যা দীর্ঘ বা স্বল্পকালের ঘটনাধারাকে দীর্ঘ প্রলম্বিত সময়কালে বা হ্রস্ব সময়সীমায় আবদ্ধ করে।আবার কখনও এই সময়ের মধ্যেই নিহিত থাকে আরেকটি সময় যা ঘটনাধারার বিন্যাসের সময় নয়, সে সময় একটি কালকে সূচিত করে। প্রথম অধ্যায়ে নরেন্দ্রনাথের আর্বিভাব কাল ও সাহিত্যিক হিসাবে গড়ে উঠবার কালকে পরিস্ফুট করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে এবং সেই সমকাল তাঁর রচনায় কেমন করে ব্যবহৃত হয়েছে তা আলোচনার পূর্বে নরেন্দ্রনাথের গল্পে ঘটনাধারার সময় ও সেই সময়ের প্রয়োগরীতি সম্পর্কে প্রথমে আলোকপাত করা যেতে পারে।

সময়ের গতিশীলতা ও বিস্তার ছোটগল্পের ক্ষেত্রে খুব প্রলম্বিত হবে তা প্রত্যাশিত নয় কারণ, "অধিকাংশ ছোটগল্পেই স্থানের মতো কালের সীমা অনেক বেশী নিয়ন্ত্রিত ও সংহত।"[১২] নরেন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি পাঠ করলে দেখা যায়, এমন কিছু গল্প তিনি রচনা করেছেন যার কাহিনিগত সময়ের বিস্তার খুবই স্বল্পকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ, হয়তো বা মাত্র কয়েক ঘন্টা সময়কালের মধ্যেই তার কাহিনিগত সমাপতন। আবার এমন ছোটগল্পও তিনি রচনা করেছেন যার কাহিনি ধারা দীর্ঘ, হয়তো বা কয়েক দশকের বিস্তৃত কালপটে বিন্যস্ত। এই প্রসঙ্গে 'নেতা' ও 'ফিরে দেখা' এই দুটি গল্পের কথা উল্লেখ করা যায়। 'নেতা' গল্পের সময়গত বিস্তার মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ, অপর দিকে 'ফিরে দেখা' গল্পের মূল কাহিনির সময় কাল একেবারেই সীমিত হয়তো বা এক ঘন্টাও হবে না। কিন্তু অতীত ঝলকের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ চল্লিশ বছরের সময়কালকে ধরা হয়েছে। কাহিনিতে সময়ের বিস্তার স্বল্প হোক বা দীর্ঘ হোক সেই সময় যে কেবল গল্পের ক্রমিক ধারাবাহিকতাকে রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে তা নয়, নরেন্দ্রনাথ সময়কে অনেক ক্ষেত্রেই কাহিনির নিয়ামক হিসাবে ব্যবহার করতে পেরেছেন, গল্পের বিষয়ের সঙ্গে একাত্ম করে তুলে তাকেও একটি চরিত্রের মর্যাদা দিতে সক্ষম হয়েছেন।

নরেন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি গল্পের নামকরণেই সময়চেতনার দিকটি আভাসিত। যেমন —

'একটি বিনিদ্র রজনী', 'অপরাহ্ণ', 'ঝড়ের পরে', 'আগামী কাল', 'কোণ ক্ষণে' প্রভৃতি ছোটোগল্পে একটি নির্দিষ্ট কাল বা সময়কেন্দ্রিক নামকরণ চোখে পড়ে। বলাবাহুল্য এই সব গল্পে একটি সুনির্দিষ্ট সময়কে বিশেষভাবে ধরার চেষ্টা আছে। তবে এই গল্প ব্যতীতও বহু গল্পে নরেন্দ্রনাথ হয়তো সময় চেতনার দ্বারা নামকরণে উৎসাহী হননি কিন্তু সময় সেখানে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে, যেমন 'যৌথ' গল্পটি। গল্পের মধ্যে দীর্ঘ সাত বছরের কাহিনিগত বিন্যাসকে ধরা হয়েছে। এই দীর্ঘ সময় ফুটে উঠেছে চরিত্রদের স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে কিন্তু এই সময়ের মধ্যে চরিত্রদের মানসিকতার পরিবর্তন এবং এই সময়ের মধ্যে মানুষের যে চেহারা বা আকৃতিগত পরিবর্তন তাকে অপরিবর্তিত রাখার জন্য এক শিল্পির প্রয়াসই গল্পের মূল বিষয়বস্তু। দীর্ঘ সাত বছর আগে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় স্বরূপ তার চলবার শক্তি হারিয়েছে। অথর্ব হয়েও সে দাদা ও বৌদির স্নেহ, যত্ন ও ভালোবাসায় সুখেই দিন যাপন করত, কিন্তু "দিনের পর দিন সময় বদলায়, আর বদলায় মানুষের মন।" একটি নারীর সঙ্গ লাভের জন্য স্বরূপ অতিশয় আগ্রহী হয়ে উঠেছে, যে বউদি এতদিন নিজের ভালোবাসায় ভুলিয়ে রেখেছে, এই সাত বছরে সেও সৌন্দর্য ও যৌবন হারিয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই সৌন্দর্য হারানোর বেদনাই গল্পের মূল, এই সৌন্দর্য হারানোকে সহসা স্বরূপের বউদি মল্লিকা আবিষ্কার করেছে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। এই সত্য স্বরূপের কাছেও অজানা নয়। কিন্তু তবু সে মল্লিকার যৌবনকে সময়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ধরে রাখতে চায়, "একটু আধটু হাসি- ঠাট্টার সূত্র ধ'রে স্বরুপের মন সেই উচ্ছল অতীতের দিনগুলিতে ফিরে যেতে চায়। কাল যেন বদলায় নি। যেন ঠিক আগের মতই আছে মল্লিকা।" সময়ের সঙ্গে স্বরূপের এই লড়াই এর জন্যই গল্পে সময়কে একটি চরিত্রের মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে তার দেহ জীর্ণ হবে এ সহজ সত্যের ব্যত্যয় হয় না, তাই মল্লিকাকে তার যৌবন উচ্ছল সপ্তদশী রূপে অক্ষয় রাখতে স্বরূপ সাহায্য নিয়েছে তার শিল্পের। তৈরি করতে শুরু করেছে মল্লিকার আবক্ষ প্রতিকৃতি। স্বরূপের আকস্মিক মৃত্যুর পর তার অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করতে শুরু করেছে দাদা অনুরূপ। মল্লিকার প্রতি ভাই স্বরূপের মনোভাবের সত্য অনুরূপের কাছে উদ্‌ঘাটনেই গল্পের সমাপ্তি, কিন্তু সময়ের সঙ্গে মানবদেহের পরিবর্তন আর সেই পরিবর্তনকে অপরিবর্তিত রাখবার সংগ্রামই গল্পকে ভিন্ন ইঙ্গিতময়তায় উজ্জ্বল করে। মল্লিকার অর্ধসমাপ্ত প্রতিকৃতির দিকে তাকিয়ে অনুরূপ দেখেছে — "মল্লিকার আবক্ষ প্রতিকৃতি। এখনকার ভাঙ্গা চোরা ক্ষ'য়ে যাওয়া মল্লিকার নয়, দশবছর আগের সেই যৌবনোচ্ছলা সপ্তদশী মল্লিকা আবার এসে সামনে দাঁড়িয়েছে যেন।" এই অংশেই সময়ের গুরুত্ব গল্পে কতটা, তা উপলব্ধি করা যায়।

নরেন্দ্রনাথের একটি সুবৃহৎ ছোটগল্প 'বিলম্বিত লয়'। এই গল্পের আকৃতিগত দীর্ঘতার একটি কারণ এর কাহিনির সময়কালের দীর্ঘতা। একটি দীর্ঘ সময়ের কাহিনি এখানে তুলে ধরা হয়েছে আর

সময়ের সেই অতিবাহনকে লেখক একাধিক উল্লেখের মাধ্যমে ধরবার চেষ্টা করেছেন।

যেমন - ১। "মাস ছয়েকের মধ্যে এমন হাল হল ....।"

২। "আমি মাঝখানে আর একদিন খোঁজ নিয়ে জানলাম ....।"

৩। "মাস কয়েক আমি আর ওদের কোন খোঁজ- খবর রাখতে পারলাম না।"

৪। "এরপর বোধহয় বছরখানের কি বছর দেড়েক পরে অদিতির সঙ্গে আমার এক অদ্ভুত অবস্থায় দেখা হয়ে গেল।"

৫। "তারপর কাটল বছর দুই।"

এইভাবে কাহিনিবর্ণনার মধ্যে সময়ের প্রবাহমানতা ধরবার চেষ্টা করেছেন লেখক। সুদীর্ঘ সময়ের প্রেক্ষাপটে প্রসারিত এই গল্প ছোট বড় মিলিয়ে পনেরটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এই পরিচ্ছেদ-বিভাগের দ্বারাও লেখক সময়ের অতিবাহনকে বিবৃত করেছেন।

নরেন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত গল্প 'রস'। ঐ গল্পের সূচনাই হয়েছে কালের বর্ণনাতে — "কার্তিকের মাঝামাঝি চৌধুরীদের খেজুর বাগান ঝুরতে শুরু করল মোতালেফ।" এরপর সূচনার দ্বিতীয় বাক্যটিতেও সময়ের উল্লেখ সুস্পষ্ট — "তারপর দিন পনের যেতে না যেতেই নিকা করে নিয়ে এল পাশের বাড়ির রাজেক মৃধার বিধবা স্ত্রী মাজুখাতুনকে।" এই গল্পের মূল বিষয়ের সঙ্গে ওতোপ্রোত হয়ে আছে সময়,কারণ খেজুরের রসকে ঘিরে রসিক মানুষ মোতালেফের শুধু জীবিকা নয়, জীবনও আবর্তিত হয়। এই রস পাওয়া যায় শীতকালে। মোতালেফ রূপ-রসিক, সে চায় ফুলবানুকে বিয়ে করতে, সেই জন্য কন্যা পণের অর্থ সংগ্রহে সে সঙ্গী করেছে মাজুখাতুনকে যে খেজুরের রস থেকে উত্তম গুড় তৈরি করতে পারে। যেহেতু শীতকালই খেজুরের রস সংগ্রহের ওস্তাদ গাছি মোতালেফের জীবিকা অর্জনের শ্রেষ্ঠ সময়, তাই শীতকাল,শীতের সময় — এই সমস্ত সময় বা কাল নির্দেশক শব্দ লেখক ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত সচেতন ভাবে। ফুলবানুকে অপেক্ষা করতে বলে মোতালেফ বলেছে —"শীতের কয়ডা মাস যাউক, ত্যাজও দেখাব, মানও দেখাব।" অর্থাৎ শীতকালকে লক্ষ করেই তার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গড়ে উঠেছে, তাই —"শীতের সূচনাতেই পাড়ার চার পাঁচ কুড়ি খেজুর গাছের বন্দোবস্ত পেল মোতালেফ।" এরপর শুরু হয়েছে অর্থ সংগ্রহের জন্য মোতালেফের প্রবল সংগ্রাম, মাজু খাতুনের অভিজ্ঞ হাত তাকে সাহায্য করল প্রাণপণে, আর মোতালেফ নিজের ক্ষমতার শীর্ষে গিয়ে কাজ করতে লাগল। "পৌষের শীতেও সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ঝড়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে" মোতালেফের। এইভাবে কিছু অর্থ সংগ্রহ হলে কন্যা পণের অর্ধেক সে আগাম দিতে গেছে ফুলবানুর বাবাকে। এলেম শেখ যখন প্রশ্ন করেছে সে মাজু খাতুনকে বিয়ে করেছে কেন, তখনও মোতালেফের সংলাপ উঠে এসেছে সময়ের ইঙ্গিত — "গাছে রস যদ্দিন আছে, গায়ে শীত যদ্দিন আছে, মাজু খাতুনও তদ্দিন আছে আমার ঘরে,

দক্ষিণা বাতাস খেললেই সব সাফ হইয়া যাবে উইড়া।" এরপর শীতকাল শেষ হয়েছে, বসন্ত এসেছে, মোতালেফের ঘর থেকেও মাজু খাতুন বিদায় নিয়েছে, ফুলবানু এসেছে। লেখক প্রকৃতির বদল ও সময়ের পরিবর্তনকে সূচিত করেছেন সুস্পষ্ট ভাবে — "আমের গাছে বোলে ভরে উঠল, গাব গাছের ডালে ডালে গজাল তামাটে রঙের কচি কচি নতুন পাতা। শীতের পরে এল বসন্ত, মাজুখাতুনের পরে এল ফুলবানু।" মোতালেফের সুখের দিন শুরু হয়েছে, ফুলবানুকে নিয়ে প্রেমের জোয়ারে ভেসে গেছে সে। খেজুর গাছের রস অপেক্ষা অধিক আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে ফুলবানু, এক অনিঃশেষ রসের ভাণ্ডার বলে বোধ হয়েছে তাকে। মোতালেফের কথায় ফুটে উঠেছে সেই প্রেম- বিহ্বলতার চিত্র — "...গাছের রস দুই- চাইর মাসেই ফুরায় ফুলজান, কেবল তোমার রসই বছরে বার মাস চোঁয়াইয়া চোঁয়াইয়া পড়ে।" এদিকে সময় থেমে থাকে না, ঋতুচক্রের হাত ধরে পুনরায় ফিরে আসে শীত, নরেন্দ্রনাথও সুস্পষ্ট ভাবে তাকে ব্যক্ত করেন — "বসন্ত যায়, বর্ষা যায়, কাটে আশ্বিন কার্তিক ,ঘুরে ঘুরে ফের আসে শীত।" এই শীতকালেই বসন্তের সঙ্গী ফুলবানুর অকার্যকারিতার রূপটি ধরা পড়ে গেছে। অভিজ্ঞা মাজু খাতুনের মত সে গুড় তৈরি করতে পারে না, খ্যাতিমান মোতালেফের গুড় বাজারে বিকোয় না, এই নিয়ে শুরু হয় দাম্পত্য অশান্তি। যে শীতকাল মোতালেফের সর্বাপেক্ষা কাঙ্ক্ষিত সময়, সারা বছরের রোজগারের সময়, সেই সময়টুকুকে কোনো মতে অতিবাহিত করতে চায় সে, ফুলবানুকে বলে, "এই দুইটা মাস কাইটা গেলে কোন রকমে তোমার কষ্ট সারে ফুলজান।" অতএব দেখা যায় — 'রস' গল্পে সময় যেন মানব সম্পর্কের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। এক শীত থেকে আরেক শীত এই সময়ের ব্যবধানেই প্রিয়ার রূপ পরিবর্তিত হয়ে গেছে, কাঙ্ক্ষিত হয়ে উঠেছে অনাকাঙ্ক্ষিত। সময়ের এই প্রভাব গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে, কখনও প্রত্যক্ষ সংলাপে, কখনও বা লেখকের বর্ণনায় সময়ের অতিবাহনের সঙ্গে সঙ্গে সময়ের প্রভাবকে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন, যেমন — "হাটের পর হাট যায়, রসের বতর প্রায় শেষ হয়ে আসে; গুড়ের খ্যাতি বাড়ে না মোতালেফের, দর চড়ে না।" গল্পের মূল সংকট আসে সময়কে ধ'রে আর বিশেষ সময়ে মানব মনের অনুভূতি ও উপলব্ধিতে গল্প গড়ে ওঠে।

'হেডমাস্টার' ও 'দ্বিচারিণী' এই গল্প দুটির রচনাকাল একই, শ্রাবণ ১৩৫৬। একই সময়ে রচিত দুটি গল্পে সময়কে একটু ভিন্ন রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। উভয় গল্পের মুখ্য চরিত্ররাই ছিন্নমূল উদ্বাস্তু, পূর্ব পাকিস্তান থেকে কলকাতায় এসে প্রতিষ্ঠিত হবার সংগ্রামে রত। ফলে গল্পের যে বড় সময় সেই সময়ের ইঙ্গিত গল্পে স্পষ্টতই খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু গল্পের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মূল্যবোধের পরিবর্তন এবং কারও মানসিকতার অপরিবর্তন। 'হেডমাস্টার' গল্পে সাগরপুর এম.ই স্কুলের হেডমাস্টার মশাই কৃষ্ণপ্রসন্ন সরকার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে

নিজের শিক্ষক হবার মানসিকতাকে পরিবর্তন করতে পারেন নি, পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে অভিযোজিত করতে পারেন নি। অপর পক্ষে 'দ্বিচারিণী' গল্পে তরঙ্গ নিজেকে অপরিবর্তিত রাখতে পারেনি পরিস্থিতির চাপে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার যে পরিবর্তন তাই গল্পের মূল অন্বিষ্ট।

'হেডমাস্টার' গল্পের সূচনা ও সমাপ্তির মধ্যে সময়ের ব্যবধান মাস তিনেকের। তবে গল্পে কথকের স্মৃতিরোমন্থনে বিশ বছর পূর্বের কথাও উঠে এসেছে গল্পের মধ্যে। ব্যাঙ্কের অফিসার নিরুপম নন্দীর কাছে দর্শন প্রার্থী হয়ে এসেছেন তার বাল্যকালের মাস্টারমশাই কৃষ্ণপ্রসন্ন। এই সাক্ষাতের পর কৃষ্ণপ্রসন্নকে নিজের ব্যাঙ্কে কাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন নিরুপম। উত্তমপুরুষীয়রীতিতে বর্ণিত এই গল্পে সময়ের ধারা কে পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে স্পষ্ট করা হয়েছে, কখনো বর্ণনার মধ্য দিয়ে সময় এগিয়ে গেছে। এরই মাঝে কথকের স্মৃতিরোমন্থনের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে পূর্বকথা, কথকের সঙ্গে মাস্টারমশাই এর সম্পর্কের কথা, মাস্টারমশাইয়ের প্রেম ও বিবাহের কথা। গল্পের পঞ্চম পরিচ্ছেদের সুচনা হয়েছে এইভাবে — "কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের সম্বন্ধে এই রোমান্টিক আচ্ছন্নতা বেশি দিন বজায় রইল না। সপ্তাহ খানেক যেতে না যেতেই ঝড়ের বেগে ক্লিয়ারিং- এর পরিমল বাবু আমার চেম্বারে ঢুকলেন।" অতএব দেখা যাচ্ছে মাস্টারমশাই কৃষ্ণপ্রসন্ন সপ্তাহখানেক ব্যাঙ্কে কাজ করে ফেলেছেন, আর বিভিন্ন শাখা থেকে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থিত হচ্ছে। মাস্টারমশাই ব্যাঙ্কের কোনো ডিপার্টমেন্টেই নিজেকে মানিয়ে নিতে সক্ষম হন নি। মাস্টারমশাইয়ের বিরুদ্ধে উত্থিত বিভিন্ন অভিযোগের সময় সময়কালকে লেখক প্রকাশ করেছেন সংক্ষিপ্ত বাক্য রচনা করে, দীর্ঘ বর্ণনার দ্বারা তা ভারাক্রান্ত নয়। যেমন — "দু'দিন বাদে ফের মাস্টারমশাইয়ের নামে ননীবাবু অভিযোগ করলেন।" অথবা, "মাস দুয়েকের মধ্যে ব্যাঙ্কের সমস্ত ডিপার্টমেন্টে মাস্টারমশাইকে ঘুরিয়ে আনলাম।" একজন শিক্ষক, শিক্ষাদানই যার ব্রত এমন একজন মানুষ ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হয়ে এক নতুন স্থানে এসেছেন, জীবনধারণের জন্য যিনি যে কোনো বৃত্তিই গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, সেই মানুষটি কিন্তু এমন কঠিন পরিস্থিতিতে নিজের শিক্ষকতার মনোভাব ও আদর্শকে পরিত্যাগ করতে সক্ষম হননি। এমনকি অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেবার জন্য কোনো আপসের রাস্তায় হাটেননি। গল্পের শেষ অংশে দেখা যায়, ব্যাঙ্কের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে শেষে মাস্টারমশাইয়ের স্থান হয়েছে বেয়ারাদের সর্দারের জায়গায়। সেখানে গিয়েও শিক্ষক, শিক্ষকতার আদর্শ পরিত্যাগ না করে বেয়ারাদের শিক্ষিত করবার প্রচেষ্টা করেছেন তিনি। বেয়ারাদের হয়ে তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে তিনি অন্যান্যদের সঙ্গে যখন লড়াই করতে আরম্ভ করলেন, তখনও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসতে শুরু করল। কিন্তু এবার অভিযোগগুলি একটু ভিন্ন ধরনের। এই অভিযোগ পরিবর্তনের সময়টিও লেখক উল্লেখ করেছেন — "সপ্তাহ দুই বাদে অভিযোগের ধরনগুলি একটু অন্য রকম হতে শুরু করল।"এইভাবে দেখা যায় 'দু দিন বাদে','মাস দুয়েকের

মধ্যে', বা 'সপ্তাহ দুই বাদে', প্রভৃতি বাক্যবন্ধ ব্যবহার করে লেখক সময়ের ধারাকে ইঙ্গিত করেছেন। মাস্টারমশাই ব্যাঙ্কের ছুটির পর গোপনে বেয়ারাদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য তাদের পড়াতে শুরু করেছেন। সহসা এই সত্য গল্প কথক জানতে পেরেছেন এবং ভেবেছেন — "প্রথম মাস্টারীও মাস্টারমশাই এমন লুকোচুরির ভিতরেই শুরু করেছিলেন।" কলেজে পড়বার সময় কৃষ্ণপ্রসন্ন গৃহশিক্ষক হিসেবে যে মেয়েটিকে পড়াতে শুরু করেছিলেন, পরবর্তিতে তাকেই স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন।শিক্ষক হিসেবে সেই সুচনার কাল থেকে শুরু করে এক বেয়ারাদের শিক্ষাদেবার সময় পর্যন্ত এই দীর্ঘ কাল অন্তরে তিনি সেই শিক্ষাদানের মহান ব্রতকেই প্রদীপ্ত শিখার মত জ্বালিয়ে রেখেছেন আর সময়ের পরিবর্তনেও তা অপরিবর্তিত থেকে গেছে। এখানেই 'হেডমাস্টার' গল্পে সময়কে ব্যবহার করেছেন লেখক, যা চরিত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে এক পৃথক মর্যাদা লাভ করেছে।

'দ্বিচারিণী' গল্পের সূচনা ও সমাপ্তির মধ্যে কালগত ব্যবধান মাস তিনেকের। তরঙ্গ নাম্নী এক দরিদ্র গৃহবধূ অবস্থার চাপে বাড়ি-বাড়ি ঝি এর কাজ করতে শুরু করেছে। অন্যান্য পেশাদার ঝিদের সঙ্গে সমগোত্রীয় সে হতে পারে নি, যেহেতু সে এ পেশায় সহসা এসেছে। যে বাড়িগুলিতে সে কাজ করে, সেখানে সে অন্তরঙ্গ ও নিষ্ঠার সঙ্গেই সমস্ত কাজকর্মে রত হয়, এ যে তার নিজের বাড়ি নয় তা সে মনে করতে পারে না।কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই মানসিকতাকে সে ধরে রাখতে পারেনি, দুই মালিক পরিবারের ঠাণ্ডা লড়াইয়ের কারণ হয়ে উঠেছে সে আর এই লড়াইয়ের ফলশ্রুতিতে সে পরিণত হয়েছে সম্পূর্ণ পেশাদার ঝিতে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার পরিবর্তন ও মানসিকতার বিবর্তনই গল্পের মূল। তরঙ্গকে ঘিরে কেমন করে অসীমা ও মমতার পরিবারের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হল আর তার প্রভাব কেমন করে তরঙ্গের উপর পড়ল তা লেখক সুনির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখে বুঝিয়ে দিয়েছেন ।গল্পের শুরুতেই একটি প্রত্যক্ষ সংলাপের মধ্য দিয়ে মমতা ও তরঙ্গের পরিচয় হয়েছে, বান্ধবী অসীমা পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত তরঙ্গকে মমতার বাড়িতে ঝিয়ের কাজে পাঠিয়েছে। এর পর দিন মমতা কাজে লেগেছে মমতার বাড়িতে। লেখক সেই সময়ের উল্লেখ করেছেন — "পরদিন থেকে মমতার বাসায়ও কাজ শুরু করল তরঙ্গ"। এরপর লেখক সাধারণ বর্তমান কালের বাক্য রচনা করে সময়ের অতিবাহনকে প্রকাশ করেছেন, 'নিখুঁতভাবে কাজ করে'। অতএব দেখা যাচ্ছে তরঙ্গ মমতার বাড়িতে কাজ করছে নিয়মিতভাবে এবং তার কাজে সবাই খুশি। এরপর কাহিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছে। দিন সাতেক পরে অসীমা তরঙ্গের নতুন মনিবের বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করেছে আর মমতা তরঙ্গকে একখানি ভালো ব্লাউজ দিয়েছে দেখে জটিল মানসিক পরিস্থিতিতে দিন কতক পরে সেও তরঙ্গকে একখানি শাড়ি উপহার দিয়েছে। এইভাবে কাহিনিতে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আর সেই সময়কে সুনির্দিষ্ট করে লেখক উল্লেখ করেছেন। যেমন — "সপ্তাহখানেক বাদে অসীমা একদিন জিজ্ঞাসা করল" বা "তারপর দিন তিনেক

বাদে অসীমা চওড়া- পেড়ে খয়েরী রঙের পুরনো একখানা তাঁতের শাড়ি দিল তরঙ্গকে।" সময়ের সঙ্গে তরঙ্গকে নিয়ে অসীমা ও মমতা এই দুই মনিবের মধ্যে এক মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। প্রথম প্রথম তরঙ্গ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেও ধীরে ধীরে এই ঠাণ্ডা লড়াইকে সে উপলব্ধি করেছে এবং নিজের সুবিধেমতো এই দ্বন্দ্বে ইন্ধন জুগিয়েছে। কেমন করে দুই বাড়ির মধ্যে ধীরে ধীরে সর্ম্পকের অবনতি ঘটল, এক জটিলতার সৃষ্টি হল, লেখক তার বর্ণনা করেছেন, তার সঙ্গে সঙ্গে সময়ের উল্লেখও করেছেন স্পষ্ট ভাবে। কখনো বর্ণনার ভাষায় উঠে এসেছে সেই সময়, আবার কখনো চরিত্রদের সংলাপ বা স্বগত ভাষণে। যেমন—

১। "পরদিন তরঙ্গের পড়নে খয়েরী শাড়ি দেখে মমতা একটু অবাক হয়ে গেল।"

২। "তারপর দিন চার পাঁচ বাদে মমতা হঠাৎ একদিন প্রস্তাব করে বসল...।"

৩। "দু'মাস ধরে কাজ করছে তরঙ্গ,এর মধ্যে বৃষ্টি- বাদল, অসুখ- বিসুখের অজুহাতে একটা বেলাও কামাই করেনি।"

৪। "সিনেমা দেখে আসার পরদিন, যত সকালে সাধারণত উঠে তার চেয়েও বেশি ভোরে উঠে হরমোহন ঘোষ লেনে অসীমাদের বাসায় কাজ করতে এল তরঙ্গ।"

৫। "রবি বার। নীরদ বিছানায় আড় হয়ে শুয়ে হাতের তেলোর উপর মাথা রেখে কি- একটা নভেল পড়ছিল।"

এইভাবে সময়ের ধারা বয়ে গেছে, কাহিনির জটিলতায় একের পর এক গ্রন্থি পড়েছে, জটিল অবস্থা জটিলতর হয়েছে। আর সেই সময় বর্ণনার উল্লেখ এসেছে বারবার যেমন —"কেবল একদিন নয়, তারপর থেকে রোজই এমন হতে লাগল।"

গল্পের শেষ অংশে গল্পের শীর্ষবিন্দু উপস্থিত। উভয় পরিবারের মধ্যে কাজের ঝিকে নিয়ে রেষারেষিতে শেষ পর্যন্ত তরঙ্গ মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছে। অসীমা ও মমতার উভয়েরই আহ্বানকে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অস্বীকার করে সে উভয় সংকট থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করেছে। এমন করেই সে পেশাগত ঝিদের সমগোত্রীয় হয়ে উঠেছে। ক্ষ্যান্ত, মানদারাও তরঙ্গের এই পরিবর্তনে উল্লসিত। কেবল এই কয়েকটি মাসে তরঙ্গের অতিরিক্ত পরিশ্রমজনিত কারণে স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য তারা দুঃখ করেছে। কিন্তু তরঙ্গের চোখ জলে ভরে উঠেছে। সে পরিবর্তিত হতে চায় নি। কিন্তু সময় তাকে রেহাই দেয় নি, পরিবর্তিত করেই ছেড়েছে।গল্পের শেষ পরিচ্ছেদের সূচনা বাক্যটিও সময় নির্দেশক — "দিন দুই পরে অসীমা বলল,"। আবার ক্ষ্যান্ত , মানদা, প্রভৃতিদের সংলাপেও বিগত সময়ের তরঙ্গের দুরবস্থার ইঙ্গিত বর্তমান আর সময়ের উল্লেখও তাতে স্পষ্ট — " ক'মাস আগে যদি বুদ্ধিটা খেলত, তাহলে কি আর খেটে খেটে এমন হাড্ডিসার হতিস?" এইভাবে বেশ কিছু দিনের অতিবাহনে কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে

গিয়ে লেখক একটি নির্দিষ্ট দিনে নিয়ে গেছেন, যেখানে তরঙ্গের উপলব্ধি, চরিত্র ও আচরণগত পরিবর্তন সুচিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা, কালগত ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন নরেন্দ্রনাথ।

নরেন্দ্রনাথের 'উন্মোচন' গল্পটি তার আঙ্গিকের কারণেই সুনির্দিষ্ট দিন- তারিখযুক্ত সময়কে নির্দেশ করতে সক্ষম। গল্পটি ডায়ারির রীতিতে লেখা, ডায়ারি লেখা শুরু হয়েছে ১৬ই জুলাই, ১৯৬৮ তারিখে এবং শেষ হয়েছে ২৩ শে জুলাই। আটদিনব্যাপী ডায়ারি লেখা হলেও সেই লেখায় দিনলিপি অপেক্ষা প্রাধান্য পেয়েছে অতীতের স্মৃতিচারণ। তবে প্রতিদিনের লেখাকে পৃথক পৃথক পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে এবং পরিচ্ছেদের সুচনায় সেদিনের তারিখটি উল্লেখ করা হয়েছে।

নরেন্দ্রনাথ তাঁর গল্পের কালকে অতীতানুসারী করেননি। তাঁর গল্পের কাল মূলত সমকাল। তবে কোন কোন গল্পে, যদিও এমন গল্পের সংখ্যা খুবই কম, সেখানে গল্প কিছুটা অতীতচারী হয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'চাঁদমিঞা' গল্পটির কথা উল্লেখ করা যায়। 'চাঁদমিঞা' গল্পের মূল কাহিনি অতীতের, তবে তা ইতিহাসের কালের নয় বা সুদূর অতীতেরও নয় বরং, অদূর অতীতের। গল্পের প্রধান চরিত্র 'চাঁদমিঞা', গল্পের কাহিনির কথক মসিয়রের 'বাবারই আপন চাচা'। অতএব গল্পের সময়ের দুটি তল পরিলক্ষিত হয়। একটি গল্প বলবার সময় যা বিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ আর একটি সময় তার তিন প্রজন্ম পূর্বের, যা গল্পের কাহিনি অংশের কালকে সূচিত করছে। অদূর অতীতের এই কাহিনির সময়কে লেখক প্রকাশ করেছেন প্রতিবেশ বর্ণনার মধ্য দিয়ে, সময়ের সুনির্দিষ্টতা সেখানে নেই। জমিদারী ব্যবস্থা, হাইকোর্ট ও পুলিশ ইন্সপেক্টরের উল্লেখে অনুমান করা যায় যে কাহিনির সময় কাল ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ বা শেষভাগ।গল্পে উল্লেখিত সময় প্রকাশক ইঙ্গিতগুলিকে উদ্ধার করা যেতে পারে —

১। "মীরপুর এবং আশেপাশের পাঁচ- সাতখানা গাঁয়ের জমিদার ছিলেন নশরৎ আলী মৃধা।"

২। "হাইকোর্টে কি একটা বাটোয়ারার মামলায় হেরে নশরৎ আলী সেদিন কিঞ্চিৎ মনঃক্ষুন্ন হয়ে ব'সেছিলেন।"

৩। "খবর পেয়ে থানার ইন্সপেক্টর চৌধুরী সাহেব বন্ধুবৎ সমবেদনা জানাতে এলেন।"

'চাঁদমিঞা'— গল্পের কাহিনি হয়তো খুব বেশি পুরনো সময়ের নয়, তবুও নরেন্দ্রনাথের সমকাল-নির্ভর ছোট গল্পের ভাণ্ডারে এমন অতীতের দিকে পেছন ফেরা গল্পও দুর্লভ। সেই হিসেবেই গল্পের সময়ের ধারায় 'চাঁদমিঞা' গল্পটি নরেন্দ্রনাথের গল্প ভাণ্ডারে একটু স্বতন্ত্র মনোযোগের দাবী করে।

নরেন্দ্রনাথের অধিকাংশ গল্পের কাহিনি ঘটে গেছে পূর্বে, পরবর্তীতে কোন কথকের দ্বারা

কথকতার ভঙ্গিতে গল্পটি বিবৃত হয়েছে। এর ফলে তাঁর অনেক গল্পের অভিমুখই একটু অতীতের দিকে ফেরানো, কিন্তু সেই অতীত সুদূর অতীত নয়। 'চাঁদমিঞা'র মত একটু পশ্চাদ্‌গামী সময়ের গল্প হল 'রত্নাবাঈ'। নরেন্দ্রনাথ ১৯৪৫ সাল নাগাদ ব্যাঙ্কে কাজ করবার সময় জব্বলপুরে বদলি হয়েছিলেন। 'রত্নাবাঈ' গল্পে সেই জব্বলপুরের পটভূমি কিছুটা ব্যবহৃত হয়েছে। গল্পের মূল কাহিনি অংশ শুরু হয়েছে গল্পের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে, আর মূল কাহিনির কথক আবীরচাঁদ রূপচাঁদ নামক ব্যক্তি। গল্পের প্রথম অংশে আবীরচাঁদ রূপচাঁদের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাতের ইতিহাস ও গল্পের কাহিনি অংশে প্রবেশের কিঞ্চিৎ মুখবন্ধ করা হয়েছে। আবীরচাঁদের মুখের কাহিনি শোনা এবং লেখকের গল্প লেখার কালেও কিছু সময়ের ব্যবধান আছে। "মধ্যপ্রদেশের একটি নাতিখ্যাত শহরে আবীরচাঁদ রূপচাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল"।— এই বাক্যটি তার প্রমাণ দেয়। লেখকের আবীরচাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল বেশ কিছু কাল পূর্বে আর সেই সময় আবীরচাঁদের বয়স ছিল ষাট বছর।গল্পে তার উল্লেখ আছে — "এই ষাট বছরের সাধারণ- দর্শন পাথরের ব্যবসায়ীটি সম্বন্ধে আমার তেমন কোন উৎসুক্য ছিল না"। গল্পের কাহিনির প্রারম্ভিক সময়ে আবীরচাঁদের বয়স "চব্বিশ বছর পেরিয়ে গেছে"। অতএব গল্পের কাহিনির প্রারম্ভের সময় বিচারে আবীরচাঁদের সঙ্গে রত্নাবাঈয়ের সাক্ষাতের সময়কাল মোটামুটি ১৯১০ সাল। ১৯৪৫ সালে নরেন্দ্রনাথ জব্বলপুরে গেলেন, আর তখন আবীরচাঁদের বয়স ষাট বছর অতএব আবীরচাঁদের চব্বিশ বছর বয়সে কাহিনি আরম্ভ হলে সেই সময়টা ১৯১০ নাগাদ হয়। 'রত্নাবাঈ' এর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর দ্বিতীয় সাক্ষাৎ পনেরো বছর পর, সেই সময় আবীরচাঁদের বয়স চল্লিশ, —"এই বয়সেই স্ত্রীরত্ন লাভ করে বসেছে, চল্লিশ বছরেও যা আমি পেরে উঠিনি।" এরপর কাহিনি আর বেশি সময় ধরে অগ্রসর হয়নি। অতএব 'রত্নাবাঈ' গল্পের মূল কাহিনির সময়ের ব্যাপ্তি কালবিচারে মোটামুটি ১৯১০ থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে সীমায়িত।

গল্পটির কাহিনি অংশ দীর্ঘ পনেরো বছরের দীর্ঘ কালসীমায় বিধৃত হলেও পনেরো বছরের কাহিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃত হয় নি.বরং রত্নাবাঈয়ের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর পরবর্তী সাক্ষাতের সময়কালকে সামান্য কয়েকটি বাক্য দ্বারা অতিক্রম করা হয়েছে — "মাসের পর মাস কাটল, ঘুরে এল বছর।" রত্নাবাঈকে আবীরচাঁদ বহু খুঁজেছেন কিন্তু পাননি, কেবল চোখের সামনে, মনের মধ্যে রত্নাবাঈ এর রূপটি আটকে থেকেছে। এইভাবে কেটে গেল দীর্ঘ পনের বছর,লেখক এই সময় কালকে বিবৃত করেছেন এইভাবে — "তবু খুঁজে খুঁজে কিছুতেই তাকে পাওয়া গেল না। মনের মধ্যে কাঁটার মত দিনের পর দিন সে বিদ্ধ হয়ে রইল চোখের সামনে, ফুলের মত কোন দিন ফুটে উঠল না।" এর পরের পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছে এইভাবে — "বছর পনের বাদে সন্ধ্যার পরে ....।" এইভাবে দেখা যায় গল্পের ক্ষেত্রে অনাবশ্যক সময়ের অতিবাহনকে তিনি সংক্ষিপ্ত বিবৃতির দ্বারা সংহত করেছেন, শুধু তাই নয় এই

সময়ের ব্যবধান বোঝাতে পৃথক পরিচ্ছেদেরও ব্যবহার করেছেন।

আবীরচাঁদ রত্নাবাঈ এর পুত্র চন্দনলালের দেখা পেয়েছে, তার সুত্রে দেখা পেয়েছে রত্নাবাঈয়ের। এই সময় কাহিনি এগিয়েছে একটু দ্রুত গতিতে।এই সময় প্রবাহকে লেখক বর্ণনা করেছেন সুস্পষ্ট উল্লেখ দ্বারা।

যেমন - ১। "…. মণিবাঈ'র এর নাচের আসরে চন্দনলালকে তার পর দিনও দেখা গেল।"

২। "পরদিন চন্দনের বাড়ির খোঁজে বেরুলাম।"

৩। "দিন কয়েকবাদে বেণীপ্রসাদের সঙ্গে ফের এল চন্দনলাল।"

৪। "তারপর একদিন সত্যিই ডাক এল রত্নাবাঈ'র এর কাছ থেকে।"

এইভাবে দেখা যায় 'রত্নাবাঈ' গল্পে নরেন্দ্রনাথ গল্পের কাহিনিতে দীর্ঘ পনের বছরের ঘটনাধারাকে বিবৃত করেছেন, কিন্তু এই দীর্ঘ সময়কে বিবৃত করা হয়েছে সংযতভাবে। কেবলমাত্র গল্পের গড়ে উঠবার জন্য প্রয়োজনীয় কাহিনিটুকুর সময়কালকেই বিবৃত করেছেন আর সময়কেও কাহিনির সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তবে গল্পে শেষে আবীরচাঁদের স্মৃতির মধ্যে কাহিনির অনিঃশেষ ব্যাপ্তির ইঙ্গিত আছে — "শেষ? না বাবুজী এ গল্পের আজও শেষ হয় নি।" এছাড়া এ গল্পে সময়ের দুটি তল পাঠকের চেতনায় জাগ্রত হয়। এক শ্রোতা রূপে শোনাবার যে সময় আর এক কথকের অভিজ্ঞতায় বিধৃত সময়।

'হলদেবাড়ি' গল্পের কাহিনির সময়গত ব্যাপ্তি অতি সামান্য , একটি সন্ধ্যা ও রাতের মধ্যে কাহিনির সমাপ্তি। এখানে রাত্রিকালীন সময়কে ব্যবহার করে প্রথমে চরিত্রদের মানসিকতার সঙ্গে সমধর্মীরূপে জ্যোৎস্নালোককে উপস্থাপন করা হয়েছে, এরপর সেই জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি ব্যবহৃত হয়েছে চরিত্রদের মানসিকতার বিপ্রতীপে। গল্পের শুরুতেই আছে রাত্রীকালীন সময়ের বর্ণনা — "চাঁদের আলো সাদা মোমের মত গলে পড়েছে শহরের ওপর।" এমন সুন্দর সন্ধ্যায় চিন্ময় ও অঞ্জনা প্রণয় জোয়ারে ভেসে গেছে, তারা পথ দিয়ে হাঁটার বদলে যেন বাতাসে ভেসে গেছে। এই সময়ও লেখক পুনরায় সময়কে উল্লেখ করেছেন — "জ্যোৎস্নায় ভিজে উঠেছে।" এমন সময়েই হঠাৎ ছন্দ পতন ঘটেছে। অপরূপ জ্যোৎস্নালোকে সহসা ডাস্টবিনে খাদ্য সংগ্রহকারী এক কুৎসিৎ কদাকার মানুষের অবয়ব দেখা গেছে। পৃথিবীর রুক্ষ মাটিতে যখন নিরন্ন মানুষদের খাদ্য সংগ্রহের সংগ্রাম চলেছে তখন প্রকৃতি কিন্তু একই রকম অকৃপণ, অবারিত হস্তে তার জ্যোৎস্নার দাক্ষিণ্য বিতরণ করে চলেছে। প্রকৃতির অসামান্য রূপের বিপরীতে খাদ্য অন্বেষণকারী ডাস্টবিনের মানুষটি কুৎসিততর হয়ে দেখা দিয়েছে — "এই জ্যোৎস্না সমুদ্রের মধ্যে কদাকৃতি এক কুমীরের পিঠ ভেসে উঠল অঞ্জনার চোখের সামনে।" সহসা সেই বুভুক্ষ মানুষটি তার নোংরা হাত দিয়ে অঞ্জনার পা জড়িয়ে ধরেছে। প্রচণ্ড বিরক্তি ও ঘৃণায়

অঞ্জনা ছিটকে বেড়িয়ে এসেছে। তাদের প্রণয় বিহ্বলতা কেটে গেছে। ট্যাক্সি নিয়ে তারা ফিরে এসেছে বাড়িতে।এই সময়েও গল্পে সময়ের উল্লেখ আছে — "আসলে রঙ এই জাহাজী প্যার্টানের বাড়িখানার সাদা নয়, হাল্কা হলদে। রাত্রে এমন দেখাচ্ছে।" এর পর অঞ্জনা তার শুচিবায়ুগ্রস্ততার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তাকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে, তখনও — "জানালা দিয়ে চাঁদের আলো গলে পড়ছে।"

এইভাবে সমগ্র গল্পের স্বল্প ব্যাপ্ত সময়কালের মধ্যেও রাত্রিকালীন সময় ও জ্যোৎস্নালোকিত প্রকৃতির বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। এই সন্ধ্যা ও রাত্রির প্রেক্ষাপট প্রকৃতপক্ষে গল্পের মূল সংবেদন সৃষ্টির জন্য একান্ত আবশ্যক। গল্পের গূঢ় মুহূর্তগুলি ফুটিয়ে তুলতে এই রাত্রির প্রেক্ষাপটটি ব্যবহৃত হয়েছে। গল্পের প্রথম অংশে প্রণয় সঞ্চারে ও শেষাংশে ঘৃণার উদ্‌বোধনে একটি নির্দিষ্ট কালকে ব্যবহার করে কাহিনি ও সময়বিন্যাসের নিখুঁত অন্বয় ঘটিয়েছেন লেখক।

একইভাবে 'চিলেকোঠা' গল্পে অমলেন্দু ও রীণার প্রণয়াবেগের বর্ণনাতেও একটি সুনির্দিষ্ট ঋতুর উল্লেখ করেছেন লেখক।বসন্ত ঋতুর উল্লেখ দ্বারা কাহিনির সময়কে ধরেছেন লেখক — "বসন্তের গানই উপযোগী হবে। কালটাও তো তাই। তোমার ছাদে দাঁড়িয়ে কোকিলের ডাক শুনেছিলাম।"

এখন দেখা যাক নরেন্দ্রনাথের গল্পে 'বড়' সময় কেমন করে ছায়াপাত করেছে। 'বড় সময়' অর্থাৎ যে সময় কাহিনির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠে যা কেবল গল্পের কাহিনি বিন্যাসের সময় নয়। কাহিনির মধ্য দিয়ে কাল সূচক যে সময়কে ধরা হয় তাকেই আমরা 'বড় সময়' নামে অভিহিত করছি।

নরেন্দ্রনাথের বাংলা ছোটগল্পের জগতে আর্বিভাব এক বিশেষ অগ্নিগর্ভ সময়ে। প্রথম অধ্যায়ে সেই সময়কালের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসকে কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনার মধ্য দিয়েই পরিবেশন করা হয়েছে। তার সঙ্গে এও বলা হয়েছে যে, ঐ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাল তাঁর বর্ণনার প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে নি। মানব মনের নানা টানা পোড়েন ও বৈচিত্র্যময় রহস্যময়তাই তাঁর গল্পের প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। সম্ভবত এই কারণেই সমালোচক বলেন — "নরেন্দ্রনাথের গল্প সাহিত্যের বিশ্লেষণে মনে হয় যে প্রখর কালসচেতন গল্পকার হওয়া সত্ত্বেও সমকাল চেতনা নরেন্দ্রনাথের ছোটগল্পের প্রধান লক্ষণ নয়।"[১৩] — এ মন্তব্য থেকেই অনুভূত হয় যে, সমকাল সম্বন্ধে সচেতন থাকা সত্ত্বেও এই সমকালকে তিনি তাঁর ছোটগল্পের প্রধান বিষয় করে তোলেননি। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে তাঁর ছোটগল্পগুলি পাঠ করলে দেখা যায় সমকাল বা সময়ের চিহ্ন তাঁর গল্পে স্পষ্ট। কখনও এই সময় রয়েছে প্রত্যক্ষ ভাবে এখনও পরোক্ষভাবে। সময়ের সুস্পষ্ট উল্লেখ ছাড়াও, কখনো কখনো গল্পের পাত্র পাত্রীদের আচার আচরণ, সংলাপ ও জীবনসংকটের বিশেষত্ব, তাদের অবস্থিতির কালকে আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত করে। দেশ-কালের দাবিকে অন্যান্য সমাজ-সচেতন, কাল-সচেতন গল্পকারের মতই তিনি উপেক্ষা বা অস্বীকার করেন না, তাই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রদের উপর সমকালের ছায়াপাতে তাদের

চরিত্র যে বর্ণ ধারণ করে তাতেই তারা সমকালের প্রতিনিধি হয়ে দেখা দেয়। 'চোর' গল্পটির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত এই গল্পের প্রধান চরিত্র অমূল্য এমনই এক সময়ের ফসল। অমূল্য চরিত্রের মধ্য দিয়েই তার সমকাল বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে, কিন্তু সন্তর্পিত ভাবে।

এ গল্পের মূল বিষয় অমূল্য ও রেণুর মানস বিবর্তন। মানবমনের আলো আঁধারির খেলা গল্পের মূল হলেও অমুল্য চরিত্রটি প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালীন অবক্ষয়িত সমাজের ফসল। তার চৌর্যবৃত্তির মানসিকতা ও সচেতন নীতিহীনতা তৎকালীন সামাজিক অবক্ষয়ে পীড়িত মানুষের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সমালোচক সঙ্গত কারণেই বলেন — "অমূল্য সেই যুদ্ধের আগুনে পোড়া ছড়ানো ভস্ম থেকে উঠে-আসা সারা গায়ে ভস্ম- মাখানো ব্যক্তিত্ব — যুদ্ধে বিধ্বস্ত সমাজ ও মধ্যবিত্ত জীবনের নৈতিকতার বিপর্যস্ত রূপ, অবক্ষয়িত মনোভূমির পাংশুবর্ণ স্বভাব অমুল্য সহজ ললাট লিখনের মতো বহন করেছে। — তাঁর যে ছিঁচকে চোরের স্বভাব, তা চরিত্রের অন্তর্নিহিত নয়, সমসময়বর্তী সমাজই তাতে আরোপের ধর্মকে প্রকট করে।"[১৪] অপরদিকে অমূল্যের স্ত্রী রেণুর ক্রমিক অবক্ষয়ও নীতিবোধ থেকে নীতিহীনতায় অধঃপতিত হবার কাহিনি। তা যুদ্ধ সমকালিক সামাজিক,অর্থনৈতিক ও নৈতিক ক্রমিক অবক্ষয়কেই সূচিত করে।

এই প্রসঙ্গে ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত 'এক পো দুধ' গল্পটির কথা উল্লেখ করা যায়। বুর্জোয়া অর্থনীতি পরিচালিত সমাজ ব্যবস্থায় নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবনসংগ্রামের কঠোরতা এখানে নীরবে উচ্চারিত। দাঙ্গা, দেশভাগ ও অর্থনৈতিক সংকটের কালে এন্টালী অঞ্চলের প্রায় বস্তিবাসী বিনোদ ও লতিকার দারিদ্র্যপীড়িত পরিবারে এক পো দুধের জন্য অর্থনৈতিক সংকট, ঝগড়া ও অশান্তি এক বিশেষ কালের দ্যোতক। যদিও গল্পে এই সমকাল মুখ্যত কোনো স্থান অধিকার করেনি। বরং এক পো দুধকে কেন্দ্র ক'রে মানব সম্পর্কের এক নতুনতর সমীকরণ গল্পের প্রধান উপজীব্য। এই কারণে ১৩৫০ এর দশকে লিখিত নরেন্দ্রনাথের ছোটগল্প সম্বন্ধে পার্থপ্রতিম বন্দোপাধ্যায় লেখেন — "নরেন্দ্রনাথ এই সময়-বৃত্তেই যে গল্প লেখেন,তাতে সময় থাকে স্পর্শকের মত, কিন্তু গল্পের মাত্রা যে সময়ের সীমাকে ছাড়িয়ে যেতে চায়।"[১৫]

দেশভাগ নিয়ে রচিত গল্প ও রাজনৈতিক মতাদর্শ ও সংঘাতের গল্পগুলিতে গল্পের বড় সময়কে আরও সুস্পষ্টভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। 'কাঠগোলাপ' গল্পটির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। এই গল্পের মূল বিষয় যদিও মধ্যবিত্ত মানুষের অপরিণামদর্শিতার ফলে জীবন সংগ্রামের কঠোরতা কিন্তু সময়ের ইঙ্গিত এই গল্পে স্পষ্ট। দেশ বিভাগের সময়টিই শুধু মাত্র উঠে আসে নি, গল্পে সেই সময়ের সঙ্গে উঠে এসেছে সেই কালের চিহ্নগুলিও। গল্পের বর্ণনা অংশ থেকে কিছুটা উদ্ধার করা যেতে পারে — "বড় রাস্তার মোড়ে বসেছে রিলিফ - সেন্টার। পূর্ববঙ্গ থেকে শরণাগতদের সাহায্য

কেন্দ্র। রেশন কার্ড পিছু সপ্তাহের যোগ্য চাল,ময়দা, আটা দেওয়া হয় বিনা পয়সায়। সকাল থেকে দুপুর, বিকেল থেকে রাত আটটা 'কিউ' দিয়ে লোক দাঁড়ায়।"

'পালঙ্ক' গল্পটির কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গল্পের চরিত্রদের সংলাপে যেমন দেশভাগ পরবর্তী সময়টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তেমনি রাজমোহন ও তার ছেলের মানসিতার পার্থক্য দুই প্রজন্মের মধ্যে সময়ের পার্থক্যকে সূচিত করে — "বাপ বেটায় কত মনোমালিন্য হয়, কত ঝগড়া বিবাদ হয়, তাঁদের মধ্যে তো তা হয়নি ! তবু সে দূরে স'রে গেছে। তার শিক্ষাদীক্ষা রুচি-প্রবৃত্তির সঙ্গে রাজমোহনের মিল নেই। রাজমোহন যা ভালোবাসেন, সে তা বাসে না।যে জমি-জায়গা, ভিটে- মাটি, ধান-পাট, গাছ-পালা রাজমোহনের কাছে প্রাণের চেয়েও বড়, তার কাছে তা তুচ্ছ, অতিতুচ্ছ। সে দেশ চিনল না, দেশের মানুষ চিনল না।চেনার মধ্যে চিনেছে শুধু চাকরি ও শুকনো একগাদা বই। চোখের পাতা বুজে মানুষের কথা, মানুষের মানে সে বই এর পাতা খুঁজে বেড়ায়।না, তার সঙ্গে কোনো মিল নেই রাজমোহনের। পাকিস্তান হওয়ার আগেই সে স্থানান্তরী, দেশান্তরী হয়েছে। রাজমোহন আর সে এখন দুই ভিন্ন দেশকালের মানুষ।" এখানে গল্পের বড় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রদের উপর সময়ের প্রভাবও পরিস্ফুট। যে সময় দুই প্রজন্মের মধ্যে প্রজন্মভেদ বা Generation Gap তৈরি করে।

রাজনৈতিক সংঘাত ও মতাদর্শ যে সকল গল্পে আছে যেমন — 'পতাকা', 'বিষাদযোগ' প্রভৃতি গল্পে এছাড়া 'আবরণ' 'রসাভাষ' প্রভৃতি গল্পেও বড় সময়ের প্রভাব বা ছাপ সুস্পষ্ট। তবে প্রথম অধ্যায়ে দেশকালের আলোচনার সঙ্গে গল্পের থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সেই সময়কে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে বলে এই অধ্যায়ে তার পুনরাবৃত্তি থেকে বিরত থাকা হল।

উল্লেখপঞ্জি

১. 'The Cambridge History of English Literature'. In 18th Volume (1907-1921) Website : WWW.BARTLEBY.COM/226/2101. Date- 07-04-2009 Time- 21:15 ISBN — 1-58734-073-9 On Line Edition January, 2000.

২. 'William Henry Hudson : 'An Introduction to the study of Literature', Lyall Book Depot, 1st Published in Great Britain, March' 1910, 3rd Indian Edition 1969, Page-

৩. Nathaniel Hawthorne রচিত 'Twice-Toil Tales' প্রসঙ্গে Edger Allan Poe ছোটগল্প সম্পর্কে এ কথা বলেছিলেন। মূলগ্রন্থটি সংগ্রহ করতে না পারায় অশোক কুমার মিত্রের 'সাহিত্যের রূপরীতি কোষ' গ্রন্থ হতে উদ্ধৃতিটি গ্রহণ করা হয়েছে। অশোক কুমার মিত্র ঃ 'সাহিত্যের রূপরীতি কোষ', সাহিত্যসঙ্গী, বামা পুস্তকালয়, তৃতীয় সংস্করণ ও প্রথম সাহিত্যসঙ্গী সংস্করণ, ২০০২, পৃষ্ঠা-১৮৬।

৪. 'William Henry Hudson : 'An Introduction to the study of Literature', Lyall Book Depot, 1st Published in Great Britain, March' 1910, 3rd Indian Edition 1969, Page- 340।

৫. বীরেন্দ্র দত্ত ঃ 'বাংলা ছোটগল্পঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ' (দ্বিতীয় খণ্ড), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ, জুলাই, ২০০৪, পৃষ্ঠা - ১৮৭.

৬. অতুলচন্দ্র গুপ্ত ঃ 'কাব্যজিজ্ঞাসা', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, মুদ্রণ-জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৩, পৃষ্ঠা- ৩০.

৭. সরোজমোহন মিত্র ঃ 'বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প', তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তুলসী প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-২৯৩.

৮. সত্যেন্দ্রনাথ রায় ঃ 'শিল্প সাহিত্য দেশকাল', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৮১, পৃষ্ঠা-১৮৪.

৯. গোপিকানাথ রায়চৌধুরি ঃ 'রবীন্দ্রনাথঃ ছোটগল্পের প্রকরণ-শিল্প', সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৯৭, পৃষ্ঠা - ২৭.

১০. অলোক চক্রবর্তী ঃ 'সন্তোষ কুমার ঘোষ কথাসাহিত্যে স্বয়ং নায়ক' পুস্তকবিপণি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর ২০০১, পৃষ্ঠা - ১৮৯.

১১. গোপিকানাথ রায়চৌধুরি ঃ 'রবীন্দ্রনাথঃ ছোটগল্পের প্রকরণ-শিল্প', সাহিত্যলোক, কলকাতা,

প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৯৭, পৃষ্ঠা - ৫১.

১২. তদেব, পৃষ্ঠা - ৫১.

১৩. মঞ্জুরী চৌধুরী ঃ 'ছোটগল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্র', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা - ৫৬.

১৪. বীরেন্দ্র দত্ত ঃ 'বাংলা ছোটগল্পঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ (দ্বিতীয় খণ্ড), পুস্তকবিপণি, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ, জুলাই ২০০৪, পৃষ্ঠা - ১৫৫.

১৫. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'চেনামহলঃ অচেনা গল্প', 'ছোট গল্পঃ বিকাশ, পরিণতি ও উপলব্ধি' সম্পাদনা ঃ উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, জ্যোতিপ্রসাদ রায়, সাহিত্যসঙ্গী, বামা পুস্তকালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৪.

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্প থেকে যে সকল পংক্তি উদ্ধার করা হয়েছে সে সকল অভিজিৎ মিত্র সম্পাদিত ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পমালা ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কিশোর গল্প সমগ্র থেকে গৃহিত।

।। পঞ্চম অধ্যায় ।।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পের ভাষা

নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রতিদিনের পরিচিত মানুষের কাহিনি বর্ণনা করেছেন প্রতিদিনের ব্যবহৃত ভাষাতেই। তৎসম শব্দবহুল সংস্কৃতগন্ধী শব্দ ব্যবহার করে তিনি তাঁর রচনাকে গম্ভীর মন্দ্রে ঝংকৃত করেননি। তিনি সহজ, সরল ভাষাতেই সহজ সরলতায় প্রকাশ করেছেন মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন সংগ্রাম, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা ও জটিল মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনকে। তাঁর ছোটগল্পের গতি যেমন সাবলীল তাঁর ভাষাও তেমনি উচ্ছ্বাসহীন। তবে পরিস্থিতি, পরিবেশ, ঘটনা ও চরিত্রের মানসিকতা ও সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী তিনি তাঁর গল্পে ভাষা প্রয়োগ করেছেন। বিবৃতির ভাষাকে যেমন অনেক ক্ষেত্রেই ব্যঞ্জনাপূর্ণ করে গড়েছেন, তেমনি সংলাপের ভাষাকেও ইঙ্গিত ও নিহিতার্থের সাহায্যে বহুমাত্রিক করেছেন। ঘরোয়া আটপৌরে মানুষের ভাষা, নিম্নশ্রেণির মানুষের, নিম্নবিত্ত মানুষের ভাষা, আবার অপরদিকে শিক্ষিত সমাজের মার্জিত রুচির মানুষের ভাষা, তাদের সংলাপের পার্থক্য গল্পের বাস্তবতা রক্ষায় যেমন সহায়তা করেছে তেমনি লেখকের মানসিকতাকে পরিস্ফুট করেছে। ফরিদপুরে বাল্য ও কৈশোর কাল কাটাবার ফলে পূর্ববঙ্গের ভাষা সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল ফলে পূর্ববঙ্গের গ্রামজীবন কেন্দ্রিক ছোটগল্পগুলিতে এই পূর্ববঙ্গীয় ভাষার সাবলীল ও বাস্তবগ্রাহ্য ব্যবহার গল্পগুলিকে ভিন্নমাত্রা দান করেছে। নরেন্দ্রনাথের প্রথম প্রেম ছিল কবিতার প্রতি, তাই তাঁর ছোটগল্পের ভাষায় অনেক ক্ষেত্রেই এক কবিমনের প্রকাশ ঘটেছে। গল্পের বিষয়বস্তুর সঙ্গে আঙ্গিক প্রকরণের হরগৌরী মিলনে নরেন্দ্রনাথের গল্পের ভাষা ব্যবহার এক অন্য মাত্রা প্রদান করেছে। কিছু উদাহরণ উদ্ধার করে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথের ভাষা ব্যবহারের বৈচিত্র্যটি যেমন দেখানো যায়, তেমনি একই সঙ্গে এই ভাষাশিল্পে বৈচিত্র্য আনয়নের কারণ অনুসন্ধান করা যায়।

ভাষায় কাব্যিকরীতি ঃ

১. "আমের গাছ বোলে ভরে উঠল, গাব গাছের ডালে ডালে গজাল তামাটে রঙের কচি কচি নতুন পাতা। শীতের পর এল বসন্ত, মাজু খাতুনের পরে এল ফুলবানু। ফুলের মতই মুখ। ফুলের গন্ধ তার নিঃশ্বাসে।" ('রস')

২. "কী করবে রিনি। সেদিন যে সত্যিই বৃষ্টি হচ্ছিল। কলকাতা শহরের এই সরু গলির পুরোন ফ্ল্যাট-বাড়িটার জানালা দিয়েও আকাশের মেঘ দেখা যাচ্ছিল; হাত বাড়িয়ে বৃষ্টি ধরা যাচ্ছিল, জলের ছাঁটে

চোখ-মুখ ভিজিয়ে নিতে পারছিল, বাতাসের ঝাপটায় এলোমেলো উচ্ছৃঙ্খল কাগজ-পত্রের সঙ্গে নিজের মনকেও দূর দূরান্তরে উড়িয়ে দেওয়ার সাধ হচ্ছিল। আর ঠিক সেই সময় সেই বৃষ্টিঝরা, বৃষ্টিভরা সন্ধ্যায় ভদ্রলোক তাদের বাড়ীতে এসেছিলেন।" ('একটি ফুলকে ঘিরে')

৩."……বহির্বিশ্বও যেন এক বৃহৎ গহ্বরের চেহারা নিয়েছে। শীতের কুয়াশায় চারিদিক ঢাকা। শহরতলীর রাস্তায় আজ কেন যেন আলো জ্বলেনি। আমার ঘরের সামনের দীপদণ্ডটি প্রায়ই নির্বাপিত থাকে। আজ দেখলাম সেই নির্বাপন দণ্ড সবাই মাথা পেতে নিয়েছে।" ('একটি মৃত্যু ও আমি')

এখন দেখা যাক নরেন্দ্রনাথ উদ্ধৃত ক্ষেত্রগুলিকে ভাষারীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে কাব্যিক রীতির প্রয়োগ করেছেন কেন। প্রকৃতপক্ষে কেবল ফর্ম এবং কনটেন্ট নয় ভাষাও সুনির্দিষ্ট সাহিত্য শাখাকে নির্দিষ্ট করে চিনিয়ে দেয়। শুধু তাই নয় এই ভাষা সেই নির্দিষ্ট সাহিত্যশাখা বা জাঁর (Genre) টিকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিতও করে তোলে। উপন্যাসের ভাষা থেকে ছোটগল্পের ভাষা হয়তো তার ইঙ্গিতময়তা ও ব্যঞ্জনধর্মীতার বৈশিষ্ট্যেই আলাদা, কিন্তু ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণে বা বর্ণনায় ভিন্ন ভিন্ন ভাষারীতির প্রয়োগ করেছেন নরেন্দ্রনাথ। কাব্যিক ভাষারীতির উদাহরণে প্রথমে 'রস' গল্পটি থেকে উদাহরণ নেওয়া হয়েছে। এই গল্পে ফুলবানুর বর্ণনায় লেখক কাব্যিক ভাষারীতি প্রয়োগ করেছেন কেন, তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রথমেই দেখা যায় মোতালেফ একজন সুন্দরী স্ত্রীর প্রত্যাশী কিন্তু এই প্রত্যাশা পূরণে সবচেয়ে বড় বাধা অর্থ। তাই সে সুন্দরের অন্বেষণে থাকলেও এই অন্বেষণ সহজে সফল হয়নি। মোতালেফের এই সৌন্দর্য অন্বেষণকে লেখক বর্ণনা করেছেন এইভাবে— "বেছে বেছে সুন্দর মুখের দিকে তাকায়। সুন্দর মুখের খোঁজ ক'রে ঘোরে তাঁর চোখ। অল্পবয়সী খুবসুরৎ চেহারার একটি বউ আনবে ঘরে, এতদিন ধরে সেই চেষ্টাই সে করে এসেছে। কিন্তু দরে পটেনি কারো সঙ্গে। যারই ঘরে একটু ডাগর গোছের সুন্দর মেয়ে আছে সে-ই হেঁকে বসেছে পাঁচকুড়ি সাতকুড়ি।" মোতালেফের রোম্যান্টিক রূপমুগ্ধতা ও রূপ অভিলাষ পূরণের অন্তরায়টি নিতান্তই পার্থিব ও শক্তমাটির কাছাকাছি সমস্যা, তাই সেই বিষয়টিও বর্ণিত হয়েছে নিতান্ত বাহুল্য বর্জিতভাবে, কঠোর গদ্যময়তায়। 'দরে পটেনি' শব্দটি তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু মোতালেফ ও মাজু খাতুনের যৌথ কঠোর পরিশ্রমে যখন মোতালেফ ফুলবানুকে ঘরে আনবার সামর্থ্য অর্জন করেছে, তখন তার বহুদিনকার অন্তরে লালিত সাধ পূরণের উপায় হয়েছে, তার রূপাভিলাষ পূর্ণ হয়েছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে লেখকের বর্ণনার ভাষা। বর্ণনার ভাষায় এসেছে কাব্যের ছোঁয়া, বিষয়ের মনোহারিত্বকে আরও সৌন্দর্য্যমন্ডিত করেছে সুচারু ভাষাভঙ্গি এক্ষেত্রে প্রকৃতির কাব্যিক বর্ণনা আসলে মোতালেফের অন্তরাত্মার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। মানুষের মনের ছায়াপাত ঘটেছে প্রকৃতির বর্ণনায়, ধ্বনি মাধুর্যের অপূর্ব কাব্যময়তায় "আমের গাছ বোলে ভরে উঠল, গাব গাছের ডালে ডালে গজাল তামাটে রঙের কচি কচি নতুন পাতা। শীতের পর এল বসন্ত, মাজু খাতুনের পরে এল ফুলবানু। ফুলের

মতই মুখ। ফুলের গন্ধ তাঁর নিঃশ্বাসে।"

এইভাবে দেখা যায় দীর্ঘদিন সযত্নে অন্তরে লালিত রূপাভিলাষ যখন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে তখন তার বর্ণনায় ভাষারীতিও কাব্যিক বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। এমনভাবেই 'একটি ফুলকে ঘিরে' গল্পে দেখা যায় সদ্য যৌবনপ্রাপ্তা একটি মেয়ের অন্তরে প্রথম পুরুষ সান্নিধ্যের দিনটির বর্ণনাকেও নরেন্দ্রনাথ কাব্যিক সুষমা মন্ডিত করেছেন । এই গল্পটির কাহিনি অংশ সামান্য। রিনির মায়ের বন্ধু জিতেশবাবুর ঘন ঘন তাদের বাড়িতে আগমন এবং মায়ের সঙ্গে তার দীর্ঘ অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা কখনই রিনির ভালো লাগেনি; বরং "কেমন যেন 'অসভ্য অসভ্য' লেগেছিল।" ভদ্রলোককে সমস্ত দিক থেকেই অতীব সাধারণ মনে হয়েছিল রিনির। বাবার সঙ্গে তুলনায়, রূপে, গুণে, বৃত্তিতে অনেক হীন মনে হয়েছিল, জীতেশ বাবুর চেহারাও অতীব সাদামাটা— "রোগা, ঢাঙা চেহারা। গায়ের রং একটু ফ্যাকাশে ফ্যাকাশে, মুখখানা গোলও নয়,লম্বাও নয়, বরং একটু যেন চৌকো ।" প্রথমে দর্শনে রিনির মনে হয়েছে — "এ আবার কি রকম মুখ রে বাবা।" তার জীবিকার কথা শুনে মনে হয়েছে— "কি একটা বিদেশী মেডিক্যাল ফার্মের রিপ্রেজেনটেটিভ। মানে একটু উঁচু দরের হকার।" এই ভদ্রলোকের একটি গুনই কেবল রিনি পরবর্তীতে অনুভব করেছে আর তা হল— "ভদ্রলোকের মুখে রূপ না থাকলে কি হবে, কথায় রূপ আছে।" রিনির মনের ভাব ও কাহিনির বর্ণনা লেখক আটপৌরে ভাবেই করেছেন কিন্তু যখন এই অপছন্দের মানুষটিরই প্রথম সান্নিধ্য লাভ করেছে রিনি, তখন তা অতি স্বল্প সময়ের জন্য হলেও তা তার নব জাগ্রত নারীত্বের অনুভূতিকে তৃপ্তি দিয়েছে। নিজের অন্তরে রিনি 'অদ্ভুত এক উল্লাস' অনুভব করেছে। স্বল্প সময়ের জন্য হলেও এই পুরুষের সান্নিধ্য বদলে দিয়েছে সবকিছু। তাই "রোজ বার কয়েক করে যে সিঁড়ি বেয়ে ওঠে নামে রিনি সেই পুরোন বাড়ির সরু সিঁড়ি বেয়েই নামল, কিন্তু মনে হল যেন পাহাড় থেকে নামছে।" নিজের থেকে অনেক বেশি বয়েস জিতেশবাবুর কিন্তু তবু তার কাছ থেকে ভালোবাসার উপহার পেয়ে রিনির মনের পরিবর্তন হয়েছে, যে ব্যক্তিকে এতদিন নিজের মায়ের রূপমুগ্ধ বলে মনে করে অশ্রদ্ধা করেছে, তার কুরূপতাকে ঘৃণা করেছে সহসা তার কাছ থেকে ভালোবাসার ইশারা পেয়ে মনে হয়েছে সেই রূপমুগ্ধতা নিন্দার্হ নয়। সেই রূপমুগ্ধতার জন্যই রূপহীন ব্যক্তি হয়ে উঠেছে রূপবান— "ভদ্রলোকের মুগ্ধ চোখ দুটি বড় সুন্দর, তাঁর দেওয়া গোলাপটির রঙ এত টুকটুকে লাল, আর তাঁর মুখের সব কথাই তো রূপকথা।" এই মানুষটিকেই আকাঙ্ক্ষা করেছে রিনি আর ভেবেছে, "কিন্তু -কিন্তু তিনি কেন সবদিক থেকে রূপকথার রাজপুত্র হলেন না।" এইভাবে এক উদ্ভিন্ন যৌবনা কন্যার অনুরাগ আকস্মিকভাবে রূপ পেয়েছে একটি সহসা প্রাপ্ত লাল গোলাপের মধ্য দিয়ে। কিন্তু এই অনুরাগের সম্ভাবনা গল্পের মধ্যে যতটা আকস্মিক, সচেতন গল্পের পাঠকের কাছে ততখানি নয়, কারণ জিতেশবাবুর প্রথম আগমনের দিনে রিনির আচরণের বর্ণনার কাব্যিক ভাষারীতি আমাদের গল্পের শেষ সম্ভাবনার ইঙ্গিত প্রদান করেছিল। যদিও গল্পের

অন্যত্র এই কাব্যিক ভাষারীতি অনুপস্থিত। এখানে কাব্যিক ভাষারীতি গল্পের সমাপ্তির সম্ভাব্যতার ইঙ্গিতবাহী — "সেদিন যে সত্যিই বৃষ্টি হচ্ছিল। কলকাতা শহরের এই সরু গলির পুরোন ফ্ল্যাট-বাড়িটার জানলা দিয়েও আকাশের মেঘ দেখা যাচ্ছিল; হাত বাড়িয়ে বৃষ্টি ধরা যাচ্ছিল, জলের ছাঁটে চোখ-মুখ ভিজিয়ে নিতে পারছিল, বাতাসের ঝাপটায় এলোমেলো উচ্ছৃঙ্খল কাগজ-পত্রের সঙ্গে নিজের মনকে ওর দূর-দূরান্তরে উড়িয়ে দেওয়ার সাধ হচ্ছিল।"

এইভাবে নরেন্দ্রনাথ আটপৌরে গদ্যভাষার মধ্যে কাব্যিক রীতি আনয়ন ক'রে কখনো মোতালেফের ইপ্সিত নারীকে লাভ করবার অনির্ব্বচনীয় আনন্দকে রূপদান করেছেন আবার কখনও কাব্যিক ভাষারীতির প্রয়োগে প্রথম প্রেমানুরাগের অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতিকে প্রকাশ করেছেন। তবে নরেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র রোম্যান্টিকতাকে প্রকাশের ক্ষেত্রেই কাব্যিক ভাষারীতির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তাই নয় অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুর বিষাদময়তাকেও এর মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই প্রসঙ্গে 'একটি মৃত্যু ও আমি' গল্পটির উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এই গল্পের কাহিনি অংশ সামান্য বা প্রায় নেই বললেই চলে। একজন অতি স্বল্প পরিচিত মহিলার মৃত্যুতে গল্পকথকের আরও স্বল্প প্রতিক্রিয়া এবং কেবলমাত্র সামাজিক কর্তব্য রক্ষার দায়ে শোক জ্ঞাপন ও পরিশেষে এক শোকার্ত আত্মীয়াকে সমবেদনা জানাবার মধ্য দিয়ে নিজের যান্ত্রিক মনের উপর মানব সত্তার জয়লাভের অনুভূতিতে গল্প সমাপ্ত হয়েছে। কথকের আত্মকথন ও চৈতন্যপ্রবাহের ধারায় গল্পের অগ্রগতি ও সমাপ্তি। এক নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তির মৃত্যুতে গল্পকথক হয়তো বাস্তবতার চাপে শোকার্ত হতে পারেননি বা শোকের অনুভূতিকে কঠোর বাস্তবতার দাবীতে হৃদয়ে জাগ্রত করতে পারেননি, কিন্তু গল্পকার সচেতনভাবে গদ্যরীতির পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মৃত্যুর শূন্যতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন - "কিন্তু শুধু আমার ঘরই নয় বহির্বিশ্বেও যেন এক বৃহৎ গহ্বরের চেহারা নিয়েছে। শীতের কুয়াশায় চারিদিক ঢাকা। শহরতলীর রাস্তায় আজ কেন যেন আলো জ্বলেনি। আমার ঘরের সামনের দীপদণ্ডটি প্রায়ই নির্বাপিত থাকে। আজ দেখলাম সেই নির্বাপন দণ্ড সবাই মাথা পেতে নিয়েছে।" -এইভাবে কেবল ভাষারীতির পরিবর্তনে পরিবেশ রচনার মধ্য দিয়ে চিরবিদায়ের শূন্যতাকে কবিসত্তার অধিকারী ছোটগল্পকার নরেন্দ্রনাথ রূপ দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'যত দূরেই যাই' কাব্যগ্রন্থের 'কেন এল না' কবিতার কথা মনে পরে। যেখানে অন্ধকার, বারুদের গন্ধ আর গলির সংকীর্ণতার ইঙ্গিতে মৃত্যুকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে -

"তারপর অনেক রাত্তিরে
বারুদের গন্ধে ভরা রাস্তা দিয়ে
অনেক অলিগলি ঘুরে
মৃত্যুর পাশ কাটিয়ে

বাবা এল

ছেলে এল না।"

প্রকৃতি ও পরিবেশ বর্ণনার ভাষা ঃ

১."দু'পাশে পাটের জমি। মাঝখানের আধ হাত খানেক চওড়া আলের রাস্তা। কচি কচি দূর্বা গজিয়েছে আলের ওপর। সাইকেলটি হাত দিয়ে ঠেলে নিয়ে শীতাংশু সদানন্দবাবুর পিছনে পিছনে চলতে লাগল। সবুজ পাটের চারা গজিয়েছে দুদিকের জমিতে। এখনও হাঁটু অবধি ওঠেনি গাছ। দমকা বাতাসে মাঝে মাঝে নু'য়ে নু'য়ে পড়ছে।" ('ঘুষ')

২."চাঁদের আলো সাদা মোমের মত গলে গলে পড়ছে শহরের ওপর। সমস্ত রাস্তাটা মখমলে ঢাকা।" ('হলদেবাড়ি')

৩."জানালার ফাঁক দিয়ে ঘুমন্ত শহরতলী চোখে পড়ে। নারিকেল গাছগুলোর মাথার ওপর গোল হয়ে উঠেছে চাঁদ। সমস্ত পৃথিবী জ্যোৎস্নায় ভেসে গেছে।" ('প্রতিদ্বন্দ্বী')

৪."তেঁতুলগাছের নীচে ছোট একখানা ঘর। ওপরে পুরনো করোগেট টিনের চাল। জায়গায় জায়গায় মরচে ধরেছে। বেড়াগুলির খানকয়েক বাঁশের বাখারি দিয়ে তৈরি, সামনের খান-দুই পাঁকাটির। মাটির ভিত বর্ষার জলে থিক থিক করছে। মাটি খুঁড়ে গোটাকয়েক কেঁচো আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করছে ভিতরে। সামনে ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে ছোট একটু উঠোন। খালের জল বাড়ির উপর উঠি উঠি করছে। এখনো ওঠেনি। ('পালঙ্ক')

৫."গতবারের মত এবারও আষাঢ়ের মাঝামাঝি থেকে বর্ষার জল দারুণ বাড়তে শুরু করল। মাঠ ময়দান আগেই তলিয়েছিল। এবার জল এগুতে এগুতে খালের ঘাটের সবগুলি পৈঠা ছাড়িয়ে মল্লিকদের বাঁশ-বাগানের আম-বাগানের ভিতর দিয়ে আইনুদ্দিন শেখের উঠানের ওপর এসে দাঁড়াল। প্রথমে পায়ের পাতা ভেজে কি না ভেজে, তারপর জল গিরা পর্যন্ত উঠল।" ('বন্যা')

৬."সীমান্তের এই ছোট্ট শহরটি যেমন দরিদ্র তেমনি অপরিচ্ছন্ন। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে তার সমস্ত কুশ্রীতা ঢাকা পড়েছে। সামনের দিগন্ত-ছোঁয়া শস্যহীন শূন্য মাঠকে মনে হচ্ছে স্তব্ধ সমুদ্রের মত।

ছাদটি সত্যিই বেশ বড় । চারদিক আলসে দিয়ে ঘেরা। ওপরেও একটি সুন্দর ঘেরাটোপ আছে। তারায় ভরা সুন্দর স্বচ্ছ আকাশ। জরীর কাজ করা নীলাম্বরী শাড়ির মত।" ('চিলেকোঠা')

প্রকৃতির সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের সংযোগ সুদৃঢ়। বাল্য ও কৌশোরকাল পূর্ববাংলার গ্রামে অতিবাহিত

করায় প্রকৃতির সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। গ্রাম জীবনের সেই অভিজ্ঞতা, গ্রাম্যপথ, গাছপালার গন্ধ, নদী, নালা, খাল, বিল পরিপূর্ণ পূর্ববঙ্গের প্রকৃতি তাঁর প্রথম দিককার ছোট গল্পে অনুপুঙ্খ বাস্তবতায় উঠে এসেছে।

তিনি মূলত মানব মনের বিশ্লেষক আর এই বিশ্লেষণ কর্মে অগ্রসর হয়ে তিনি প্রকৃতির চিত্রণকেও কাজে লাগিয়েছেন। প্রকৃতির চিত্রণে শুধু প্রকৃতির প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসাই প্রকাশিত হয়নি, সেই প্রকৃতি কখনও হয়ে উঠেছে মানব মনের অকথিত বাণীর শিল্পরূপ। কখনও এই প্রকৃতিচিত্র বর্ণিত হয়েছে মানব মনের ভাবনার সমান্তরালে, কখনও বিপরীত স্রোতে আর এই প্রকৃতি বর্ণনার ভাষারীতিও ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে।

প্রকৃতিতে মানবমনের মত গূঢ়ৈষণা নেই, ভ্রুকুটি-কুটিল দৃষ্টিভঙ্গী নেই, যন্ত্রণার দহন ব্যাকুলতাও নেই। কিন্তু সেই প্রকৃতি কখনও হয়ে উঠতে পারে মানব মনের, মানুষের মানসিক অবস্থার প্রকাশক, আবার কখনও তা হয়ে উঠে তাপিতের সান্ত্বনা প্রদানকারী উপশমকারী প্রলেপ, যা যন্ত্রণার তীব্রতাকে, দহনকে নির্বাপিত করে। কখনও প্রকৃতি মানবের মানসিক অবস্থার বিপরীত মেরুতে দাড়িয়ে সেই মানসিকতাকে বৈপরীত্যের আলোকে উজ্জ্বল করে। নরেন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রকৃতি চিত্রণের ভাষাকে উদ্ধার করে তার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা যেতে পারে। 'ঘুষ' গল্পটির প্রারম্ভেই আছে প্রকৃতির বর্ণনা কিন্তু সেই বর্ণনা কোনো অরণ্য, নদী বা পাহাড়-পর্বতের বর্ণনা নয়, নিতান্তগ্রামবাংলার চাষের জমির বর্ণনা কিন্তু তা লেখকের বর্ণনার গুণে চমৎকার একটি ছবি রচনা করেছে— "দুপাশে পাটের জমি। মাঝখানের আধহাত খানেক চওড়া আলের রাস্তা। কচি কচি দূর্বা গজিয়েছে আলের ওপর। ..... সবুজ পাটের চারা গজিয়েছে দুদিকের জমিতে। এখনও হাঁটু অবধি ওঠেনি। দমকা বাতাসে মাঝে মাঝে নু'য়ে নু'য়ে পড়ছে।" — এখানে দেখা যায় এই প্রকৃতির বর্ণনায় লেখক কল্পনার ঘোড়ায় চেপে আকাশচারী হননি, এই বর্ণনায় অতিকথন নেই, বর্ণনার বাড়াবাড়ি নেই বরং সংযম আছে কিন্তু তাতে সৌন্দর্যের হানি ঘটেনি। এক্ষেত্রে দেখা যায় গল্পের অন্যান্য অংশের তুলনায় লেখক এখানে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট বাক্য রচনা করেছেন, যেন পাঠকের চোখে ছোট ছোট ছবি এঁকে একটি বড় পটভূমিতে স্থাপন করবেন। এখন দেখা যাক এই প্রকৃতি বর্ণনা গল্পের ক্ষেত্রে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে। 'ঘুষ' গল্পটির প্রধান চরিত্র শীতাংশু জুট-রেজিষ্ট্রেশন অফিসে চাকরী করে। বরাদ্দ জমি অপেক্ষা বেশি জমিতে কোন কৃষক পাট চাষ করছে কিনা এ বিষয়ে তদন্ত ও তদারক করাই তার কাজ। এক আসন্ন ঝড়-বাদলের সন্ধ্যায় তার দূরসম্পর্কের কুটুম্ব সদানন্দ গাঙ্গুলি যখন তাকে আপ্যায়ন করে তার বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছে তখন তার বাড়িতে যাবার পথেই এই চাষের ক্ষেতের বর্ণনা রয়েছে। গ্রাম বাংলার কৃষি নির্ভর সমাজের এই অতি পরিচিত ছবি শীতাংশুকে মুগ্ধ করেনি, অনির্বচনীয় প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণে উদ্দীপিত করেনি। বরং তার মনে হয়েছে উপযুক্ত

পারিতোষিক না পাওয়ার জন্য দু'তিনখানা বড় বড় জমি বে-আইনি চাষের জন্য সে ভেঙে ফেলতে হুকুম দিয়েছে, সেই জমিগুলোর পাট এই জমির চেয়েও বড় এবং ঘন ছিল। অর্থাৎ এখানে প্রকৃতি কেবল সৌন্দর্য সৃষ্টি করছে না, তা বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ মানুষের মনে বিশেষ অনুভূতিকে সঞ্চারিত করেছে। দমকা হাওয়ায় হাটু অবধি ওঠা কচি পাটের গাছের নুয়ে পড়া যেন প্রবল প্রতাপান্বিত সরকারী কর্মচারীদের দয়ায় বেঁচে থাকবার জন্য নিরন্তর সংগ্রামকারী পাটচাষীদেরই প্রতিভূ, যাদের উচ্চতা ও মানও বেশি নয়, কেবল হাটু পর্যন্ত আর দমকা হাওয়ায় এদের চিরকালই নুয়ে পড়তে হয়। শীতাংশুর মনের ভাবনা এখানে প্রকৃতি বর্ণনার এই ভাষারীতির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ, কারণ শীতাংশু চলছে আর ভাবছে, কিন্তু সেই ভাবনা টুকরো টুকরো, গভীর নয় তাই প্রকৃতি বর্ণনার বাক্যগুলিও ছোট ছোট যা ভাবনার সবিরামতাকেই সূচিত করে। অপরদিকে সদানন্দবাবুর জীর্ণ বাড়িতে দারিদ্র্য থাকলেও অন্য এক আকর্ষণও আছে— তার কন্যা কুন্তলা। তাই সদানন্দবাবুর বাড়ির সামনের আগাছার বর্ণনা আছে, অপরিস্কার পুকুরের বর্ণনা আছে, আর আছে এই ছোট ছোট বাক্যগুলির মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বাক্য, যা সোজা আগাছার জঙ্গলের পাশ কাটিয়ে বাড়ির অন্দরে ও একই সঙ্গে হয়তো কারও অন্তরে প্রবেশের পথের বর্ণনা দেয়— "বাড়ির সামনে একটি পানাভরা মজা পুকুর। চারপাশ থেকে নানা আগাছার জঙ্গল ঝুঁকে পড়েছে। ভালর মধ্যে দু'-একটা আম আর খেজুর গাছ আছে মাঝে মাঝে। পুকুর পারের সেই আগাছার ভিতর দিয়েই সরু সাদা একটু পথ কুমারীর সিঁথির মতো সোজা হয়ে একেবারে বাড়ির উঠোনে গিয়ে পৌঁচেছে।"

কেবল কৃষিনির্ভর বাংলার পল্লীপ্রকৃতির চিত্রাঙ্কন নয়, শহর কলকাতার নগরের সৌন্দর্যকেও সমান দক্ষতায় বর্ণনা করেছেন নরেন্দ্রনাথ। 'হলদেবাড়ি' গল্পে লেখক জ্যোৎস্নালোকিত শহরের সৌন্দর্যকে যথাযথ নৈপুণ্যে প্রকাশ করেছেন আর সেই সৌন্দর্যের সঙ্গে, তরল চন্দ্রালোকের সঙ্গে তুলনা করেছেন গল্পের নায়িকা অঞ্জনাকে। তবে এই গল্পে প্রকৃতি বর্ণনার মূল কারণ ভিন্ন। অকৃপণ জ্যোৎস্নালোকের মধ্যে সমগ্র শহর যখন মায়ানগরীতে পরিণত হয়েছে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে, মারী ও মন্বন্তরের আঘাতে অসহায় মানুষের ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রামও অব্যাহত রয়েছে। ক্ষুধার্ত মানুষের ডাস্টবিন থেকে খাদ্য সংগ্রহের সংগ্রাম চলছে অবিরত। এই একই সময়ে দেশের উচ্চবিত্ত সমাজ তাদের নিজের শহরের অভুক্ত জীর্ণ মানুষগুলির প্রতি নিস্পৃহ থেকেছে। তাদের কেউ রচনা করেছে যুদ্ধের বই, কেউ বা সৌন্দর্যের পূজারী সেজে এই মূর্তিমান অসুন্দরদের ঘৃণা ক'রে । তাদের দূরে ঠেলতে গিয়ে এই সৌন্দর্যের পূজারীরা হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত। এই কারণে প্রকৃতির চিত্রণ এখানে ভিন্ন মাত্রা নিয়েছে। এখন গল্প থেকে কিছু অংশ উদ্ধার ক'রে প্রকৃতির রূপ বর্ণনার ভাষারীতিকে দেখানো যেতে পারে— "চাঁদের আলো সাদা মোমের মত গলে পড়ছে শহরের ওপর। সমস্ত রাস্তাটা মখমলে ঢাকা ।" এছাড়া গল্পের অন্যত্র একই কারণে প্রকৃতি বর্ণনার চিত্র প্রকাশিত— "দু'পাশের বাড়িগুলি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। জ্যোৎস্নায় ভিজে উঠেছে। কিন্তু বর্ণ গন্ধ

ধ্বনি ভরা এই পরিচিত পৃথিবী ওদের কাছ থেকে যেন অবলুপ্ত হয়ে গেছে। সব কিছুতে মিলিয়ে আছে শুধু একটা অশরীরী সৌরভ, বহুদূর থেকে ভেসে আসা অস্পষ্ট সেতারের মধুর একটা টান।"

যেহেতু 'ঘুষ' গল্পের প্রকৃতি বর্ণনার সঙ্গে 'হলদেবাড়ি' গল্পের প্রকৃতি বর্ণনার উদ্দেশ্যের সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে, তাই এই দুই ক্ষেত্রে ভাষারীতির ক্ষেত্রে এসেছে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য। 'ঘুষ' গল্পের প্রকৃতির বর্ণনা নিতান্ত বাস্তবগ্রাহ্য। এই বাস্তবগ্রাহ্যতা গল্পের পাঠকের কাছে যেমন তেমনি তা গল্পের চরিত্রদের কাছেও সমান কিন্তু 'হলদেবাড়ি'র প্রকৃতির বর্ণনা বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করার, তাকে অস্বীকার করার। তাই তাতে যুক্ত হয়েছে কল্পনার ছায়া, কল্পনার মায়া। 'ঘুষ' গল্পের প্রকৃতি বর্ণনার গদ্যময়তা তাই 'হলদেবাড়ি' —তে এসে পরিবর্তিত হয়েছে, এই কারণে এখানে রাস্তা চাঁদের আলোতে মখমলে আবৃত হয়েছে বাস্তবতার পিচে ঢাকা থাকেনি। যদিও কল্পনায় মোড়া প্রকৃতিও বাস্তবতার আঘাত থেকে দূরে থাকেনি। বৃহৎ এই জ্যোৎস্নার সমুদ্রে এক কদাকৃতি কুমীরের পিঠ অঞ্জনা দেখতে পেয়েছে, যা আর কিছুই নয়— "রাস্তা থেকে কয়েক হাত দূরে গলির মধ্যে ডানদিকে বড় একটা ডাস্টবিন । তারই ভিতর আকণ্ঠ ঝুঁকে পড়ে একটা লোক দু'হাতে কি ঘাঁটছে, তার পিঠটা কেবল দেখা যাচ্ছে।" এই বাস্তবতার আঘাতে স্বপ্ন মেদুরতা ভেঙে গিয়েছে। বাস্তব কখনও ভাঙে না, তা আবৃত থাকলেও একসময় না একসময় প্রকাশিত হয়, কিন্তু কল্পনা ভেঙে যায়। প্রকৃতির সৌন্দর্য বাস্তব তা ভাঙবার নয়, কিন্তু কল্পনাময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কল্পনা অংশ খসে যেতে পারে মুহূর্তে, তাই এই ক্ষেত্রে প্রকৃতি বর্ণনার ভাষারীতিও হয়ে পড়ে ভিন্ন, স্বপ্নমেদুরতা ও কল্পনার কুহক জালে আবৃত ও সজ্জিত— "তিন চার মিনিটের মধ্যে বাড়ির সামনে এসে ট্যাক্সি থামল। জ্যোৎস্নার সমুদ্রে সাদা একখানা জাহাজ নোঙর ফেলে রয়েছে। আসলে রঙ এই জাহাজী প্যাটার্ণের বাড়ি খানার সাদা নয়, হাল্কা হলদে। রাত্রে এমন দেখাচ্ছে।"

পূর্বে উদ্ধৃত 'পালঙ্ক' গল্পে দেখা যায় প্রকৃতি বর্ণনা যেন মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবাহী হয়ে দেখা দিয়েছে। লেখক মকবুলের বাসস্থানের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখেন— "খালের জল বাড়ির উপর উঠি উঠি করছে। এখনো ওঠেনি।" এ যেন মকবুলের বর্তমান পরিস্থিতি, তার দুর্ভাগ্য, দারিদ্র্য ও অসহায়তার বর্ণনা ও ভবিষ্যতের চরম দুর্দিনের ইঙ্গিত। মকবুল ধলাকর্তার পালঙ্ক ক্রয় করে নিজের আর্থিক অবস্থাকে সর্বনাশের শেষ প্রান্তে এনে উপস্থিত করেছে। তার ঘরের দুয়ারে সর্বনাশ এসে দাড়িয়েছে, তাই খালের জলও বাড়ির উপর 'উঠি উঠি করছে'। কিন্তু নিজের জেদ, সাহস ও পুরুষকারের জোরে মকবুল নিজেকে, নিজের পরিবারকে রক্ষা করবার প্রাণপণ প্রয়াস করে চলেছে ও ভাঙনের দ্বার প্রান্তে এসে উপনীত হলেও ভেঙে পড়েনি, তাই খালের জলও তার বাড়িতে 'এখনো ওঠেনি'। কিন্তু 'এখনো ওঠেনি' এই বাক্যটির আকৃতিগত ক্ষুদ্রতা যেন আমাদেরকে ইশারা করে যে আর বেশিদিন মকবুল নিজের জেদকে বজায় রাখতে পারবে না, অচিরেই তার প্রতিরোধ ভেঙে পড়বে, সে তার সখের পালঙ্ককে ধলাকর্তার বাড়িতে

ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হবে। হয়তো খালের জলও তার বাড়িকে গ্রাস করবে। এইভাবে লেখক প্রকৃতির বর্ণনা দ্বারা গল্পের বক্তব্যকে ইঙ্গিতবাহী করে তুলেছেন, বাক্যের দৈর্ঘ্য ও হ্রস্বতাও এই ইঙ্গিতময়তায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে।

নারীরূপের চিত্রাঙ্কন ঃ

১."টুকু লজ্জিত হয়ে অন্যদিকে মুখ ফেরাল। ভারি সুন্দর রঙ ওর। লজ্জা পেলে ওর সিঁথির সিঁদুর যেন সারা মুখে ছড়িয়ে যায়। মুখের ডৌল ভারি মিষ্টি। ছোটখাটো চেহারা। টুকু যেন এখনো এতটুকু। পুতুলের মত নরম তুলতুলে। কিন্তু দেখ, এত অল্প বয়সেই কেমন মা হয়ে গেছে। পুতুল হয়েছে পুতুলের মা।"('মাধবী মঞ্জরী')

২."একটু বাদে চায়ের কাপ এনে অঞ্জলী টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে একটু সরে দাঁড়াল। এই মাত্র উনুনের কাছ থেকে উঠে এসেছে। আগুনের আঁচ লেগেছে মুখে, কপালে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আটপৌরে কালোপেড়ে শাড়িখানার আঁচল কোমরে জড়ানো। আঙুলগুলিতে ঈষৎ হলুদের ছোপ। তবু এই বেশে ভারি সুন্দর মনে হল অঞ্জলিকে, ভারি নতুন লাগল। আর কোন মেয়ের সুগৌর ছোট কপালে ঘামের বিন্দুও যে এমন নয়নাভিরাম হয়, তা আমি এই প্রথম লক্ষ্য করলাম।" ('অসবর্ণা')

৩."পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের একটি বউ তাদের একেবারে দোরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পরণে নীল পেড়ে খাটো শাড়ি। আঁচলে মাথার সবটুকু ঢাকেনি। সিঁথিতে মোটা সিঁদুরের দাগ, কপালে ছোট্ট সুগোল ফোঁটা। দু'-হাতে দু'গাছা মোটা মোটা শাঁখা, আর গাছ দুই ক'রে কাঁচের চুড়ি। দেখলেই বোঝা যায় নিম্নশ্রেণীর গৃহস্থঘরের বউ। গায়ের রঙ ময়লা, চেহারাও একটু রোগাটে। কিন্তু ওরই মধ্যে মুখে বেশ একটু লক্ষ্মীশ্রী আছে। নাক চোখ তেমন চোখা-চোখা না হলেও মুখের গড়নটুকু ভারি মোলায়েম, কথা বলবার ধরণটুকুও বেশ মিষ্টি।" ('দ্বিচারিণী')

৪."গলির মোড়ে আধো আলো আধো ছায়ার রহস্য কুহেলীতে যাকে মনে হয়েছিল বিশ বাইশ বছরের তরুণী, তার বয়স যে চল্লিশের কম নয় তাতে তারাপদর কিছুমাত্র সন্দেহ রইল না। মুখ ভরা মেচেতার দাগ, তোবড়ানো গাল, কোঁচকানো চামড়া। পাউডারের পুরু প্রলেপেও সব কুশ্রীতা ঢাকা পড়েনি। লিপস্টিক মাখা ঠোঁটের ফাঁকে পানের রসে কালো, বিবর্ণ, ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতগুলি দেখা যাচ্ছে।" ('সমব্যথী')

৫."এই মেয়েটির নাকে অবশ্য নাকছাবি নেই, কিন্তু সমস্ত মুখে স্থূল সারল্যের সঙ্গে অদ্ভুত একটু

চতুর মনোভাবের ঢং মিশান রয়েছে। তা যেমন হাস্যকর তেমনি অশ্লীল, মেয়েটি যেন ইতিমধ্যেই জগৎরহস্যের পার দেখে ফেলেছে। পুরুষের স্বভাব, মেয়েদের সম্বন্ধে তার সমস্ত বাসনা কামনার স্বরূপ কিছুই ওর জানতে বাকি নেই।" ('স্বখাত')

৬."চোখের সামনে সেই উলঙ্গ অনাবৃত নারী-দেহ। হঠাৎ এই রকম আর একটা অসহায় দেহ মনে পড়ে গেল। কিন্তু এ যে আরো দুঃসহ, আরো কুশ্রী, আরো কদর্য। শাড়ি পরবার ধরণে যাকে আঠার উনিশ বছরের যুবতী বলে মনে হয়েছিল, অনাবৃত দেহে তার শিথিল চর্ম প্রৌঢ়ত্ব বেরিয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয় সর্বাঙ্গে চাকা চাকা ক্ষতচিহ্ন, বুকের উপর বিকৃত, বিস্তীর্ণ দুটি মাংসপিণ্ডের মাথায় বড় বড় দুখানা ঘা থকথক করছে।" ('আবরণ')

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছিল এক কবিমন। কবিমনের অধিকারী এই লেখক নিজে বলেন যে উপন্যাস ও প্রচুর ছোটগল্প রচনা করলেও কবিতা লিখতেই তিনি সর্বাধিক আনন্দ লাভ করতেন। কবিতা রচনাতেই তাঁর সাহিত্য প্রতিভার স্বতস্ফূর্ত বিকাশ ঘটত এবং তিনি নির্মল আনন্দের জগতে মুক্তি পেতেন। ছোটগল্প যদিও গদ্য শ্রেণির রচনা তথাপি নরেন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গী ও ভাষারীতিতে কবি মনের প্রকাশটি অন্তর্বাহিনী হয়ে বিরাজ করে। তার এই মানসিকতার যথার্থ প্রকাশ ঘটে প্রকৃতি বর্ণনায় ও নারীরূপের চিত্রাঙ্কনে । নারীর রূপ চিত্রণে নরেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁর গল্পে নারীদের একটি উত্তরণ চোখে পড়ে। তাঁর গল্পে নারীরা অনেক ক্ষেত্রেই পরিবারের গণ্ডি ছাড়িয়ে কর্মের জগতে প্রবেশ করেছে, অনেক ক্ষেত্রে পুরুষ চরিত্রদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে নিজের স্বাধিকারকে প্রতিষ্ঠা করেছে— যে বিষয়গুলি একটু ভিন্ন মনোযোগের দাবী করে। তাঁর গল্পে বিভিন্ন প্রকার নারীরা উঠে এসেছে, তারা কখনো কিশোরী, কখনো বালিকা, কখনও বা যুবতী, বিবাহিত স্ত্রী, বয়স্কা পরিবারের প্রধানা, কখনও বা সমাজের নিম্নশ্রেণির মহিলা, কখনওবা নীচ বা হীন বৃত্তি গ্রহণকারী পতিতা। এদের প্রত্যেককেই তিনি তাদের নিজের নিজের স্থানে নিজ নিজ পরিবেশ ও প্রতিবেশের পটভূমিকায় যথাযথভাবে উপস্থাপন করেছেন। নরেন্দ্রনাথের গল্পগুলিকে যথাযথ ভাবে পাঠ করলে একটি বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে, তা হল, যে গল্প গুলিকে তিনি কথকতার ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন সেই গল্পগুলিতে তো বটেই অন্য গল্পগুলিতেও কোন চরিত্রকে উপস্থাপন করলেই স্বল্প পরিসরে হলেও সেই চরিত্রের চেহারা বা আবির্ভূত স্বরূপের একটি বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। এই বর্ণনা দ্বারা যে চিত্র তিনি অঙ্কন করেন তাতে চরিত্রটি আমাদের সামনে ছবির মতো প্রতিভাত হয়। কখনও এই বর্ণনা কেবল চরিত্রের বহিরঙ্গ বর্ণনাতেই সীমিত থাকে, কখনও সেই বর্ণনা চরিত্রটির মানসিকতাকে আমাদের সামনে উদঘাটিত করে। নারীরূপের চিত্রাঙ্কনে কখনও বিপরীত মানসিকতা প্রকাশিত, কখনও বা পুরুষের চোখে সেই নারীরূপের বর্ণনা দিয়ে প্রথম অনুরাগ সঞ্চারের পটভূমি প্রস্তুত হয়। নারীরূপের চিত্রাঙ্কনে নারীর দেহমনের পরিচয় পাই, কখনও পাই তার রোম্যান্টিক মনের পরিচয়,

কখনও পাই কঠোর বাস্তবগ্রাহ্য রূপের পরিচয়। এই রূপ কখনও পুরুষকে শান্তি ও সান্ত্বনার শীতল স্পর্শ দান করে, কখনও কামনা-বাসনায় দুর্মর করে তোলে, কখনও টেনে নিয়ে যায় পাপের পথে, কর্দম পঙ্কিলতায়। বিভিন্ন শ্রেণির, বিভিন্ন বৃত্তির, বিভিন্ন ধারার নারীর চরিত্র বা রূপ অঙ্কনে নরেন্দ্রনাথ তাঁর ভাষারীতির ক্ষেত্রেও স্বল্প কিন্তু সুস্পষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়েছেন যার ফলে বর্ণনার ভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে নারী চরিত্রগুলির ভিন্নতার দিকেও সচেতন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। 'মাধবী মঞ্জরী' গল্প থেকে উদ্ধৃত প্রথম উদাহরণটির দিকে দৃষ্টি ফেরানো যেতে পারে— "টুকু লজ্জিত হয়ে মুখ ফেরাল। ভারি সুন্দর রঙ ওর। লজ্জা পেলে ওর সিঁথির সিঁদুর যেন সারা মুখে ছড়িয়ে যায়। মুখের ডৌল ভারি মিষ্টি। ছোটোখাটো চেহারা। টুকু যেন এখনো এতটুকু। পুতুলের মত নরম তুলতুলে।....." এই ছবিটি দেখলেই বোঝা যায় নারীটিকে যে চোখ দিয়ে দেখা হচ্ছে তা প্রেমিকের চোখ নয়, স্নেহ ভালোবাসাপরায়ণ কোনো ব্যক্তির চোখ দিয়ে টুকুর রূপটি ধরা পড়েছে। 'পুতুলের মত নরম তুলতুলে'— এ বর্ণনা থেকে বোঝা যায় দর্শক পুরুষও নন বরং সমবয়েসী বন্ধুস্থানীয় কেউ। কিন্তু যখন 'অসবর্ণা' গল্পে নায়কের সামনে নায়িকার আগমন ঘটেছে তখন তার রূপের বর্ণনায় স্পষ্টতই ধরা পরে এক মুগ্ধ পুরুষের দৃষ্টি— "এইমাত্র উনুনের কাছ থেকে উঠে এসেছে। আগুনের আঁচ লেগেছে মুখে, কপালে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আটপৌরে কালোপেড়ে শাড়িখানার আঁচল কোমরে জড়ানো। আঙুলগুলিতে ঈষৎ হলুদের ছোপ। তবু এই বেশে ভারি সুন্দর মনে হল অঞ্জলিকে, ভারি নতুন লাগল। আর কোন মেয়ের সুগৌর ছোট কপালে ঘামের বিন্দুও যে এমন নয়নাভিরাম হয়, তা আমি এই প্রথম লক্ষ্য করলাম।"

স্বাভাবিকভাবেই দেখা যায় এই দুই নারীরূপের বর্ণনায় সুস্পষ্ট ভাষারীতির পার্থক্য আছে। প্রথম দৃষ্টান্তটিতে ছোটো ছোটো বাক্য রচনা করে একটি বিবাহিত মেয়ের রূপ সমবয়েসী আরেকটি মেয়ের চোখে কীরূপে ধরা পড়েছে তার পরিচয় পরিস্ফুট। নতুন মা হবার আনন্দ ও মুক্তিতে সে রূপ উজ্জ্বল, আবার একজন বন্ধুস্থানীয় অবিবাহিতা সমবয়স্কা আত্মীয়ার সামনে কম বয়সেই বিয়ে ও মা হবার জন্য সে যেন একটু লজ্জিতও হয়ে পড়েছে। রাঙা মুখ তাই সিঁথির সিঁদূরের রঙ লাভ করেছে লজ্জায়। অপরপক্ষে দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে নারীর রূপ বর্ণিত হয়েছে মুগ্ধ পুরুষের দৃষ্টিতে, প্রেমিকের দৃষ্টিতে। তাই সেই বর্ণনা অনুপুঙ্খতা নিয়ে উপস্থিত। অতি সাধারণ ছবি, অতি সাধারণ দৃশ্য তবুও তা নয়নাভিরাম হয়ে দেখা দিয়েছে। আগুনের আঁচে রাঙা হওয়া মুখ, কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম, আটপৌরে কালো পেড়ে শাড়ি আর আঙুলে ঈষৎ হলুদের ছোপ— এসব নিয়ে একটি গৃহকর্মরতা মেয়ের সাধারণ বর্ণনা; কিন্তু প্রিয়ার রূপ প্রেমিকের চোখে অসাধারণত্ব লাভ করেছে নব অনুরাগে রঙিন হয়ে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, উভয় ক্ষেত্রেই নারীর মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে, প্রথম জনের মুখ রাঙা হয়েছে লজ্জায়, দ্বিতীয় জনের উনুনের তাপে, কিন্তু সেটিও আসলে নব অনুরাগে অনুরাগিনীর রঙিন মনকেই প্রকাশ করেছে।

'মাধুরী মঞ্জরী' বা 'অসবর্ণা' গল্পে নরেন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন নারীর সুরূপের বর্ণনা; কিন্তু কখনো কখনো নারীর কুরূপের বর্ণনাও রয়েছে তাঁর রচনায়। 'নাম' গল্পটিতে 'রসো' চরিত্রটির বর্ণনা করেছেন লেখক তাঁর স্বভাবসিদ্ধভঙ্গিতে— "বছর তিরিশেক হবে বয়স। লম্বা ছিপছিপে একটি গাবের চারার মত চেহারা। কোনো অঙ্গে যে বিশেষ রকমের খুৎ আছে তা নয় কিন্তু অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোনো রকম সামঞ্জস্যই যেন নেই। অত বড় মুখে নাক এবং চোখ দুটিকে ভারি ছোট মনে হয়। দেহের তুলনায় হাত দুখানিও খুব খাটো এবং নিচের অংশ কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত রকমের লম্বা। চেহারায় পুরুষালি ধরণটাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। আসলে ও যেন মেয়ে নয়, মেয়ে সেজে এসেছে এবং সাজটা সম্পূর্ণ করার দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য নেই।"

এমনই এক পুরুষালি মহিলার রূপের বর্ণনা আমরা প্রায় একই রকমভাবে পাই নরেন্দ্রনাথের সমকালীন আর এক গল্পকার সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে। 'সুন্দরম' গল্পে সুকুমারের জন্য পাত্রী নির্বাচনের সময় সত্যদাসের মেয়ে মমতার বর্ণনা দিতে গিয়ে সুবোধ ঘোষ লেখেন— "মমতার রূপে অসাধারণত্ব আছে সন্দেহ নাই। ঘুটঘুটে অমাবস্যার মত ঘনকৃষ্ণ গায়ের রং। সমস্ত অবয়বে সুপেশল কাঠিন্য মণিবন্ধ ও কনুইয়ের মজবুত অস্থিসজ্জা আর হাতপায়ের রোমঘন পারুশ্য পুরুষকেও লজ্জা দেয়। চওড়া করোটির ওপর অতিকুঞ্চিত স্থূলতত্ত্ব চুলের ভার, নীলগিরির চূড়ার ওপর স্নিগ্ধ মেঘ-স্তবকের মত। এক দৃঢ়া দ্রাবিড়া নায়িকার মূর্তি।" এ হেন রমণীর দৃষ্টিপাতেরও বর্ণনা দিয়েছেন লেখক— "বরমালাকাঙাল অবলার দৃষ্টি এ নয়; বরং এক অকুতোলজ্জা স্বয়ংবরার জিজ্ঞাসাই যেন জ্বল্‌জ্বল্ করছে।"

'নাম' ও 'সুন্দরম' এই দুই গল্পের ক্ষেত্রেই দুই লেখক নারী রূপে কুরূপতার কথা, বিশেষ করে নারীরূপে পুরুষালি ভাবের আধিক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে উভয়ের ভাষারীতিতেই যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সুবোধ ঘোষ চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন একের পর এক উপমার দ্বারা, আর তাঁর বর্ণনায় সংযোজিত শব্দসমূহ তৎসম বা তৎসমগন্ধী এবং তাঁর বর্ণনায় ব্যঙ্গের দিকটিই আভাসিত। 'নীলগিরির চূড়ার ওপর স্নিগ্ধ মেঘস্তবক' বা 'রোমঘন পারুশ্য' প্রভৃতি শব্দ বা বাক্য ব্যবহারে হাস্যরস সৃষ্টির উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। এছাড়া কেবল তৎসমগন্ধী শব্দ ব্যবহারই নয় বিশেষণ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তিনি লিঙ্গভেদ করেছেন, যেমন দৃঢ়া, দ্রাবিড়া ইত্যাদি। অপরদিকে নরেন্দ্রনাথ একই রকম পুরুষালি ধাঁচের নারীর চিত্র অঙ্কন করেছেন, কিন্তু সেই চিত্রাঙ্কন অনেক সংযত। ব্যঙ্গের দৃষ্টি সেখানে প্রধান হয়ে ওঠেনি বরং সমবেদনার দৃষ্টিই যেন খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর ভাষাও চলিত ভাষা, তৎসমগন্ধী শব্দ ব্যবহারের নাম গন্ধও নেই। তিনি উপমাও গ্রহণ করেছেন সহজ, সরল, বলেছেন— "লম্বা ছিপছিপে একটি গাবের চারার মত চেহারা।"

এখন দেখা যাক এমন একটি নারী চরিত্রের রূপ বর্ণনার উদ্দেশ্য কী? প্রকৃতপক্ষে চেহারা সর্বদা মনের পরিচয়বাহী নয়। নারীর নারীত্ব তার পুরুষালি চেহারায় ঢাকা পড়েনা, চেহারায় লালিত্য, সুষমা বা কমনীয়তা না থাকলেও নারীর নারীসুলভ মানসিকতা বিনষ্ট হয় না। 'নাম' গল্পে দেখা যায় রসোর মত

আপাতদৃষ্টিতে এক অ-নারীর প্রতিও কুঞ্জ কবিরাজ আকর্ষিত হয়েছে। পুত্র-কন্যাহীন বিপত্নীক কবিরাজ রসোর প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে অন্ধকারে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল। কিন্তু রসো-বৃদ্ধ কবিরাজকে তার বাসনা চরিতার্থ করতে দেয়নি। লণ্ঠনের গরম চিমনির ছ্যাকায় বৃদ্ধের গাল পুড়িয়ে দিয়েছে, হাতের কব্জি মুচড়ে দিয়েছে, হিড়হিড় করে টেনে এনেছে বাড়ির মধ্যে। কুঞ্জ কবিরাজের এই দেহবাসনাকে সবাই অস্বাভাবিক বলে মনে করেছে। সবার মনেই প্রশ্ন জেগেছে— "রসো সম্বন্ধে এমন ভুল, এমন মোহ, তাঁর হ'ল কি ক'রে? রসোর অন্তরে বাহিরে সত্যিই কি নারীত্ব ব'লে কিছু আছে?" প্রকৃতপক্ষে এই প্রশ্নটিই গল্পের মূল। যে নারীর চেহারা পুরুষালি, কণ্ঠস্বর কর্কশ, কথাবার্তার ধরণ ধারণ, আচার আচরণ, কাজকর্মের ধরণ, বেশবাশ সবই পুরুষালি বা বলা যায় নারীসুলভ নয়, তার অন্তরে-মনে নারীত্বের স্থান আছে কী না, এই প্রশ্ন এবং প্রশ্নের উত্তরেই গল্পের পরিসমাপ্তি। কুঞ্জ কবিরাজকে ঘৃণাবশতঃ রসো প্রত্যাখ্যান করেছে, কিন্তু এই বৃদ্ধই রসোকে যথার্থ নারীর মর্যাদা হয়তো দেয়নি কিন্তু তার নারীত্বকে স্বীকার করেছে। অপরদিকে রসোও সেই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় কুঞ্জ কবিরাজকে যথাযথভাবে তিরস্কার ও নিগ্রহ করেছে বটে কিন্তু রসো তার নারীত্বের স্বীকৃতিও সেই কুঞ্জু কবিরাজের কাছ থেকেই লাভ করেছে। গল্পের শেষাংশে দেখি, বসন্তের টীকা দিতে যখন স্বাস্থ্যদপ্তরের কর্মীরা এসেছে, তখন তাদের খাতায় সবাই তাদের ডাক নামের পরিবর্তে ভালো নাম নথিভুক্ত করেছে, সেই সময় রসোর পালা এলে সে তার 'রসো' নাম না বলে বলেছে, তার নাম 'রসমঞ্জরী'। এই রসমঞ্জরী নামেই কুঞ্জ কবিরাজ তাকে সেই রাতে ডেকেছিল। অতএব দেখা যাচ্ছে রসো তার আকৃতিতে, আচার, আচরণে যেমনই হোক না কেন, তার অন্তরে নারীত্বের ধারা প্রবহমান, কুঞ্জ কবিরাজের দ্বারা সে যেন সেই নারীত্বের স্বীকৃতিই লাভ করেছে। মানুষের বাহ্যিক আকৃতিই সব নয়, বাহ্যিক রূপ দেখে তার অন্তরকে বিচার করা যায়না— এই সত্যটিই গল্পে উদ্‌ভাসিত আর এই সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করবার জন্যই 'রসো'—এর রূপ বর্ণনার প্রয়োজন ছিল। অতএব দেখা যায় নারীর রূপের চিত্রাঙ্কন ও তার ভাষারীতি গল্পের মূল উপজীব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক যুক্ত। শুধু তাই নয় এই বর্ণনা লেখকের সচেতন প্রয়াসও গল্পের ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

সংলাপ রচনায় কুশলতা ঃ

১. "বিজন বলল, 'কী যে বলেন, ত্রুটি আবার কিসের ?'
মিসেস রায় বললেন, 'কাল সন্ধ্যায় আসুন আমার বাড়িতে।'
বিজন বলল, 'কেন, কাল কি কোন অনুষ্ঠান আছে ?'
স্মিতা বলল, 'বিনা অনুষ্ঠানে আপনি বুঝি কোথাও যান না ?'

মিসেস রায় বললেন, 'আপনার যাওয়াটাই তো একটা অনুষ্ঠান।'

তবু বিজন জিজ্ঞাসা করল, 'আর কাউকে কি বলেছেন?'

স্মিতা বলল, 'আপনি কি দলবল ছাড়া একা কোথাও যান না?' " ('আংটি')

২. " 'আচ্ছা, আপনি কি করেন তা তো একদিনও বললেন না।'

'সেটা এমন কিছু বলবার মতো নয়, একটা কলেজে পড়াই।'

'কোন কলেজে?'

'নাম যদি না বলি।'

'বলুন না।'

'ন'।

'তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি সেটা আপনার মনগড়া কলেজ।'

'ঠিক ধরেছেন।'

'আচ্ছা, আপনার সেই কলেজে কি শুধুই ছাত্রই আছে, না ছাত্রীরাও পড়ে?'

'শুধু ছাত্র।'

'বাঁচালেন। ছাত্রীরা পড়লে আমার ভারি হিংসে হত।'

'কেন হিংসে কিসের?'

'আর বলব না।' " ('ফোন')

৩. "হঠাৎ শিপ্রা বলল, 'আচ্ছা সুজিতবাবু, একটা বাজি রাখতে রাজী আছেন?'

সুজিত একটু ক্ষুন্ন হয়ে বলল, 'ফের বাবু?'

শিপ্রা বলল, 'ওটা বিলুপ্ত হবে, যদি বাজিতে জিততে পারেন।'

'বেশ বাজিটা কী।'

শিপ্রা বলল, 'আপনি আপনার স্ত্রীকে ফের সেইরকম কচ সাজাতে পারেন?'

সুজিত বলল, 'নিশ্চয়ই। কখন?'

শিপ্রা বলল, 'এখন, এই মুহূর্তে।' " ('দেবযানী')

৪. 'একটু বাদেই টুকু মুখ তুলে সোজা মিলির দিকে তাকাল। তারপর সস্নেহ শাসনের ভঙ্গিতে বলল, 'তুই তো ভারি ফাজিল হয়েছিস মিলি। বিয়ের আগেই এই, বিয়ে হলে না যেন কী করবি।'

মিলি মৃদুস্বরে বলল, 'কী আর করব। বছর বছর মা হব।'

টুকু হেসে বলল, 'যেন অতই সোজা।'

মিলি বলল, 'পরীক্ষায় সেভেনটি টু পার্সেন্ট পাওয়ার চেয়ে সামান্য একটু কঠিন, তাই না?'

টুকু বলল, 'কী অহংকার। না হয় একটু ভালো পাশই করেছিস। তাই বলে নিজের ঢাক নিজে পেটাবি নাকি অমন করে?'

মিলি বলল, 'কী করি বল। আমার তো আর তোর মত অমন একজন কেউ আসেনি যে ঢাক পিটিয়ে দেবে।'

টুকু বলল, 'আহা-হা, কী আফশোস। তাহলে মামীমাকে বলি তোকে হস্টেল টস্টেলে পাঠানো বন্ধ রেখে সম্বন্ধ দেখুক।'

মিলি বলল, 'ঈস্। তার জন্যে মামীকে বলা কী দরকার? তোর জন্যে কাকে বলতে হয়েছিল শুনি? নিজেদের ব্যবস্থা তো নিজেরাই করে নিয়েছিস।'

টুকু লজ্জিত হয়ে বলল, 'তুই তাও শুনেছিস? কার কাছ থেকে শুনেছিস বল তো?'

মিলি বলল, 'সোর্স আমি বলব না। আমি বলি আর তুই তার গর্দান নে। 'It is an open secret' বিশ্ববাসী জানে।' " ('মাধবী মঞ্জরী')

নরেন্দ্রনাথ নিজে বাকপটু ছিলেন না[১]। কিন্তু তাঁর ছোটগল্পের সংলাপ রচনায় তিনি অনবদ্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। সমাজের বিভিন্ন স্তরবিন্যাস ও বহুস্তরীয় মানুষের ভাষা পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে বদল হয়ে যায় আবার একই মানসিকতায় বা পরিস্থিতিতে বিভিন্ন স্তর ও বিত্তের মানুষের ভাষাও এক থাকে না। নরেন্দ্রনাথের গল্পের সুবিশাল ভাণ্ডারে উচ্চবিত্ত অপেক্ষা মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের ভীড় সহজেই চোখে পড়ে কিন্তু এই একই শ্রেণিভুক্ত মানুষের মধ্যেও যে সূক্ষ্ম স্তরবিন্যাস বর্তমান তা, তাদের ভাষা ব্যবহারে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। নরেন্দ্রনাথ বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণি এবং একই অর্থনৈতিক শ্রেণিভুক্ত মানুষের মধ্যে বিভিন্ন বয়সের মানুষের এমনকি স্ত্রী ও পুরুষের সংলাপেও ভাষার সুস্পষ্ট পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন থেকে চরিত্র অনুযায়ী তাদের সংলাপের পার্থক্য করেছেন। কেবলমাত্র সংলাপ নয়, পরিস্থিতির বিচারে বিভিন্ন স্তরের মানুষের কার্যকলাপও যে ভিন্ন হয় সেই দিকটিও নরেন্দ্রনাথের গল্পে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের সংলাপের ক্ষেত্রে ভাষারীতির সুস্পষ্ট পার্থক্যকে আরও কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে সুস্পষ্ট করা যেতে পারে—

১. "এক মুহূর্ত জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল মোতালেফ, তারপর ছুটে গিয়ে মুটি ক'রে ধরল সেই ভিজে চুলের রাশ, 'হারামজাদী, গুড় পুইড়া গেল সেদিকে খেয়াল নাই তোমার, তুমি আছ সাজগোজ লইয়া, পটের ভিতর গুনা বাইরাইয়া আইলা তুমি বিদ্যাধরী, এ জৈন্যই গুড় খারাপ হয় আমার, অপমান হয়, বদনামে দেশ ছাইয়া গেল তোমার জৈন্যে।'

ফুলবানু বলতে লাগল, 'খবরদার, চুল ধইরো না তাই বইলা, গায়ে হাত দিওনা।' "('রস')

২. " বিনোদ আঁচাতে যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে অদ্ভুত একটু হাসল, 'আসলে সেই হচ্ছে

কথা। আমি যে একটু ক'রে দুধ খাই, তা তোমার প্রাণে সয়না, তা তুমি দু'চোখে দেখতে পারনা। সেই হিংসেয় জ্বলেপুড়ে মর।'

লতিকা বলল, 'তোমার দুধ খাওয়া দেখে আমি জ্বলে পুড়ে মরি! মরি তো বেশ করি। বুড়ো বেটা তুমি, লজ্জা করেনা রোজ রোজ সকলের সামনে দুধ খেতে! একদিন দুধ কম পড়লে তাই নিয়ে বাড়ি মাথায় করতে!'

এঁটো হাতেই বিনোদ রুখে এল, 'লজ্জা করবে কেনরে হারামজাদী আমি কি তোর বাপের পয়সায় দুধ খাই, নিজের পয়সাই খাই - নিজে খাই আমি। লজ্জা তোদের করা উচিত।' "('এক পো দুধ')

৩. " ম্যানেজার বিদায় নিলে রেবা ছুটে এল ঘরে, 'এই শোন মূর্তিটা কাউকে বিক্রি করতে পারবে না কিন্তু, ওটি আমি নেব, ভারি চমৎকার হয়েছে।'

অবিনাশ শ্লেষের হাসি হাসল, 'ম্যানেজারের মুখ থেকে কথাটা মুখস্থ ক'রে নিয়েছ বুঝি।'

'বাঃ! তা কেন? সত্যি আমার ভারি ভালো লেগেছে।'

অবিনাশ বলল, 'তাই নাকি? আমার অসীম সৌভাগ্য। কিন্তু দুদিনের মধ্যে হাজার টাকায় মূর্তিটা বিক্রি হয়ে যাবে দেখে নিও।' "('প্রতিদ্বন্দ্বী')

উপরোক্ত তিনটি উদাহরণের প্রথমটিতে 'রস' গল্পে সমাজের নিম্নবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি মুসলিম দম্পতি মোতালেফ ও ফুলবানুর কলহের সংলাপ উপস্থাপিত হয়েছে। অপর দুটি উদাহরণে যথাক্রমে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের স্বামী-স্ত্রী বিনোদ ও লতিকা ('এক পো দুধ' গল্প) ও সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি অবিনাশ ও রেবার দাম্পত্য জীবনের কলহের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মোতালেফ কলহের সময় কেবলমাত্র 'হারামজাদী', 'বিদ্যাধরী' প্রভৃতি অশিষ্ট শব্দ প্রয়োগ করেই ক্ষান্ত হয়নি উপরন্তু ফুলবানুকে চুলির মুঠি ধরে প্রহারও করেছে। 'পটের ভিতর গুনা বাইরাইয়া আইলা' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগে মোতালেফের সামাজিক স্থানটি পরিস্ফুট হয়। অপরদিকে বিনোদ ও লতিকার মধ্যে বাদানুবাদে কেবল অশিষ্ট শব্দের প্রয়োগ হয়েছে যেমন - 'বুড়ো বেটা', 'হারামজাদী' ইত্যাদি। এখানে বিনোদ লতিকার গায়ে হাত তুলবার সাহস পায়নি। এছাড়া 'তোমার প্রাণে সয়না' বা 'সেই হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মর' বাক্যগুলি ব্যবহারে মোতালেফ ও ফুলবানুর কলহের ভাষার সঙ্গে বিনোদ ও লতিকার কলহের ভাষা পৃথক হয়ে যায়। 'প্রতিদ্বন্দ্বী' গল্পে দেখা যায় অবিনাশ ও রেবা যেহেতু সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি সেইহেতু সেখানে প্রহার দূরস্থান অশিষ্ট শব্দের প্রয়োগও তাদের সামাজিক অবস্থানের পরিপন্থী। এই গল্পে অবিনাশ ও রেবার সম্পর্কের তিক্ততা তাই প্রকাশিত হয়েছে শ্লেষ তীক্ষ্ণতায়। 'আমার অসীম সৌভাগ্য' বা 'ম্যানেজারের মুখ থেকে কথাটা মুখস্থ ক'রে নিয়েছ বুঝি' —এই বাক্যবন্ধগুলি সেই শ্লেষাত্মক

কলহবাক্যের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। অতএব দেখা যাচ্ছে বক্তাদের বক্তব্য ও আচরণে তাদের সামাজিক অবস্থান, রুচি ও শিক্ষার পার্থক্য সূচিত হয়েছে আর তাদের বদলে যাওয়া সংলাপে ভাষা সেই পার্থক্যের পরিচয়বাহী হয়েছে।

এখানে নারী-পুরুষের কলহের ভাষার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি দিক লক্ষ্যণীয়, আর তা হল পুরুষের আক্রমণকে প্রতিরোধ করবার জন্য তিন রমণীর আচরণগত পার্থক্য। প্রত্যেকের প্রতিরোধের ধরণটিও তাদের সামাজিক অবস্থানের মতই ভিন্ন। ফুলবানু মোতালেফের শারীরিক আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিআক্রমণ করতে পারেনি। দৈহিক ভাবে তো নয়ই এমনকি মুখেও সে প্রতিআক্রমণ করতে সক্ষম হয়নি। কেবল আত্মরক্ষায় দায়ে বলেছে, 'খবরদার, চুল ধইরো না তাই বইলা, গায়ে হাত দিওনা।' ফুলবানু সমাজের নিম্নবিত্ত শ্রেণির গৃহবধূ, সে জানে গৃহকর্মে ও স্বামীর জীবিকা অর্জনে তাকেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে, সেইখানে তার ত্রুটি ঘটেছে এও সে স্বীকার করে নিচ্ছে 'তাই বইলা' শব্দটির দ্বারা তার অপরাধের পরোক্ষ স্বীকৃতি যেন ফুলবানু দিয়েছে। সে জানে কাজে ত্রুটির জন্য কিছু শাস্তি প্রাপ্তিও তার স্বাভাবিক, সে কেবল শারীরিক নিগ্রহ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চেয়েছে। অপরদিকে 'এক পো দুধ' গল্পের নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহবধূ লতিকা তার সামাজিক অবস্থানের কারণেই অনেক বেশি প্রতিবাদে সক্ষম। সে স্বামীর কটু বাক্যকে নীরবে সহ্য না ক'রে স্বামীর প্রতি তীব্র বাক্যবাণ হেনেছে। যেমন— 'বুড়ো বেটা তুমি, লজ্জা করেনা....' ইত্যাদি ইত্যাদি।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পের সংলাপ সমূহ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় কলহের ভাষার মত চরিত্র অনুসারে প্রেম নিবেদনের ভাষারও পার্থক্য ঘটেছে। যেমন 'রস' গল্পে মোতালেফ মাজুখাতুনের সঙ্গে করেছে প্রেমের অভিনয়, কারণ ফুলবানুকে বিয়ে করবার জন্য প্রয়োজন অর্থ আর সেই অর্থ সংগ্রহের হাতিয়ার মাজুখাতুন। ফুলবানু ও মাজুখাতুন এই দুই রমণীকেই মোতালেফ প্রেম নিবেদন করেছে। কিন্তু প্রকৃত প্রেম ও কপট প্রেমের জন্যই উভয়ের ক্ষেত্রে তার আচরণের পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে তার মুখের ভাষা। দুই রমণী অর্থাৎ ফুলবানু ও মাজুখাতুনের সঙ্গে মোতালেফের কথোপকথন পর্যালোচনা করলেই ভাষা ব্যবহারের এই পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। ফুলবানুর সঙ্গে মোতালেফের কথোপকথন নিম্নরূপ-

"এদিকে ওদিকে তাকিয়ে আরা একটু এগিয়ে এল ফুলবানু, 'শোনবা আবার কি, শোনবা মনের কথা। শোন, বা-জানের মাইয়া টাকা চায় না, সোনা দানাও চায় না, কেবলমাত্র রাখতে চায় মনের মাইনষের। মাইনষের ত্যাজ দেখতে চায়, বুঝছ?'

মোতালেফ ঘাড় নেড়ে জানালে, বুঝেছে।

ফুলবানু বলল, 'তাই বইলা অকাম কুকাম কইরো না মেঞা, জমি খেত বেচতে যাইও না।'

বেচবার মত জমি অবশ্য মোতালেফের নেই, কিন্তু সে গুমর ফুলবানুর কাছে ভাঙল না মোতালেফ,

বলল, 'আইচ্ছা, শীতের কয়ডা মাস যাউক, ত্যাজও দেখাব, মানও দেখাব। কিন্তু বিবিজানের সবুর থাকবেনি দেখবার ?'

ফুলবানু হেসে বলল, 'খুব থাকব। তেমন বেসবুর বিবি ভাইবো না আমারে।"

অপরদিকে চতুর মোতালেফ মাজুখাতুনের কাছে তার কপট প্রেম নিবেদন করেছে এইভাবে—

"মোতালেফ মিষ্টি করে বলল, 'গতরের আর দোষ কি বিবি। গতর তো মনের হাত ধইরা ধইরা চলে। মনের সুখই গতরের সুখ।' মাজুখাতুন বলল, 'তো যাই কও তাই কও মেঞা, চাইর আনার কমে পারব না এবার।'

মোতালেফ এবার মধুর ভঙ্গিতে হাসল, 'চাইর আনা ক্যান বিবি, যদি ষোল আনা দিতে চাই, রাজী হবা তো নিতে?' "

উপরের দুটি উদ্ধৃতি থেকে দেখা যায় মোতালেফ মাজুখাতুনের সঙ্গে যেহেতু প্রেমের অভিনয় করেছে, সেইজন্য সেই ক্ষেত্রে তার আচরণে ও সংলাপে কৃত্রিমতা অধিক পরিমাণে প্রকাশিত। সে মাজুখাতুনের কাছে কৃত্রিম কাব্যময়তায় প্রেম নিবেদন করেছে; ব্যঞ্জনা বাহুল্যে বক্তব্যকে ক'রে তুলতে চেয়েছে মধুর ও সংকেতময়। 'গতরের সুখ' ও 'মনের সুখে'র সম্পর্ক বা 'চাইর আনা'র পরিবর্তে 'ষোল আনা' দিতে চাওয়ার মধ্য দিয়ে মূল বক্তব্যকে গূঢ় ব্যঞ্জনাময় মাহাত্ম্য দান করা তার উদ্দেশ্য। অপরদিকে ফুলবানুর সঙ্গে কথোপকথনে সে অনেক স্পষ্টতার পরিচয় দিয়েছে আর অন্তরের উদ্বেগ আশঙ্কাও সেখানে প্রকাশিত। তাই সে বলেছে - 'কিন্তু বিবিজানের সবুর থাকবেনি দেখবার ?' এছাড়াও দেখা যায় ফুলবানুকে মোতালেফ মাজুখাতুন অপেক্ষা অধিক অন্তরঙ্গ সম্বোধনে আপ্যায়িত করেছে; মাজুখাতুনকে সে বলেছে 'বিবি' আর ফুলবানুকে 'বিবিজান'। সংলাপের পার্থক্য ব্যতীতও উভয় ক্ষেত্রে মোতালেফের আচরণগত পার্থক্যও বিশেষ লক্ষ্যণীয়। মাজুখাতুনের সঙ্গে তার কথোপকথন বর্ণনায় লেখক বলেন— 'মোতালেফ মিষ্টি করে বলল' অর্থাৎ বচনের এই মিষ্টত্ব বক্তার অন্তরের নয়, তা আরোপিত। তাই বক্তা মিষ্টি সুরে না বলে 'মিষ্টি করে' বলে। এরপরেও মোতালেফ চেয়েছে পুনরায় মায়া বিস্তার করতে, তার এই মনোভাব তার দেহভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে। লেখক বলেন - 'মোতালেফ এবার মধুর ভঙ্গিতে হাসল' -এখানে 'এবার' শব্দের ব্যবহার পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, মোতালেফ পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক মাজুখাতুনকে সন্তুষ্ট করতে এসেছে। অপরপক্ষে 'মধুরভঙ্গি' শব্দে বোঝা যায় মোতালেফের হাসির মাধুর্য অকৃত্রিম নয় তা ভঙ্গি বা অভিনয় মাত্র, তা স্বেচ্ছায় আরোপিত। অন্যত্র মোতালেফের এই বিনয় বা কাতর প্রেম নিবেদনের রূপটি বদলে গেছে। ফুলবানুর সঙ্গে কথোপকথনে তার বলিষ্ঠতা ও তেজ প্রকাশ পেয়েছে। সে কখনো ফুলবানুর কথার উত্তরে নিশ্চুপ থেকে ঘাড় নেড়ে বক্তব্যকে প্রকাশ করেছে, আবার কখনো তেজস্বীতা

প্রকাশ করে বলেছে - 'ত্যাজও দেখাব, মানও দেখাব।' আবার একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে তার হৃদয়ের ব্যাকুলতা।

সংলাপে আঞ্চলিকভাষার প্রয়োগ ঃ

নরেন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোর কাল কেটেছে পূর্ববাংলায়, ফরিদপুর জেলায় অন্তর্গত সদরদি গ্রামে। ফলে পূর্ববঙ্গের ভাষার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ-প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। এছাড়া পূর্ববঙ্গের মুসলমান জনগণের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাদের তিনি তাঁর ছোটগল্পে বহুলাংশে স্থান দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ব্যতীত নরেন্দ্রনাথ মিত্রই মুসলিম জনগণকে নিয়ে সর্বাধিক ছোটগল্প রচনা করেছেন। এই কারণে পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত চলিত ভাষার সঙ্গে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষদের বিশিষ্ট ভাষাভঙ্গিটিও নরেন্দ্রনাথ সার্থকভাবে তার রচিত ছোটগল্পের সংলাপ রচনায় ব্যবহার করেছেন। ফলে তাঁর চরিত্রগুলি হয়ে উঠেছে বাস্তবগ্রাহ্য ও জীবন্ত। তারা তাদের ধূলি মাটির গন্ধ সহ আমাদের সামনে চলে ফিরে বেড়ায়। চণ্ডী লাহিড়ী লিখেছেন - 'পূর্ববঙ্গের মানচিত্র নরেনবাবুর মুখস্থ। সেখানকার জনজীবনের নিত্যদিনের ভাষাও তাঁর জানা।'[২] এই অভিজ্ঞতারই ছায়াপাত ঘটেছে পূর্ববঙ্গের মানুষদের নিয়ে রচিত ছোটগল্পগুলির সংলাপ রচনায়। এখন কিছু উদাহরণ উদ্ধার করে নরেন্দ্রনাথের গল্পে সংলাপ রচনায় আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগের দিকটি পরিস্ফুট করা যেতে পারে।

১. " একটু ইতস্ততঃ করে একটু ভেবে চম্পা বলল, 'কিন্তু যদি ধইরা ফেলায়' । লালমোহন একটু হাসল, 'তাইলে তো বোঝই। হাত ধরাধরি কইরা দুইজনরেই জেলে যাইতে হইবে। শুনছি জায়গাডা নেহাৎ মন্দ না সেখানে। খোরাকও মেলে, থাকার জায়গাও মেলে।'

চম্পা বলল, 'বেশ রাজী আছি। কিন্তু পেরথমেই ধইরা ফেলবে যে। আপনার কেমন ধোপ-দুরস্ত ফর্সা জামা কাপড় আর আমার এই নোংরা ছেঁড়া শাড়ি। স্বামী-স্ত্রীর মত মানাবে কেন?'

লালমোহন খুশি হয়ে বলল, 'ঠিকই তো কইছ। তোমার বুদ্ধি আছে চম্পা। এমন বুদ্ধি আগাগোড়া থাকলে তুমি কেবল আমার ক্যান, জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটের বউ হইতে পারবা। দাঁড়াও একটু। আমি সব ব্যবস্থা কইরা আনি।' " ('শুল্ক')

২." তরঙ্গ উল্লসিত হয়ে উঠল, 'দেখলাম তাজ্জব জিনিস বউদিদি। ছবিতে কথা কয়, গান গায়। আহাহা সেকি গান! তারপর দিদিমণির মত বয়সী একজন সুন্দরী আব্বিয়াত মাইয়ার সঙ্গে -' তরঙ্গ মুখ টিপে একটু হাসল। 'আর পুরুষ মানুষটা ঠিক আমাগো ও বাসার ছোট দাদাবাবুর মত। তারপর দুইজনে

মিলা হাত ধরাধরি কইরা -' "('দ্বিচারিণী')

৩." ফুলবানু ফের ডাকল পিছন থেকে, 'ও সোন্দর মিঞা, রাগ করলানি? শোন শোন।'

মোতালেফ ফিরে তাকিয়ে বলল, 'কি শোনব?'

এদিকে ওদিকে তাকিয়ে আরো একটু এগিয়ে এল ফুলবানু, 'শোনবা আবার কি, শোনবা মনের কথা। শোন, বা-জানের মাইয়া টাকা চায় না, সোনা দানাও চায়না, কেবল মান রাখতে চায় মনের মাইনষের। মাইনষের ত্যাজ দেখতে চায়, বুঝ্ছ ?' .....

ফুলবানু বলল, 'তাই বইলা আকাম কুকাম কইরো না মেঞা, জমি ক্ষেত বেচতে যাইও না।'

মোতালেফ বলল, 'আইচ্ছা শীতের কয়ডা মাস যাউক, ত্যাজও দেখাব, মানও দেখাব। কিন্তু বিবিজানের সবুর থাকবেনি দেখবার?'

ফুলবানু হেসে বলল, 'খুব থাকব। তেমন বেসবুর বিবি ভাইবো না আমারে।' " ('রস')

৪." রাজমোহনকে পিছিয়ে যেতে দেখে মকবুল একটু হাসল, 'ডরাইলেন নাকি ধলাকর্তা। ডরাইবেন না। শত হইলেও আপনি বুড়া। এ মুল্লুকের মানী-জ্ঞানী মানুষ। আপনারে কি আমি অপমান করতে পারি? কিন্তু ও টাকা আপনে ফিরাইয়া নিয়া যায়ন। আমার ছাওয়াল-মাইয়া মিষ্টি খায় না। খাইলে তাগো প্যাটে কিরমি হয়, প্যাট কামড়ায়, আপনে বাড়ি যায়ন ধলাকর্তা। খাট আমি ফেরত দেব না।'

অপমানে রাজমোহনের মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠলো। রোমশ কান দুটো পুড়ে যেতে লাগল। টাকাগুলি ট্যাঁকে ফের গুঁজে রাখতে রাখতে রাজমোহন বললেন, 'আইচ্ছা, কিন্তু কথাটা মনে রাইখো মকবুল শেখ, মনে রাইখো। পাকিস্তান পাইচ বইলা যে, সকলেই লাট হইয়া গেছে, তা ভাইবো না, ভাইবো না এক মাঘেই শীত যাবে।' " ('পালঙ্ক')

৫." রাজমোহন চলে গেলে ফতেমা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভয়ে ভয়ে বলল, 'হইছে কি? ধলাকর্তা অমন রাগারাগি করলেন ক্যান?'

মকবুল বলল, 'আর ক্যান! খাট বিক্রি কইরা আবার সেই খাট ফিরাইয়া নিতি আইছেন। টাকা সাধাসাধি করতি আইছেন।'

ফতেমা বলল, 'কাণ্ড দ্যাখ। তা কি কইলা তুমি?'

মকবুল হেসে বলল, 'পায়ে ধইরা কইলাম, ধলাকর্তা, যদি পছন্দ হয়, পালং-এর বদলে আমার বিবিরে নিয়ে যায়ন।'

ফতেমা লজ্জিত হয়ে বলল, 'আউ আউ আউ। বুড়া মানুষডারে তুমি অমন কথা কইতে পারলা?

শরম করল না?' ....

ফতেমা এবার বলল, 'কিন্তু মাইয়া-মানুষই যদি সব মেঞা, মাইয়ামানুষ থাকলে যদি তোমাগো আর কিছুই না লাগে, তাইলে পালং পালং কইরা তুমিই বা অস্থির হইছ ক্যান। দিয়া দাওনা ধলাকর্তার পালং ধলাকর্তারে। উনি মানুষ তো সোজা না। ভালো না করতে পারেন, মন্দ করলে ঠ্যাকায় কেডা? ছাওয়ালপান লইয়া ঘর করি, যাই কও, আমার কিন্তু বুকের মদ্যি কাপে।'

মকবুল স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাপুক বিবি, কাপুক! তোমাগো বুক কাপবার জন্যেই হইছে, কাপলেই সোন্দর ঠেকে।' " ('পালঙ্ক')

মানসিক অবস্থার চিত্রণ ঃ

আলোচক বলেন— " আধুনিক ছোটগল্পে মানুষের জটিল চিত্তবৃত্তি অন্যতম মুখ্য বিষয়রূপে গৃহীত হয়েছে। বাইরের ঘটনার গুরুত্ব কমে গিয়ে ক্রমশঃই বড়ো হয়ে উঠেছে হৃদয়াবেগের ছবি।"[৩] প্রকৃতপক্ষেই বর্তমানকালে মানুষের অন্তর্জীবনের চিত্রায়নেই গল্পকারদের বিশেষ প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রভাবিত গল্পকারদের মত বৈজ্ঞানিকের নির্মোহ নিরাসক্ত দৃষ্টিতে মানুষের মনোলোকের উন্মোচনে হয়তো নরেন্দ্রনাথ উচ্চকিত হয়ে উঠেননি বা কেবল মনোবিকারকে চিত্রিত করতেই তাঁর সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করেননি কিন্তু তাঁর গল্পের চরিত্রদের মনোজগতকে তিনি শক্তিশালী লেখকের মতই অনুসন্ধান করেছেন এবং সেই মনোজগতের অগাধ রহস্য অনুসন্ধানে সফল হয়েছেন। 'যৌথ' গল্পে স্বরূপের মানসিক অবস্থার চিত্রণে নরেন্দ্রনাথ লেখেন— "কিন্তু দিনের পর দিন সময় বদলায়, আর বদলায় মানুষের মন। সময় কি সত্যিই বদলায়— না মানুষের পরিবর্তনে সময় বদলানো মনে হয়? ..... না, সময় ঠিক এক রকমই থাকে বোধ হয়। বদলায় কেবল মানুষ— মনে আর ব্যবহারে।" প্রকৃতপক্ষে এখানে লেখকের স্বরন্যাসই ধরা পড়ে। যেহেতু তিনি ছিলেন 'মনের কারবারি'। সেইহেতু মানুষের মানসিকতার চিত্রণ তাঁর গল্পে বিশেষ প্রাধান্য ও উজ্জ্বলতা নিয়ে ধরা পড়েছে। এই মন মানসিকতা প্রকাশের ভাষা, মানুষের আদিম চিত্তবৃত্তির পঙ্কিল বর্ণনায় আবিল নয়, বরং অনেক সংযত, অনেক ইঙ্গিতময় কিন্তু গভীরতায় তা অতলস্পর্শী। তাঁর লেখা গল্প থেকে কিছু উদাহরণ উদ্ধার করা যেতে পারে -

১."আকাশের দিকে তাকালেন মৃগাঙ্কবাবু। অসংখ্য তারা জ্বলজ্বল করছে। ..... দুটি একটি তারা ছাড়া সব তারাই মৃগাঙ্কবাবুর কাছে বেনামা, অজ্ঞাতকুলশীল। তবু আশ্চর্য, মাঝে মাঝে ওই অজ্ঞাত

রহস্যলোক তাঁকে হাতছানি দেয়। এই সীমাহীন অফুরন্ত আকাশ তাঁকে একটি মাত্র প্রশ্ন করে, কেন? কেন? কেন? এই গণ্ডীবদ্ধতা কেন? কেন এই দেহজাত সংস্কার আর মনোগত বাসনার বন্ধন? কেন এই ঐকান্তিক আত্মরতি আর অন্তহীন অনাত্মীয়তা।"('গণ্ডী')

২." 'অসিত বলল, 'ঠিক বলেছিস। আলস্য, ঔদাস্য আর জড়তা সব ঢেকে দিচ্ছে। সেই প্যাশন আর কোন কিচ্ছুর মধ্যে নেই। না প্রেমে না বন্ধুত্বে না হিংস্র শত্রুতায়। তোর কি মনে হয় না মাত্র এই পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বয়সে এসেই আমরা বুড়িয়ে যাচ্ছি? বড্ড তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাচ্ছি?' "('অভিন্ন হৃদয়')

৩."মৃত্যুশোকে সান্ত্বনা দিতে এসেছেন অনিমেষ। তাঁর মনে হল জরার জন্যেও সান্ত্বনা দরকার। জরা মৃত্যুরও বাড়া।" ('বীতশোক')

৪."দীর্ঘকালের নাগরিক অভ্যাস বদলানো শক্ত। মনের জোর জিহ্বায় যত সহজে সঞ্চারিত হয় অন্য সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তত সহজে হয়ে ওঠে না।" ('নাম')

৫."লাভ যে কী চিন্ময় তা ওদের বোঝাতে পারবেনা। গুণের উপভোগের স্বাদ একরকমের আর মানুষের ব্যক্তিত্বের স্বাদ অন্যরকমের। দোষে গুণে, মূঢ়তায় বুদ্ধিমত্তায় মহত্ত্বে ক্ষুদ্রতায় মিশ্রিত যে মানুষ তাঁর সঙ্গে তাঁর বিশেষ বিশেষ মুহূর্তের সৃষ্টি সাহিত্য সংগীত কি চিত্রকলার তুলনা হয় না। সৃষ্টি যদি হয় ফুল স্রষ্টা সেখানে অরণ্য অন্তত বনস্পতি। এই ব্যক্তিগত সান্নিধ্য বন্ধুত্ব এবং হৃদয়ের উত্তাপ গ্রহণের জন্য চিন্ময়ের আগ্রহের সীমা নেই। কিন্তু তার আগ্রহ অসীম হলে কী হবে তারা যেন সব নির্বাপিত তাপ গ্রহ-উপগ্রহ। শীতল, একান্ত শীতল তাদের হৃদয়ের পরিমণ্ডল। নাকি চিন্ময় নিজেই অন্য কোনও অজানা গ্রহের অধিবাসী। এই পৃথিবীতে সে একান্ত প্রবাসী বহিরাগত। বহিরাগত কিন্তু যেখান থেকে এসেছে সেই স্বস্থানে ফিরে যাওয়ার পথও আর নেই। সেই পথের চিহ্ন সে যেন নিজেই মুছে দিতে দিতে এসেছে। এখন একমাত্র প্রস্থান ক্ষেত্র আছে অন্তরলোক। আর সবাইকে বাদ দিয়ে আর কারো কাছে কোনও কিছু প্রত্যাশা না করে শুধু নিজেকে নিয়ে বাস করা। মন চল নিজ নিকেতনে। সেই নিকেতনে কোনও সঙ্গী নেই, সঙ্গ কামনাও অবলুপ্ত হয়ে গেছে। যাদের ভিতরে কিছু নেই সেই রিক্ত অকিঞ্চন অভাজনেরাই নিজেকে ভয় পায়। তাদের স্ব-ত্ব বলে কিছু নেই। শুধু নিঃস্বতা আছে। তারা নিজেকে দু'মিনিটের বেশি সহ্য করতে পারে না। কিন্তু যাদের মন অর্জিত বিদ্যাবুদ্ধি অভিজ্ঞতা চিন্তা আর কল্পনার ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ তারা বসে বসে নিজের ব্যক্তিত্বকে উপভোগ করে। আর কারো কাছে যাওয়ায় তাদের দরকার হয় না।" ('দূতী')

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলি যেমন চরিত্রদের মানসিক অবস্থার দিকটিকে প্রকাশিত করেছে তেমনি আর একটি দিকও এখানে গুরুত্বপূর্ণ তা হল লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতি। এই ভাবনাগুলি যেমন চরিত্রদের নিজস্ব, তেমনি এর মধ্য দিয়ে লেখকের স্বরন্যাসও ধরা পড়ে, অনেক ক্ষেত্রেই লেখকের ব্যক্তিগত

অনুভূতি, দার্শনিকতা চরিত্রদের অন্তর্লীন ভাবনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনের কঠোর বাস্তবতার বর্ণনা ঃ

নরেন্দ্রনাথ মিত্র নিজে ছিলেন ছিন্নমূল উদ্বাস্তু। যদিও দেশবিভাগের পূর্বেই তিনি কলকাতায় চলে এসেছিলেন কিন্তু তাঁর পরিবারের অন্যান্যরা দেশবিভাগের পরেই কলকাতাবাসী হন। সপরিবারে কলকাতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে মধ্যবিত্ত মানুষের বিশেষত উদ্বাস্তু মানুষদের যে জীবনযাত্রা তিনি নিজে যাপন করেছেন সেই অভিজ্ঞতাকে তিনি বহু ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছেন এমন মানুষদের জীবন কাহিনি বর্ণনায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবন সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাসস্থানের অপ্রতুলতা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের চিত্রও তাঁর বর্ণনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর গল্প থেকে কিছু উদ্ধৃতি উদ্ধার করা যেতে পারে—

১. "একতলার ভাড়াটে ক্ষিতীশ আর প্রিয়তোষ। দু'জনেরই একখানা করে শোয়ার ঘর, একখানা রান্নার। এজমালী কল, চৌবাচ্চা, পায়খানা, ছাদ। একই দড়িতে দুই পরিবারের ধুতি, পাঞ্জাবি, শাড়ি, শেমিজ, জামা প্যান্ট শুকোয়। একই সরু প্যাসেজটুকু দিয়ে লুঙ্গি পরে গেঞ্জি গায়ে চটি পায়ে দিয়ে দু'জনে বাজারে বেরোয়। বাঁ হাতে থলি, ডান হাতে দুটি আঙ্গুল ঠোঁটের জ্বলন্ত বিড়িতে আটকা থাকে। রেশন আনবার দিন একই দোকানের সামনে একই সারিতে দু'তিনটে থলি হাতে সপ্তাহে ঘণ্টা দেড়েক করে দু'জনে দাঁড়ায়। সাড়ে ন'টার মধ্যে নাকে মুখে ভাত তরকারি গুঁজে দু'জনেই ছুটতে ছুটতে বাসের হ্যান্ডেল ধরে। কোনদিন ভিতরে ঢোকে, কোনদিন সারাটা পথই ঝুলতে ঝুলতে অফিসে গিয়ে পৌঁছায়। প্রিয়তোষ সরকার আর ক্ষিতীশ মজুমদার। জাতে একজন কায়স্থ আর একজন ব্রাহ্মণ। কিন্তু আভিজাত্যে দু'জনেই সমান।" ('ঋণ')

২. " রাজধানীই বটে, অনেক খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত এই শহরতলীতে এসে ঘর মিলেছে একখানা, একতলার স্যাৎসেঁতে ঘর চুন-বালি-ঝরা কত কালের পুরনো দেয়াল। জোরে বৃষ্টি নামলে ছাদ চুঁয়ে জল পড়ে জায়গায় জায়গায়। ঘটি বাটি পেতে রাখতে হয় ধরবার জন্য। জানলা দু'টি আছে বটে, কিন্তু খুলবার সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা নর্দমার গন্ধও আছে। বাথরুমটা প্রায় ব্যবহারের অযোগ্য। কল-চৌবাচ্চা নিয়ে তিন ঘর ভাড়াটে, আর উপরের বাড়িওয়ালার সঙ্গে মারামারি কাড়াকাড়ি। নোংরা ভরা উঠোন। মশা আর দুর্গন্ধ ভরা ঘর। গন্ধে, গানে এই তো কলকাতা।" ('কাঠগোলাপ')

নিম্নবিত্ত মানুষদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টার চিত্রকেও নরেন্দ্রনাথ সমান দক্ষতায় চিত্রিত করেছেন। যেমন—

ক. "পটলডাঙ্গা স্ট্রীটে বাণী পাবলিশিং-এ প্রুফ-রীডারের কাজ করে বিনোদ। সব সময় কাজ থাকে না। মাঝে মাঝে দশ-পনের টাকার টিউশনি পায়। ইনসিওরেন্সের একটা এজেন্সী আছে। পরিচিত বন্ধুদের পিছনে হাঁটাহাঁটি করে স্যাণ্ডাল ক্ষয় ক'রে ফেলে। তবু বছরে তিন-চার হাজারের বেশি দিতে পারে না।" ('এক পো দুধ') এ বর্ণনার ভাষা সহজ সরল কিন্তু অতিশয় জীবন্ত। এর অন্যতম কারণ এই জীবন নরেন্দ্রনাথ নিজে অতিবাহিত করেছেন। 'এক পো দুধ' গল্পটি প্রকাশিত হয় ভাদ্র ১৩৫৯ সালে আর ২৫ শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০ তারিখে কলকাতা থেকে নরেন্দ্রনাথ স্ত্রী শোভনাদেবীকে একটি পত্রে লেখেন— "চাকরি আর রাখা গেলনা। ওদের সিদ্ধান্ত ঠিক হয়ে গেছে। এখন যে-কোনওদিন নোটিশ দিয়ে দিলেই হয়। অন্য খোঁজখবর করছি। চাকরি একটা জুটবে, যখনই হোক। তবে মাঝখানে আবার হয়তো কিছুদিন চলবে সেই বেকার জীবন।" অতএব, যে লেখক নিজে উদ্বাস্তু ছিন্নমূল, নিজে কলকাতা শহরে জীবিকা অর্জনের জন্য জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য কঠোর সংগ্রাম করেছেন তাঁর লেখায় যে নিম্নবিত্ত মানুষের কঠোর জীবন সংগ্রাম অভিজ্ঞতার রসে জারিত হয়ে জীবন্ত রূপ লাভ করবে,তাতে আর আশ্চর্য কি । মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবন ও জীবিকা লাভের সংগ্রামের চিত্র তাই নরেন্দ্রনাথের গল্পে যত্রতত্র অথচ মহামূল্য মণি মাণিক্যের মতই উজ্জ্বল রূপে বিরাজ করছে । আরো কিছু দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যেতে পারে—

১. "শীতাংশু বলল, অল্প মাইনে আর অতিকষ্টের চাকরি। তাওতো ডিপার্টমেন্ট এখনও স্থায়ী হল না। চাকরি কবে আছে কবে নেই তারই বা ঠিক কি। পাটের সময় তো প্রায় সর্বদা মাঠেমাঠেই বেড়াতে হয়। ফিরে গিয়ে দুদিন যে একটু শান্তিতে নিশ্বাস নেবে তারও জো নেই। অড়িয়াল খাঁ নদীর পারের চর। তারই গা ঘেঁষে অফিস। টুল টেবিল সরিয়ে রাত্রে তার মধ্যেই শোয়ার জায়গা করে নিতে হয়। শুয়ে শুয়ে কানে আসে নদীর অন্য পার ঝুপ ঝুপ করে অনুক্ষণ ভেঙে পড়ছে তো পড়ছেই। এদিকে জাগছে চরের পর চর। আর কিচ কিচ করছে বালি। হাওয়া একটু জোরে বইলেই সে বালি উড়ে আসে চোখে মুখে, বিছানাপত্রের মধ্যে। ঝাড়াপোছার পর বিছানা বালিস থেকে যদি বা সে বালি যায়, মনের ভিতর থেকে কিছুতেই তা দূর হতে চায় না। সেখানে দিনভর রাতভর বালি কেবল কিচ কিচ করতেই থাকে।" ('ঘুষ')

২. "..... মার্চেন্ট অফিসের কেরাণীগিরি করে শিশিরের ভাতাটাতা ধরে এখনো পুরোপুরি দু'শো তে পৌঁছয়নি। টাকা পনের কমই আছে। অথচ দেশের বাড়ির সবাইকে কলকাতায় নিয়ে আসতে হয়েছে। খরচের সঙ্গে আর পেরে ওঠা যায় না। প্রত্যেক মাসেই ভাবে, লাইনটা ঠিক করে নেবে। কিন্তু হয়ে ওঠে না। মাইনে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় অর্ধেক টাকা আগের মাসের মুদি, কয়লা, ধোপার হিসাব শোধ করতে জলের মত বেরিয়ে যায়।" ('দীপান্বিতা')

ভাষায় কবিতার ব্যবহার ঃ

নরেন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ভাষা আলোচনার প্রথমেই তাঁর গল্পের ভাষায় কাব্যিক রীতির ব্যবহারের

দিকটি দেখানোর প্রয়াস করা হয়েছে। যেহেতু কবিতার প্রতি তার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা ও আকর্ষণ ছিল তাই তাঁর রচনায় বহু কবিতা সরাসরি উঠে এসেছে। এই সকল কবিতা কখনো সরাসরি, কখনও বা গদ্যাকারেও উঠে এসেছে— 'কিন্তু সব নামই তো রাধার শ্যাম নাম নয়, যে কানের ভিতরদিয়ে মরমে পৌঁছুবে।' (একটি মৃত্যু ও আমি)। তাঁর রচনায় ব্যবহৃত কবিতাগুলির মধ্যে শুধুমাত্র বাংলা কবিতাই নয়, ব্যবহৃত হয়েছে ইংরেজি কবিতা, বৈষ্ণব পদাবলী, রবীন্দ্রনাথের রচনা, কখনও বা সংস্কৃত শ্লোক। তাঁর গল্প থেকে অংশ উদ্ধার করে এই কবিতার ব্যবহার দেখানো যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের রচনার ব্যবহার—

ক. 'সে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সত্যি বলা যায়, 'মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান,' ('হলদেবাড়ী')

খ. 'চিত্ত যেথা ভয় শূন্য উচ্চ যেথা শির' ('ছোট দিদিমণি')

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের কবিতার ব্যবহার—

ক. "ওহে মৃত্যু তুমি মোরে কী দেখাও ভয়
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।" ('উদ্যোগ পর্ব')

বৈষ্ণব পদাবলীর ব্যবহার—

ক. 'যখন নাইট ডিউটি পড়ে তখন আমরা 'রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি' ('একটি মৃত্যু ও আমি')

সংস্কৃত শ্লোকের ব্যবহার—

ক. 'রাজা হেসে বলেন, 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।' ('শিখরে মুখ')

খ. "অর্থপ্রাপক কর্যৈক প্রযত্নপরতা বুধেঃ
প্রোজা পৌরুষ শব্দেন সর্বসমাদৃতেহনয়া।।" ('উদ্যোগ পর্ব')

গ. "অকৃত্বা মানুষং কর্ম যো দৈবমনুবর্ততে
বৃথা শ্রম্যতি সম্প্রাপঃ পাতং ক্লীবমিবাঙ্গনা।।" ('উদ্যোগ পর্ব')

ঘ. "দৈবং পুরুষকারেণ বিনাপি ফলতি ক্বচিৎ
যদুক্তং তদ্বচো ব্যর্থং যতঃ সিদ্ধি প্রযত্নতঃ।।" ('উদ্যোগ পর্ব')

যথাক্রমে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, মহাভারতের অনুশাসনপর্ব এবং স্কন্দপুরাণ থেকে উদ্ধৃত এই তিনটি সংস্কৃত শ্লোক ব্যতীত 'উদ্যোগপর্ব' গল্পটিতে বেশ কিছু ইংরেজি কবিতার অংশও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন— ১. "How elsewise flit we

Through the mind's dominion
From book to book, from
leaf to leaf at will."

২. "I strove with none
For none was worth my
Strife,
I loved Nature and next to
Nature, Art
I warmed both hands before
the fire' of life
It sinks; and I am ready,
to depart."

এইসব সংস্কৃত শ্লোক ও ইংরেজি কবিতা ছাড়াও 'উদ্যোগ পর্ব' গল্পে আরও বেশ কিছু কবিতার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন—

ক. "যাবার আগে জানি যেন
আমায় ডেকেছিলে কেন
আকাশ পানে নয়ন তুলে
শ্যামল বসুমতী।"

খ. "দিই নাই, চাই নাই, রাখিনি কিছুই
ভালোমন্দের কোন জঞ্জাল।"

গ. "মরুভূমি স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা
আপনি সুজলাবতী বারিদপ্রসাদে।"

'উদ্যোগ পর্ব' গল্পের মতই 'দেবযানী' গল্পে পদ্যের বহু ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এই গল্পের চরিত্র শিপ্রা রবীন্দ্রনাথের 'বিদায় অভিশাপ' অভিনয়ের জন্য প্রস্তুতির কালে দেবযানীর সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেছে এবং অন্তরে দেবযানীতে পরিণত হয়েছে। লেখক শিপ্রার মানসিক অবস্থা ও বাহ্যিক আচরণের ব্যাখ্যায় 'বিদায় অভিশাপ'-এর পংক্তিকে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন—

"কিন্তু শেষ রাত থেকে সে আর 'শিপ্রা' নয় সে শুধু 'দেবযানী'। কাজ করছে, কথা বলছে - আর সেইসঙ্গে মনে মনে আবৃত্তিও চলেছে—

'কতদিন এই বনে
দিক্-দিগন্তরে আষাঢ়ের নীল জটা
শ্যাম স্নিগ্ধ বরষার নবঘনঘটা
নেবেছিল, অবিরল বৃষ্টিজলধারে
কর্মহীন দিনে সঘনকল্পনাভারে
পীড়িত হৃদয়;'

সেই আষাঢ়ের জলধারা সারাদিন ধরে মনের মধ্যে ঝ'রে পড়তে লাগল শিপ্রার। একই সঙ্গে মনোভূমিতে বর্ষা আর বসন্তের আবির্ভাব হল।"

এই গল্পে শিপ্রার মানসিকতা কাব্যপাঠের সঙ্গেই পরিবর্তিত হয়েছে এবং 'বিদায় অভিশাপ' থেকে পংক্তি সমূহের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার সেই মানসিকতাকে ব্যক্ত করতেই ব্যবহৃত হয়েছে। আর এই কবিতার চরিত্রের সঙ্গে গল্পের চরিত্রের একাত্মতাই গল্পের মূল।

এ সকল গল্প ছাড়াও বেশ কিছু গল্পে নরেন্দ্রনাথ কবিতার পংক্তি ব্যবহার করেছেন। যেমন—

১. "রুই কাতলা বোয়াল শোল কই মাগুর সিঙ্গি
চুঁচড়া চাঁদা রায়াক পুঁটি টাটকিনি মলুঙ্গী।" ('যাত্রাপথ')

২. "নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ প্রবাল দিয়ে ঘেরা
শৈল চূড়ায় নীল বেঁধেছে সাগর বিহঙ্গরা
নারিকেলের শাখে শাখে
ঝোড়ো বাতাস কেবল ডাকে।" ('শ্বেত ময়ূর')

৩. "যা কিছু দিয়েছিলে ফিরিয়ে নাও তুমি
শুধু সে স্মৃতিটুকু নিও না নিও না।" ('একটি নাগরিক প্রেমের উপাখ্যান')

৪. "Take back the hope you gave - I claim
only a memory of the same." ('একটি নাগরিক প্রেমের উপাখ্যান')

৫. "যেমনি তুলেছে মুখ, চেয়েছ যেমনি,
যেমনি শুনেছ তুমি মোর কণ্ঠধ্বনি,

অমনি সর্বাঙ্গে তব কম্পিয়াছে হিয়া -

নড়িলে হীরক যথা পড়ে ঠিকরিয়া

আলোক তাহার। সেকি আমি দেখি নাই?

ধরা পড়িয়াছ বন্ধু, বন্দী তুমি তাই

মোর কাছে।" ('দেবযানী')

'উদ্যোগ পর্ব' গল্পে যেমন বহু কবিতার পংক্তি ব্যবহৃত হয়েছে তেমনি আরেকটি কাব্য বহুল গল্প 'পত্রবিলাস'। এই গল্প থেকে উদ্ধৃতি উদ্ধার করে এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব।

১. "যদিও জানি না

এ নামের মানে আছে কিনা।"

২. "নামের মান জানে পঞ্চজনে

নামের মানে জানি আপন মনে।"

৩. "মন যে বলে চিনি চিনি

যে গন্ধ বয় এই সমীরে।"

৪. "যা কিছু জীর্ণ আমার, দীর্ণ আমার জীবনহারা,

তাহারি স্তরে স্তরে পড়ুক ঝরে সুরের ধারা।

নিশিদিন এই জীবনের তৃষার পরে, ভুখের পরে।

শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে, পড়ুক ঝরে।"

সর্বজনীন বাক্য (General Statement) -এর ব্যবহার ঃ

'সংস্কারক' গল্পে নরেন্দ্রনাথ লেখেন— "সন্ধ্যার আলোয় মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রা যেন এক রহস্যের ছোঁয়া পায়। মনে মনে ভাবি এই জীবন রহস্যের কতটুকুই বা এ জন্মে জেনে আর জানিয়ে যেতে পারব।" গল্পে কথকের এই ভাবনা প্রকৃতপক্ষে লেখকের জীবন ভাবনাকেই প্রকাশ করেছে। লেখক এমনভাবেই গল্পের চরিত্রদের সংলাপে, ভাবনায় এমন কিছু সর্বজনীন বাক্য রচনা করেছেন যেখানে লেখকের স্বরন্যাস বা toneটি ধরা পড়ে। এই স্বরন্যাস ধরা পড়েছে কখনও লেখকের বর্ণনায়, কখনো চরিত্রদের প্রত্যক্ষ সংলাপে, কখনও বা চরিত্রদের ভাবনার স্তরে। যেমন—

১. "মানুষ কোন একটি দোষের সঙ্গে অভিন্ন নয়, গুণের সঙ্গেও অভিন্ন নয়, একই মানুষ দোষে-গুণে ভিন্ন ভিন্ন। জীবনের ভিন্ন ভিন্ন পর্বে এমনকি ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্তে তার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি। তবু আমরা দোষকে ক্ষমা করিনে, গুণকে গ্রহণ করি। অথচ সমগ্রভাবে গৃহীত হতে চাই।" ('মৃত্যু')

২. 'মেঘ ভাঙা রোদ জ্ঞাতি-দুর্বাক্যের মত দুঃসহ।' ('মৃত্যু')

৩. "বিদ্যা, বিত্ত, প্রণয়, প্রতিষ্ঠা কোন কিছুই শুধু আছে জানলেই থাকে না। সযত্নে সচেতন অনুশীলনে তাদের রক্ষা করতে হয়, বাড়াতে হয়।" ('মৃত্যু')

৪. 'বোবার যেমন শত্রু নেই, ঘুমন্ত মানুষেরও তেমনি সামাজিক কর্তব্য নেই।' ('একটি মৃত্যু ও আমি')

৫. 'মনের জোর জিহ্বায় যত সহজে সঞ্চারিত হয় অন্য সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গে তত সহজে হয়ে ওঠে না।' ('নাম')

৬. 'জরা মৃত্যুরও বাড়া।' ('বীতশোক')

৭. "..... সত্যিকারের কাজটাই কি সব? কথার জোর তার চেয়ে অনেক বেশী। কথা যেন অন্তরীপের মত ভবিষ্যতের মধ্যে অনেকখানি ঢুকে যায়।" ('একটি ফুলকে ঘিরে')

৯. "সময় কি সত্যিই বদলায় - না মানুষের পরিবর্তনে সময় বদলানো মনে হয়? ..... না, সময় ঠিক এক রকমই থাকে বোধ হয়। বদলায় কেবল মানুষ - মনে আর ব্যবহারে।" ('যৌথ')

১০. "কিন্তু মানুষ যে একই কথা চিরদিন বলবে তার কি মানে আছে; একেক সময় যদি তার একেক কথা মনে আসে তা সে বলবে বই কি।" ('যৌথ')

১১. 'শ্রেণী-সংগ্রামের মত স্বজন-সংগ্রামও ব্যক্তিগত জীবনে তীব্র আর মর্মঘাতী।' ('একটি নাগরিক প্রেমের উপাখ্যান')

১২. 'সব দুঃখ মানুষকে মহৎ করে না। কোন কোন আঘাত মনুষ্যত্বকে চূর্ণ করে দেয়।' ('ভিন্নপথে')

উল্লেখপঞ্জি

১. সূত্র - দিবাকর মিত্র ঃ 'অন্নদাশঙ্কর রায়ের স্মৃতিচারণ', 'প্রসঙ্গঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র', সম্পাদনা - সমীর বসু, পদক্ষেপ সাহিত্য সংসদ, কোলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০১, পৃষ্ঠা - ১২.

২. চণ্ডী লাহিড়ী ঃ 'লাজুক নরেন্দ্ররনাথ', 'প্রসঙ্গ ঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র', সম্পাদনা - সমীর বসু, পদক্ষেপ সাহিত্য সংসদ, কোলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০১, পৃষ্ঠা - ২২.

৩. মঞ্জুরী চৌধুরী ঃ 'ছোটগল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্র', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা - ১০০.

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্প থেকে যে সকল পংক্তি উদ্ধার করা হয়েছে সে সকল অভিজিৎ মিত্র সম্পাদিত ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পমালা ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কিশোর গল্প সমগ্র থেকে গৃহিত।

।। ষষ্ঠ অধ্যায় ।।

সমকালীন ছোটগল্পকার ও নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পের তুলনামূলক আলোচনা এবং বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের স্থান

১৯৪০ এর অগ্নিগর্ভকালে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাংলা সাহিত্য জগতে আবির্ভাব। ফলে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা যেমন তাঁর চেতনায় ক্রিয়াশীল তেমনি যুদ্ধ-পরবর্তী অভিঘাত সামাজিক ভাঙন, অবক্ষয়, নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষের অসহায়তা, মানবিক মূল্যবোধের বিনষ্টি প্রভৃতিও তার সংবেদনশীল মনে ছায়াপাত করেছিল গভীরভাবে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মারী মড়কের তাণ্ডব, মন্বন্তরের কালগ্রাস ও ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। নিজে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু হওয়ার কারণে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত সহায় সম্বলহীন মানুষের কঠোর জীবনসংগ্রামের সঙ্গেও তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। নিজে কলকাতায় চলে আসার পরেও পূর্ববঙ্গে (তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান) পূর্বপুরুষের ভিটেমাটিকে আঁকড়ে পড়ে থাকা মানুষের তথাকথিত Impractical মনোভাবকেও তিনি তাঁর অনেক গল্পের সঙ্গে 'পালঙ্ক' গল্পেও রূপদান করেছেন। দেশ-সমাজ-সময়ের এক অস্থিতির সময়ে তিনি আবির্ভূত হলেন, কিন্তু এই সময়ের বিদ্রোহ, বিক্ষোভ, মানবিক মূল্যবোধের বিনষ্টি, সামাজিক ক্লেদ-পঙ্কিলতাকে তিনি তাঁর সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন বা বিষয় বা আশ্রয় করলেন না। নিজের মানসিকতাকে বুঝে নিয়ে নরেন্দ্রনাথ কেবল 'ভালোবাসার গল্পই' রচনা করলেন। সমকাল তাঁর লেখায় ছায়াপাত করলো, পটভূমি রচনা করলো, কিন্তুপ্রধান চরিত্র হয়ে উঠলনা।তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য গল্পকারদের থেকে এই বিষয়ে তাঁর স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। পূর্ববাংলার শান্ত গ্রামীণ পরিবেশে শৈশবকাল অতিবাহিত করায় তাঁর মানসিকতা মানুষের স্খলন, পতন, ত্রুটি, বিচ্যুতিকে বড় ক'রে দেখবার মতন ক'রে গড়ে ওঠেনি; যদিও তিনি জানতেন — "সংসারে অনাচার-অবিচার আর অত্যাচারের অভাব নেই। প্রেমের শক্তি যেমন শক্তি, প্রয়োজন বোধে ঘৃণা বিদ্বেষের শক্তিও তেমন।"[১] কিন্তু দেখা যায় তাঁর মন এই ঘৃণা বিদ্বেষের শক্তিকে উপেক্ষা করে নিস্তরঙ্গ সৌন্দর্যময়তার মধ্যেই আত্মতৃপ্তি লাভ করেছে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিও এই সৌন্দর্যময়তার মধ্যেই মুক্তি অন্বেষণ করেছে। যেহেতু এই মানসিকতা নিয়ে তিনি সাহিত্য রচনায় অগ্রসর হয়েছেন সেইহেতু সৎসাহিত্য রচনা করতে গিয়ে মানুষের স্খলন, পতনের ছবিও তিনি অঙ্কন করেছেন কিন্তু তাতে নির্মম হতে পারেননি। পতনোন্মুখ মানুষের চিত্র অঙ্কন করেছেন কিন্তু সেই পতনে নিজেও বেদনা বোধ করেছেন; মানুষের দুর্বলতাকে দেখিয়েছেন কিন্তু মানুষ যেখানে সেই দুর্বলতাকে জয় করতে পেরেছে সেখানেই অঙ্গুলি সংকেত করেছেন অধিক পরিমাণে। 'রসাভাসে'র মত গল্প তিনি রচনা করেছেন কিন্তু ভয়াবহ সর্বনাশের মুখে দাড়িঁয়ে মানুষের মানবিকতার জাগরণ সেখানেও প্রধান হয়ে উঠেছে। সমকালীন অন্যান্য গল্পকারদের থেকে এই

বিষয়েও তাঁর পার্থক্য দেখা যায়। সময় ও সমাজের অভিঘাতকে তিনি অতিক্রম করেছেন আর এই অতিক্রম তিনি করেছেন সচেতনভাবেই, ফলে স্বতন্ত্র একটি গল্পের জগৎ নির্মিত হয়েছে যেখানে চিত্রিত হয়েছে ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা আর রূপলাভ করেছে পারিবারিক জীবনের গন্ডির মধ্যে ক্রমাগত আবর্তিত মানবমনের টানাপোড়েন। মানবচরিত্রের অন্ধকার দিকগুলিকে খুঁড়ে না তুলে এনে স্নেহ, প্রেম, দয়া, মায়া, ভালোবাসা, কর্তব্যবোধ, মমতা, সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি সদ্‌গুণ ও সুকুমার বৃত্তি প্রভৃতি দিকগুলি দেখিয়েছেন এবং ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়েও অসহায় অথচ হার না মানা মানুষের লড়াইকে তুলে ধরেছেন নরেন্দ্রনাথ। চল্লিশের দশক ও তার পরবর্তী যে ক্ষোভ-বিক্ষোভ, রাজনৈতিক সংঘাত ও সংঘর্ষের তান্ডব চলছিল তার আঁচ বাঁচিয়ে মধ্যবিত্ত মানুষের অসীম রহস্যময় মনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের কাজেই ব্যস্ত থেকেছেন তিনি। এই বিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন — "সমাজে শঠতা আছে, ক্রূরতা আছে, তা আমি জানি। হিংসা বিদ্বেষেরও অভাব নেই। কিন্তু সমাজ জীবনের এই অন্ধকার দিকের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় কম।... শান্ত মধুর ভাবই আমার রচনায় বেশি।... জীবনের পঙ্কিল অথবা ক্লেদাক্ত দিকে আমার নিজস্ব বাস্তব অভিজ্ঞতা তেমন কিছু নেই। আমার মেজাজ রোমান্টিক সৌন্দর্যপ্রিয়। তাই মহত্বই আমায় আকর্ষণ করে বেশি।"[২]

এ বিষয়ে সমালোচকের মন্তব্যও প্রাণিধানযোগ্য — "নরেন্দ্রনাথ মিত্র মূলত মধ্যবিত্ত বিবেকের ব্যবচ্ছেদ করতে উৎসাহী — কিন্তু বিবেককে বর্জন করতে আগ্রহী নন। তিনি বাস্তবিক অর্থেই 'রোম্যান্টিক সোন্দর্যপ্রিয়' এবং 'শান্ত মধুর ভাব'-এ বেশি তৃপ্তি পান — তাই মধ্যবিত্ত মানুষদের পাপ ও পদস্খলনের চিত্র আঁকার সময় নির্মম হননি, বেদনাহত হয়েই বরং তার সহমর্মী হয়েছেন। অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথ মিত্র মধ্যবিত্ত ভাঙনকে বিবেকের তাড়নায় গল্পের বিষয়ীভূত করে হৃদয়ের মানব্যে যাচাই করতে যতটা উৎসুক, সে সময়ের অন্য লেখকদের মধ্যবিত্ত কথায় ততটা দেখা যায়নি। আর এখানেই সমসময়ের লেখক ভাবনা থেকে তাঁর স্বাতন্ত্র্য, একক পথ চলা।"[৩] —এই মন্তব্য থেকে দুটি জিনিস স্পষ্ট —

এক. নরেন্দ্রনাথ মধ্যবিত্ত মানুষের রোমান্টিক চেতনার গল্প লেখক। এবং

দুই. একজন মানবিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ রচনাকার।

এখন দেখা যাক নরেন্দ্রনাথের এই বিশিষ্ট মানসিকতা ও গল্পরচনার রীতি বাংলা ছোটগল্পের জগতে কোন্ বিশিষ্ট স্থান লাভের উপযোগী। নরেন্দ্রনাথ যখন বাংলা ছোটগল্পের জগতে আর্বিভূত হন তখন যে সকল গল্পকার সৃষ্টিশীল ছিলেন তাঁদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রমুখ ছোটগল্পকারেরা তখন শুধুমাত্র যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিতই নন পূর্ণমাত্রায় ক্রিয়াশীলও বটেন। শক্তিশালী এই সকল গল্পকারের সৃষ্টিশীলতার কালে সাহিত্যজগতে আবির্ভূত হয়েও নরেন্দ্রনাথ বাংলা ছোটগল্পের

জগতে কেমনভাবে নিজের বিশিষ্ট স্থানটি নির্দিষ্ট করতে সক্ষম হলেন তা এখন আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথম অধ্যায়ে নরেন্দ্রনাথের আবির্ভাবকাল ও সাহিত্যিক হিসাবে গড়ে ওঠার সময়কালের আলোচনা প্রসঙ্গে তৎকালীন দেশ ও বিদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কিছুটা পরিচয় নেবার প্রয়াস করা হয়েছে। এখন সেই সময়কালে বাংলা সাহিত্যজগতের প্রেক্ষাপটটি দেখে নেওয়া যেতে পারে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে নরেন্দ্রনাথের সাহিত্য জগতে আর্বিভাবের অব্যবহিত পূর্বেই প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-০৯৮৮), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) প্রমুখেরা বাংলা সাহিত্য জগতে 'কল্লোলযুগ' আনয়ন করেছেন। ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্বের প্রকাশ, ফ্রয়েডের শিষ্য অ্যাডলার ও য়ুং এবং হ্যাভলক এলিস প্রমুখের দেহবাদী যৌনতা নির্ভর ব্যাখ্যা, বার্নাড শ ও ফেবিয়ানদের নব অর্থনৈতিক চিন্তা— প্রভৃতির দ্বারা 'কল্লোলযুগে'র লেখকেরা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। জীবন সম্পর্কে আশাহীনতা, শূন্যতাবোধ, বিষাদচেতনা ও অবজ্ঞাত-অপজাত মানুষের জীবনযুদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ দেহকামনার স্বীকৃতি এই লেখকদের অবলম্বন ছিল আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল রবীন্দ্রবিরোধিতা। শরৎচন্দ্রের দরদ, আবেগ ও ভাবাবেগের বন্যাকে রোধ করে প্রথম বাস্তব অভিজ্ঞতা নির্ভর আদিম গোষ্ঠীর নরনারীর প্রেম ও পারস্পরিক যৌনাকর্ষণের তীব্র জটিল রহস্যময়তাকে শিল্প নিপুণতা ও নির্মম নিরাসক্তিতে বর্ণনা করলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬)। শৈলজানন্দকে কল্লোলগোষ্ঠীর বলে চিহ্নিত করা হলেও সমালোচক বলেন — "তাঁকে কল্লোল-গোষ্ঠীর একজন বলা হয়। কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। তাঁর ছোটগল্পে বাস্তবতা নিয়ে বাড়াবাড়ি নেই, দারিদ্র্যের আস্ফালন নেই, লালসার অসংযম নেই। পাঠককে চমকে দেবার প্রয়াস নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি আসেননি। বাস্তব-অভিজ্ঞতাবিহীন বিদেশী ভাবাদর্শ প্রাণিত গল্প লিখে আসর মাৎ করার চেষ্টা তাঁর ছিল না।"[৪] শৈলজানন্দের গোত্র নির্ণয়ে অপর সমালোচক বলেন — "শৈলজানন্দের মৌল প্রকৃতি 'কল্লোল চেতনা'র থেকে আমূল পৃথক।"[৫] প্রকৃতপক্ষে 'কল্লোল পত্রিকা'য় রচনা প্রকাশিত হলেই রচনকার মন ও মানসিকতায় কল্লোল গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত হবেন তা ঠিক নয়। 'প্রবল বিরুদ্ধবাদ' ও 'বিহ্বল ভাববিলাসে'র মানদণ্ডেই শৈলজানন্দ কল্লোল গোষ্ঠী থেকে পৃথক শ্রেণিভুক্ত হয়ে পড়েন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েই তিনি কয়লাকুঠির শ্রমিক শ্রেণির মানুষের জীবন যন্ত্রণা, কামনা, বাসনা, শোষণ, বঞ্চনা ও দৈনন্দীন জীবনযাপনকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। 'কয়লাকুঠি', 'মা', 'নারীরমন', 'নারীমেধ', 'ধ্বংসপথের যাত্রী এরা' ইত্যাদি গল্পে খনি জীবনের বাস্তব চিত্র যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি শেষোক্ত গল্পে শহর কলকাতার পটভূমিতে পরিস্ফুট হয়েছে নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের শোচনীয় বিপর্যয়ের কাহিনি। শৈলজানন্দ বাংলা ছোটগল্পে এক নতুন ধারার সূচনাকারী এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের যক্ষপুরীর মানুষদের

লাঞ্ছনা ও জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তির প্রেরণা আরও বেশি জীবন সংরক্ত হয়ে দেখা দিয়েছে শৈলজানন্দের গল্পে। 'জোহানের বিহা' নামক তাঁর গল্প পাঠ করে তারাশঙ্কর গল্প লেখায় উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। (সূত্র — অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ 'কালের পুত্তলিকা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮২, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৪, পৃষ্ঠা — ১৮৪)। এ দিক থেকেও শৈলজানন্দ বিশেষ মনোযোগের দাবীদার।

কল্লোল গোষ্ঠীর প্রধান তিন লেখক হলেন যথাক্রমে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্রমিত্র ও বুদ্ধদেব বসু। 'An Acre of green grass' গ্রন্থে বুদ্ধদেব বসু বলেন, তাঁরা হুইটম্যান, রাশিয়ান লেখক ও স্ক্যান্ডিনেভিয় লেখকদের রচনা পড়তেন। এই লেখকদের রচনাই প্রাণিত করেছিল কল্লোলীয়দের। স্ক্যান্ডিনেভিয় লেখক ন্যুট হ্যামসুনের 'Pan' উপন্যাসটি ১৯৩০ সালে অচিন্ত্যকুমার অনুবাদ করেন। নরউইজান নোবেলজয়ী লেখক ন্যুট হ্যামসুনের গল্প মনোবিকলন তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল আর অচিন্ত্যকুমার হ্যামসুনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে' উপন্যাস প্রত্যক্ষভাবে হ্যামসুন প্রভাবিত।

৩১শে আশ্বিন, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অচিন্ত্যকুমারের রচনায় 'কল্পনার প্রশস্ত ক্ষেত্র' ও 'অজস্র বৈচিত্র্য' দেখে তাকে একটি পত্র লিখেছিলেন। সেইখানে তিনি লেখেন — "বুঝতে পারি সেইখানে তোমার মনের বন্ধন। সে হচ্ছে মিথুন প্রবৃত্তি।"[৬] একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় কল্লোলীয় ভাবধারায় যাবতীয় ধ্যান ধারণার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল অচিন্ত্যকুমারের মধ্যে। এ কারণেই সমালোচক বলেন — "উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ভবঘুরে জীবন যাত্রা, মিথুনাসক্তি, স্থবির ও প্রতিষ্ঠিতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, উগ্র যৌনচেতনা ও যৌবনের উদ্দাম উন্মাদনা, প্রচলিত নীতি ও মূল্যবোধের অস্বীকৃতি, আত্মবিস্তারী প্রেমচেতনা, আত্মানুসন্ধানী ব্যক্তির অস্থিরতা,ব্যর্থতা, স্বপ্ন প্রবণতা ;সবটা মিঁয়ে অচিন্ত্যকুমার।"[৭]

'দুইবার রাজা' (১৯২৭), 'যে কে সে', 'ধন্বন্তরি', 'ছুরি' প্রভৃতি গল্পে নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনসংগ্রামে পরাভবের কাহিনি, প্রতারিত প্রবঞ্চিত মানুষের করুণ আর্তি, ধনী কর্তৃক বঞ্চনা প্রভৃতি বিষয় শিল্পিত রূপলাভ করেছে। চাকরি সূত্রে অচিন্ত্যকুমার বঙ্গদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং এই ভ্রমণের কালে তিনি যে অজস্র মানবচরিত্র দেখেছেন, সেই অভিজ্ঞতার বিপুল ভাণ্ডার তিনি উজার ক'রে দিয়েছেন তাঁর গল্পের জগতে। পরবর্তী পর্যায়ে অচিন্ত্যকুমার মফঃস্বল শহর ও গ্রাম বাংলাকে তাঁর গল্পের পটভূমি হিসাবে বেছে নিয়েছেন। 'যতনবিধি' (১৯৪৪), 'সারেঙ' (১৯৪৭), 'হাড়ি মুচি ডোম' (১৯৪৮) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থে গ্রামবাংলার যে চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন সত্যিই তা তুলনারহিত। এছাড়া নরেন্দ্রনাথ মিত্র ব্যতীত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তই মুসলমান সমাজকে নিয়ে এত অধিক পরিমাণ গল্প রচনা করেছেন। মুসলমান সমাজকে নিয়ে রচিত গল্পে স্বাভাবিক ভাবেই তিনি ব্যবহার করেছেন বহু আরবী

ফার্সী শব্দ। তিনি গ্রামজীবন ও গ্রামের মানুষকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন আর তাঁর সেই অভিজ্ঞতাকে তিনি রূপদান করেছেন তাঁর ছোট গল্পে। অচিন্ত্যকুমারের গল্পের চরিত্ররা অধিকাংশই উঠে এসেছে নিম্নবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজ থেকে, এই দিক থেকেও নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অচিন্ত্যকুমার ও নরেন্দ্রনাথ উভয়েরই পছন্দের ক্ষেত্র ছিল কবিতার জগৎ ফলে উভয়েরই রচনায় একটি কাব্যময়তার প্রভাব যেন পরিলক্ষিত হয়। এই সাদৃশ্য ব্যতীত অবশ্য নরেন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে অচিন্ত্যকুমারের রচনার বৈসাদৃশ্যই অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

বুদ্ধদেব বসুও অচিন্ত্যকুমারের মতই কবি। কাব্যময়তা উভয়েরই রচনার অন্যতম প্রধান লক্ষণ। বুদ্ধদেব বসুর ছোট গল্পের জগতে আর্বিভাব 'রজনী হল উতলা' গল্পটির মধ্য দিয়ে। 'কল্লোল' পত্রিকায় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় গল্পটি প্রকাশিত। অচিন্ত্যকুমারের বাংলা সাহিত্য জগতে আর্বিভাব 'কল্লোল' পত্রিকাকে অবলম্বন করে হলেও বুদ্ধদেব বসুর অবলম্বন ছিল 'প্রগতি' প্রত্রিকা।

'অভিনয়, অভিনয় নয়' (১৯৩০), 'রেখাচিত্র' (১৯৩১), 'এরা আর ওরা' (১৯৩২), 'অদৃশ্য-শত্রু' (১৯৩৩), 'মিসেস গুপ্ত' (১৯৩৪), 'প্রেমের বিচিত্র গতি' (১৯৩৪), 'শ্বেতপত্র' (১৯৩৪), 'অসামান্য মেয়ে' (১৯৩৫), 'ঘরেতে ভ্রমর এলো' (১৯৩৫) প্রভৃতি গল্প সংকলনে গ্রথিত গল্পগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক বলেন — "তাঁর ছোট গল্পে বিষয়বস্তু ও রচনারীতির বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু তাঁর গল্পের মূল উপাদান কী, এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, ভালোবাসা;— জীবনের প্রতি, মানুষের প্রতি, প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা-ই তীব্র ও প্রবলভাবে উপস্থিত। এই ভালোবাসার অঙ্গীকার তাঁর ছোটগল্পের জগৎকে ভরে রেখেছে।"[৮] সমালোচকের এই বক্তব্যের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের নিজের বক্তব্যকে মিলিয়ে নিয়ে পড়লে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের একটি সাদৃশ্যের স্থান খুঁজে পাওয়া যায়। নরেন্দ্রনাথ তাঁর 'গল্প লেখার গল্প' — প্রবন্ধের শেষে বলেন — "নিজের স্বভাবকে বুঝে নিয়ে, নিজের প্রবৃত্তি আর প্রবণতাকে স্বীকার করে আমি সারা জীবন শুধু ভালোবাসার গল্পই লিখেছি। সে ভালোবাসা হয়তো সঙ্কীর্ণ অর্থে ভালোবাসা, সীমিত অর্থে ভালোবাসা । তবু তা ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু নয়।"[৯] এই ভালোবাসার গল্প লেখার বিষয়টি যেন বুদ্ধদেব বসু ও নরেন্দ্রনাথের ছোটগল্পের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। উভয়ের রচনাতেই জীবনের জটিল-কুটিল রূপ, মধ্যবিত্ত মানুষের ক্ষোভ, বিক্ষোভ, ঈর্ষা, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতির রূপও ফুটে উঠেছে, কিন্তু সর্ব ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়নি। বরং জীবনসংগ্রামের কঠোরতা, জীবন ও জীবিকার লড়াই তাদের গল্পে স্থান লাভ করলেও স্বপ্ন, সৌন্দর্য, আশা ও ভালোবাসাই মানুষের প্রধান অবলম্বন বলে তাঁরা গ্রহণ করেছেন। বুদ্ধদেব বসু মুখ্যত নাগরিক লেখক। আলোচকের মতে — "বুদ্ধদেব সর্বার্থে ও সদর্থে নাগরিক।"[১০] প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর ছোটগল্পের পটভূমি হিসেবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেছে নিয়েছেন কলকাতা অথবা ঢাকা নগরীকে। নগরজীবনকেন্দ্রিক তাঁর রচনার সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের

রচনারও সাদৃশ্য আছে কারণ, নরেন্দ্রনাথেরও প্রথম দিকের গল্পগুলি ব্যতীত অধিকাংশ গল্পের অবলম্বন কলকাতার নগর জীবন। তবে বুদ্ধদেব বসুর চিত্রিত চরিত্রদের মধ্যে যে রোমান্টিক ভাবপ্রবণতা দেখা যায় নরেন্দ্রনাথের গল্পে যেন সেই চরিত্রের পরিচয় কম, এছাড়া ভাষারীতির ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসু যেমন বৈদগ্ধ্যে পরিপূর্ণ কাব্যিক ভাষা প্রয়োগ করেছেন, নরেন্দ্রনাথের ভাষা প্রয়োগ সেখানে সহজ সরলতায় পরিপূর্ণ। কাব্যময়তা নরেন্দ্রনাথের ভাষায়ও আছে, কিন্তু কাব্যময়তাই সেই ভাষার একমাত্র লক্ষণ নয়।

কল্লোলগোষ্ঠীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র কবি হিসেবে সুবিখ্যাত হলেও তাঁর ছোটগল্পগুলিও শ্রেষ্ঠত্বের সীমালগ্ন। তাঁর 'পঞ্চশর' (১৩৩৬), 'বেনামী বন্দর' (১৩৩৭), 'পুতুল ও প্রতিমা' (১৩৩৯), 'মৃত্তিকা' (১৯৩২),'অফুরন্ত '(১৩৪২), 'মহানগর' (১৯৪৩) প্রভৃতি গল্পসঙ্কলন স্বাধীনতার পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল এবং তাঁকে একজন অসামান্য গল্পকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা দান করেছিল। 'শুধু কেরাণী' গল্পটির মধ্য দিয়েই তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। মৃত্তিকা ও জীবনের অত্যন্ত কাছাকাছি তাঁর গল্পগুলির প্রধান বৈশিষ্ট সমাজ বাস্তবতা এবং জীবনের জটিলতার চিত্রণ এবং বিশ্লেষণ। শিল্পরীতির অসংযম ও ভাবাবেগের প্রাবল্য তাঁর গল্পে নেই বরং তাঁর গল্পগুলি বাংলা ছোটগল্প শিল্পের উৎকৃষ্ট শিল্পরীতির নিদর্শন রূপে পরিগণিত হতে পারে। গল্পের উপস্থাপনা, বিন্যাস, সমাপ্তি সব মিলিয়ে এক অখণ্ড শিল্পকৃতি তাঁর গল্প — এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে তাঁর অসামান্য ভাষারীতি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প সম্পর্কে আলোচক বলেন— "প্রেমেন্দ্র মিত্র আবেগের শিল্পী নন, মননের শিল্পী। জীবনের নিছক রূপকার নন, মর্মভেদী বিশ্লেষক। তিনি বস্তুনিষ্ঠ শিল্পী। জীবনের ভাঙন ও অবক্ষয়ের স্বরূপ উন্মোচনে তাঁর লেখনী অকম্পিত, আবার জীবনের জটিলতার বিশ্লেষণে নিপুণ ব্যবচ্ছেদক।"[১১] প্রকৃতপক্ষে জীবনের দৈন্য, অসহায়তা, অপমান, বঞ্চনা, দুঃখ, বিকারগ্রস্ততা প্রভৃতিকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং অসামান্য শিল্প সৌকর্যে, নিপীড়িত মানুষের প্রতি অসীম সমবেদনায় সেগুলিকে প্রকাশ করেছেন। মানবমনের অন্ধকার জটিল কুটিল পথকে তিনি যেমনভাবে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করেছেন বাংলা ছোটগল্পের জগতে তা তুলনারহিত। বাংলা সাহিত্যে গূঢ় বাস্তবতা আনয়ণে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন বলে সরোজ মোহন মিত্র মনে করেন। তিনি লেখেন — "১৯২৩ এবং ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে শুধু কেরাণী, গোপনচারিণী ছোটগল্প এবং পাঁক উপন্যাস নিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে গূঢ়তর বাস্তবতা অন্বেষণের স্পৃহা ও তৎপরতার একটি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।"[১২]

কল্লোলগোষ্ঠীর এই প্রধান তিন রচনাকারদের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কল্লোলের লেখকেরা নরেন্দ্রনাথের আবির্ভাবের ঠিক পূর্ব সময়ে বাংলা ছোটগল্পের জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে আবির্ভূত হলেও তাঁদের হাত ধরে নরেন্দ্রনাথের সাহিত্যজগত তৈরি হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র নির্দেশিত ছোটগল্পের যে বহমান ধারা তাতে কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকেরা তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিলেন,নতুন উদ্দীপনার

সঞ্চার করেছিলেন। তীব্র রোম্যান্টিকতা ও রবীন্দ্রবিরোধিতা ছিল তাদের মূলধন। প্রচলিত ন্যায়নীতি, ঈশ্বর বিশ্বাস, সাহিত্যের সত্য-শিব ও সুন্দরের ধারণাকে সুতীব্রভাবে অস্বীকার করে সমাজের নীচুতলার অবজ্ঞাত, অবহেলিত, মানুষকে শিল্পের অঙিনাতে তুলে আনাই ছিল তাঁদের সাধনা। নরনারীর দেহ-সম্পর্ক বর্ণনায়, যৌনতার উন্মোচনে, মানব চরিত্রের অন্ধকারময় দিকগুলিকে অনাবৃত রূপে উন্মোচন ছিল তাঁদের ব্রত। কল্লোলগোষ্ঠীর এই মানসিকতার সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের মানসিকতার সুবিশাল পার্থক্য বর্তমান আর তার ফলেই নরেন্দ্রনাথের সাহিত্যকৃতী কল্লোল-প্রভাবিত নয়, যদিও অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব বসু বা প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনাধারা বা শৈলীর সঙ্গে তাঁর কিছু কিছু সাদৃশ্য বর্তমান। তবে সব মিলিয়ে তাঁদের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের অমিলই বেশি আর এর জন্য দায়ী নরেন্দ্রনাথের মানসিকতা, জীবনচেতনা ও প্রকৃতিচেতনার পার্থক্য, যা বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তাঁর স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় সহায়তা করেছে।

নরেন্দ্রনাথের অর্বিভাবের সময় বাংলা ছোটগল্পের জগৎ তথা সাহিত্য জগতে পূর্ণরূপে সৃষ্টিশীল ছিলেন তিন বন্দ্যোপাধ্যায় — তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণ এই দুজন প্রায় একই সময়ে সাহিত্যজগতে আর্বিভূত হয়েছিলেন এবং এই দুজনই শরৎ-পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের প্রধান ও প্রতিনিধি স্থানীয় লেখক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

তারাশঙ্করের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'রসকলি' (ফাল্গুন ১৩৪৪, ১৯২৮) 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, শুধু তাই নয় তার পরবর্তী গল্প 'হারানো সুর' ও প্রকাশিত হয়েছিল 'কল্লোল' পত্রিকায় কিন্তু তাঁর শিল্পি সত্তার সঙ্গে কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের কোন সাদৃশ্য নেই। বিভূতিভূষণ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। কল্লোলগোষ্ঠীর তরুণ, শিক্ষিত, পাশ্চাত্যপ্রভাবিত লেখকদের সঙ্গে এ দুজনের মিল নেই, তাদের রচনার নৈরাশ্য যন্ত্রণা ও নঞর্থক মানসিকতার থেকেও এ দুজনের অবস্থান দূরবর্তী।

বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী' পত্রিকার মাঘ সংখায়, ১৩২৮ বঙ্গাব্দে। 'কল্লোল' প্রকাশিত হবার দুবছর পূর্বেই তিনি সাহিত্যজগতে আবির্ভূত হন এবং কল্লোলের উত্তাল সময়ের সঙ্গেই তাঁর সৃষ্টিকাল সমান্তরালভাবে চললেও কল্লোলগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর কোনো দূরগত সাদৃশ্যও খুঁজে পাওয়া যায়না। বিভূতিভূষণ নাগরিক লেখক নন, তার অবলম্বনের বিষয় গ্রামজীবন। বিভূতিভূষণ গ্রামীণ, গার্হস্থজীবনের রূপকার; আস্তিক এবং চিরন্তন মানবধর্মে বিশ্বাসী। সমালোচকের ভাষায়— "পল্লীগ্রামের সাধারণ জীবনের সাধারণ মানুষ নিয়ে তাঁর কারবার। এরা অতিপরিচিত, খুবই বাস্তব। একান্ত পরিচিত বাস্তব বিষয় ও চরিত্র প্রকৃতি-সংস্পর্শে বিভূতিভূষণের গল্পে এক অসামান্যতা পেয়েছে।"[১৩]

বিভূতিভূষণ অনুভূতিপ্রবণ গল্পলেখক। রোম্যান্টিক কল্পনার সঙ্গে এই অনুভূতি প্রবণতার যোগে

তিনি তাঁর রচনার মধ্যে যে বিশিষ্ট ভাবের জগৎ সৃষ্টি করেছেন তা বাংলা কেন বিশ্বসাহিত্যেই তুলনারহিত। এ বিষয়ে তাঁর কোনো পূর্বসূরী নেই এবং যথার্থ অর্থে নেই কোনো উত্তরসূরীও। তাঁর অবলম্বন পল্লীজীবন কিন্তু এই পল্লীজীবন শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত পল্লীজীবন নয়, যেখানে শরৎচন্দ্র তুলে আনছেন পল্লীগ্রামের বস্তুজীবনের নানান সমস্যার বাস্তব চিত্র। কল্লোলগোষ্ঠীও পল্লীজীবনের কথা চিত্রিত করেছে, পল্লীগ্রামের সহায় সম্বলহীন অসহায় দরিদ্র মানুষদের জীবনকথাকে, তাদের অভাব অভিযোগ, দুঃখবোধ, অসহায়তা মমত্বের সঙ্গে বাস্তবগ্রাহ্য রূপেই তাঁদের রচিত গল্পে স্থান লাভ করেছে। কিন্তু বিভূতিভূষণের রচনায় পল্লীগ্রামের বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যানুভূতি এবং ঈশ্বরানুভূতির আবেশ। আলোচকের লেখায় বিভূতিভূষণের প্রকৃত স্বরূপটি প্রকাশিত হয়েছে — "বিভূতিভূষণ জাত-রোমান্টিকের মতোই গ্রামবাংলাকে দেখেছেন প্রকৃতি-ভাবুকতায়। ... বিভূতিভূষণের কাছে প্রকৃতি দূর থেকে দেখা কোন অস্তিত্ব নয়, বিলাসের কাম্যবস্তু নয়, প্রকৃতি তাঁর অস্তিত্বের প্রেরণা, মাটি, মাটির সজীব প্রাণ স্বভাব। প্রকৃতিই তাঁর রক্ত-মাংস-মজ্জা-প্রাণ। আর এই প্রকৃতি নগর-জীবনের কৃত্রিমতায় ধূসর নয়, গ্রাম জীবনের সহজ, স্বতস্ফূর্ত সজীবতায় চিরসবুজ।"[১৪]

নরেন্দ্রনাথের প্রথম গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হবার পূর্বেই বিভূতিভূষণের 'মেঘমল্লার' (১৯৩২), 'মৌরীফুল' (১৯৩২), 'যাত্রাবদল' (১৯৩৪), 'জন্ম ও মৃত্যু' (১৯৩৮), 'কিন্নর দল'(১৯৩৮), 'বেনীগির ফুলবাড়ি' (১৯৪১), প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে গেছে। নরেন্দ্রনাথের প্রথম দিকের রচনা পল্লীগ্রামের পটভূমিকায় রচিত হয়েছে তবে বিভূতিভূষণের বিশিষ্ট প্রকৃতিতন্ময়তা নরেন্দ্রনাথের রচনায় অনুপস্থিত। এই প্রসঙ্গে একটি তথ্য উপস্থাপন করা যায় যে নরেন্দ্রনাথের সুবিশাল গল্পের ভাণ্ডারে 'আয়না' গল্পটি ছাড়া কোনো ভূতের গল্প বা অতিপ্রাকৃত গল্প নেই, অপরদিকে বিভূতিভূষণ সারা জীবন ধরেই কিছু না কিছু অতিপ্রাকৃত রসের গল্প লিখেছেন। উদাহরণ স্বরূপ 'বউচণ্ডীর মাঠ', 'অভিশপ্ত', 'খুঁটি দেবতা', 'তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প' প্রভৃতি অলৌকিক রসাশ্রিত গল্পের নাম করা যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে তারাশঙ্করের প্রথম গল্প 'রসকলি' প্রকাশিত হয়েছিল 'কল্লোল' পত্রিকায়। তবে তিনি কল্লোল চেতনার লেখক নন। তিনি তাঁর গল্পরচনার প্রেরণা হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়-এর রচনার কথা স্বীকার করেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পোনাঘাট পেরিয়ে' এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের একটি গল্প 'কালিকলম' পত্রিকায় পাঠ করে তিনি উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন।(সূত্র— তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'আমার সাহিত্যজীবন')। সুকুমার সেন তারাশঙ্করকে শৈলজানন্দের সহযাত্রী বলে উল্লেখ করেছেন । তাঁর ভাষায় — "তারাশঙ্করকে শৈলজানন্দের সহযাত্রী বলিতে পারি। শৈলজানন্দ কয়লাকুঠির সাঁওতাল জীবন লইয়া সীমাবদ্ধ অঞ্চলের কাহিনী রচনার পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তারাশঙ্কর লইলেন তাঁহার দেশ দক্ষিণপূর্ব বীরভূমের সাধারণ লোকের জীবন — পুরানো গ্রামের জমিদার - ঘর

হইতে নদীচরের মাল-বেদে পাড়া পর্যন্ত।"[১৫] সমালোচকের এর একথা সত্য বলে প্রমাণিত হয় যখন দেখি একটি নির্দিষ্ট এলাকা বা ভৌগোলিক সীমার মধ্যে নিজের গল্পের জগৎকে তারাশঙ্কর সীমাবদ্ধ রাখেন। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তারাশঙ্করের গল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য সীমিত নয় বরং রাঢ়বঙ্গ সম্বন্ধে তাঁর অশেষ ও অন্তহীন অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারের কারণে তা বিচিত্র পথগামী। নিজের হিমালয়সদৃশ অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার নিয়ে তিনি যেমন রূপদান করেছেন ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্রের ঐতিহ্য ধরে রাখবার লড়াইকে তেমনি তুলে এনেছেন বিভিন্ন ও বিচিত্র বৃত্তিধারী নিম্নবিত্ত অন্ত্যজ মানুষের বিচিত্র জীবনকে—তাদের প্রেম-ঈর্ষা, আদিমতা,যৌনতাময় 'অঙের খেলা' কে। তিনি নিজে তাঁর সাহিত্যকর্মের বিষয় সম্পর্কে বলেছেন যে তাঁর রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে বিলীয়মান জমিদার শ্রেণি, এছাড়া বেদে, পটুয়া, মালাকার, লাঠিয়াল, চৌকিদার, ডাকঘরকরা প্রভৃতি সমাজের নিম্নবিত্ত শ্রেণি চরিত্রের কথা। এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সেই সব মানুষ যারা নিজেদের বিচিত্র পেশার কারণে সমাজে 'স্বতন্ত্র ও অভিনব' হয়ে ওঠে। তাঁর 'রায়বাড়ি', 'জলসাঘর', 'সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার', 'রাজপুত্র', 'ময়দানব' প্রভৃতি গল্পে একদিকে যেমন ফুটে উঠেছে বিলীয়মান জমিদার শ্রেণির দম্ভ, আভিজাত্য, অহংকার ও প্রাচীন হারানো ঐতিহ্যের জন্য গর্ব তেমনি প্রকাশিত হয়েছে মহিমাশূন্য বলহীন, শক্তিহীন, বিত্তহীন মানুষের হাহাকার ও দীর্ঘশ্বাস। অপরদিকে তাঁর 'ডাইনি', 'বেদেনী', 'নারী ও নাগিনী', 'তারিণী মাঝি', 'ডাক হরকরা' প্রভৃতি গল্পে প্রকাশিত হয়েছে আদিমতাধর্মী জীবনের পরিচয়, অদ্ভুত জৈব-তৃষ্ণা ও আসক্তি এবং জৈব প্রবৃত্তির নগ্ন প্রকাশ।

'কল্লোল' পত্রিকায় প্রথম গল্প প্রকাশিত হলেও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কল্লোলগোষ্ঠীর নন —এ কথা যেমন তিনি নিজে বলেছেন ('আমার সাহিত্যজীবন') তেমনি 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তও স্বীকার করেছেন। তিনি 'কল্লোল' নন একথা সত্য হলেও বিষয়বস্তু ও ঘটনাবিন্যাসের ক্ষেত্রে অনেকক্ষেত্রেই তিনি কল্লোলগোষ্ঠীর মতোই অখ্যাত-অবজ্ঞাত মানুষের অনাবৃত আদিমতাকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে 'বেদেনী','মেলা', 'যাদুকরী' প্রভৃতি গল্পের কথা উল্লেখ করা যায়। অবশ্য এই সকল গল্পে আদিমতার অনাবৃত বর্ণনা আছে কিন্তু তা কল্লোল শ্রেণির নয়, এ বক্তব্যের সমর্থনে সমালোচকের উক্তিকে উদ্ধার করা যেতে পারে । তারাশঙ্করের 'মেলা' গল্পে পতিতাপল্লীর অনাবৃত বর্ণনা সম্পর্কে সমালোচক ভূদেব চৌধুরী লেখেন — "এই নিরাবরণ বর্ণনার কোথাও 'বিদ্রোহের' চোখ্ ঝলসানো উত্তপ্ত দীপ্তি , কিংবা আত্মগ্লানির অবসাদ-জ্বালা বিন্দুমাত্রও উপস্থিত নেই। কারণ নৈর্ব্যক্তিক ঋজু ভঙ্গিতে শিল্পী যে অনাড়ম্বর তথ্য বর্ণনা করতে পেরেছেন, তার মূলে আছে 'কল্যাণ-স্নিগ্ধ পরিণাম' অঙ্কনের সুদৃঢ় প্রত্যয়।"[১৬] এই কল্যাণ-স্নিগ্ধ পরিণাম অঙ্কনের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেই কল্লোলগোষ্ঠী অপেক্ষা তারাশঙ্করের স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত ও স্বীকৃত।

তারাশঙ্করের গল্পের বিষয়গত দিক থেকে যদি প্রকরণগত দিকের প্রতি দৃষ্টি ফেরানো যায় তবে

দেখা যায় তাঁর গল্পগুলি অনেকাংশেই দীর্ঘবিন্যস্ত ও বিবৃতিধর্মী। সচেতন শিল্পভাবনা ও সূক্ষ্ম পরিমণ্ডলের অভাব যেন লক্ষ করা যায় তাঁর গল্পে। বিবৃতিধর্মী গল্পগুলি যেন আঙ্গিকগত দিক থেকে tale-এর পর্যায় ভুক্ত, তবে তাতে নাটকীয়তার অভাব নেই। সমকালীন গল্প লেখক বুদ্ধদেব বসু বা প্রেমেন্দ্র মিত্রের অসাধারণ শিল্প সৌকর্য তারাশঙ্করের রচনায় অনুপস্থিত। এই বিষয়টি তাঁর শিল্পভাবনার সীমাবদ্ধতাকেই সূচিত করে কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনদর্শন দিয়ে তিনি জীবন ও জগতকে দেখেছেন তাকেই তিনি যথার্থ জীবনরসিকের মত তুলে ধরেছেন তাঁর গল্পে। তাই তিনি আর্টিষ্ট নন বরং যে জীবনরস অফুরান ও অপরাজেয়— তারই যথার্থ ও বলিষ্ঠ শিল্পি।

তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনায় এবার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকৃতীর কিছুটা পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) বাংলা ছোটগল্পজগতে আর্বিভাব 'অতসী মামী' গল্পটি রচনার মধ্য দিয়ে। 'অতসী মামী' ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে পৌষ সংখ্যার 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। 'কল্লোল' পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়নি, তিনি কল্লোলগোষ্ঠীর সঙ্গে সগোত্রও নন কিন্তু তবুও তাঁর গোত্র নির্ণয়ে 'কল্লোলযুগ' গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার তাঁর সম্পর্কে বলেন — "আসলে সে কল্লোলেরই কুলবর্ধন।" বুদ্ধদেব বসুও তাঁর 'An Acre of green grass' গ্রন্থে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাগত কল্লোলীয় বা 'belated kallolean' বলে অভিহিত করেছেন। এই সব আখ্যা সত্ত্বেও বলতে হয় মানিক বন্দোপাধ্যায় কল্লোলের ছিলেন না, শুধু তাই নয় কল্লোলের মাত্রাতিরিক্ত ফেনিল উন্মাদনা ও আবেগসর্বস্ব উচ্ছ্বাসকে তিনি একটু বিতৃষ্ণার চোখেই দেখতেন। কল্লোলের লেখকদের ভাষা ও ভঙ্গির তীক্ষ্ণতা ও নতুনত্ব, নতুন পরিবেশ ও চরিত্রকে আনয়ন করা এবং নরনারীর রোমান্টিক সম্পর্ককে বাস্তব গ্রাহ্য করে তোলার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টাতে তিনি উল্লাসবোধ করলেও তাঁদের 'হালকা নোংরা রোমান্টিক ন্যাকামি' ('সাহিত্য করার আগে' ঃ 'লেখকের কথা') তাঁর মনে বিতৃষ্ণার জন্ম দিয়েছিল। তবে বাস্তবের রূঢ় নির্মম কঠিন চিত্রাঙ্কন তিনি করেছেন এবং তার পরিচয় আছে 'প্রগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ' প্রভৃতি গল্পে। যদিও তাঁর প্রথম রচনা 'অতসীমামী' একটি 'রোমান্সঠাসা অবাস্তব কাহিনি' কিন্তু এই রোমান্স মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধারণ ধর্ম নয় বরং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকাল ও যুগোপরবর্তী জনজীবনের শোভনতা, নীতিবোধ বিবিক্ত জীবনসংগ্রামকেই তিনি তাঁর অধিকাংশ গল্পে অসামান্য দক্ষতায় তুলে ধরেছেন। 'দুঃশাসনীয়', 'যাকে ঘুষ দিতে হয়', 'সাড়ে সাত সের চাল' প্রভৃতি গল্পগুলির কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার দুটি সুস্পষ্ট পর্ব পরিলক্ষিত হয়। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মার্কসবাদে দীক্ষার পর তাঁর রচনায় মার্কসবাদ থেকে প্রাপ্ত গভীর সমাজচেতনা যুক্ত হয়েছে। এর পূর্বে তাঁর রচনায় প্রকাশিত হয়েছে জটিল মনস্তত্ব ও যৌনতানির্ভর গল্প যা অসামান্য

বৈজ্ঞানিক যুক্তি-চিন্তা ও মননে সমৃদ্ধ এবং নিরাসক্ত দৃষ্টিতে উজ্জ্বল। মার্কসবাদে দীক্ষার পর তাঁর রচনায় দেখা গেল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, কালোবাজারি এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতাময় পরিবেশে মানুষের সুস্থ জীবন উপভোগের বাসনা ও সংগ্রামকে তিনি এই সময় তাঁর ছোটগল্পে রূপদান করেছেন। সংগ্রাম ও প্রতিবাদী পটভূমিকায় রচিত গল্পগুলির মধ্যে 'সাড়ে সাত সের চাল', 'শিল্পী', 'হারানের নাতজামাই', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়।

নরেন্দ্রনাথের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অসমতল' (১৯৪৫খ্রিস্টাব্দ,১৩৫৩ বঙ্গাব্দ) প্রকাশের পূর্বেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অতসীমামী'(১৯৩৫), 'প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭)', 'মিহি ও মোটা কাহিনী' (১৯৩৮)', 'সরীসৃপ(১৯৩৯)','বৌ'(১৯৪৩)'সমুদ্রের স্বাদ'(১৯৪৩), 'ভেজাল'(১৯৪৪), 'হলুদপোড়া'(১৯৪৫) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়ে গেছে। যদিও একথা সত্য যে, শক্তিশালী লেখক কেবল পরবর্তী লেখকদের নয় সমসাময়িক লেখকদেরও প্রভাবিত করতে সক্ষম, কিন্তু তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার প্রভাব নরেন্দ্রনাথের রচনায় বিশেষ কিছুই খুঁজে পাওয়া যায়না। ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব ও মানবমনের অন্তর্গূঢ় জটিলতায় বিশ্বাস স্থাপনকারী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃতপক্ষে জগদীশ গুপ্তের সমগোত্রীয়। যদিও উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও যথেষ্ট তথাপি সাদৃশ্যও কম নেই। উভয়ের গল্পেই মানুষের ক্রূরতা, হিংস্রতা ও পাশবিকতা অত্যন্ত নগ্ন ভাবে প্রকাশিত। সমালোচকও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জগদীশ গুপ্তকে সমগোত্রীয় রূপে চিহ্নিত করে তাদের গোত্র নির্ণয়ে বলেন — "অন্ধকার জীবন-বৃত্তের রূপকার, কূটৈষণা ও অন্তর্গূঢ় জটিলতার নিরাসক্ত শিল্পী, জগৎ ও জীবন ব্যাপ্ত 'শয়তানি শক্তি'র চিত্রকর..."[১৭] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জগদীশ গুপ্তের মধ্যে এরূপ সাদৃশ্য থাকলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে সংশয়, সন্দেহ, হতাশা, ব্যর্থতা ও অসহয়তাবোধ থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টা আছে কিন্তু জগদীশ গুপ্ত একান্তই নেতিবাদী, প্রবলভাবে এক অন্ধ নিয়তির প্রভাবান্বিত হতাশাময় জগতের ও জীবনের চিত্র অঙ্কনে পারঙ্গম। এই কারণে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন — "জগদীশ গুপ্ত মানবজীবনের শুভ পরিণামে আস্থা স্থাপন করেননি। মানুষের জীবনব্যাপী সকল শুভ প্রয়াস শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায় বলে তার বিশ্বাস। আর এই ব্যর্থতার অন্তরালে তিনি অনুভব করেছেন এক অন্ধ নির্মম শক্তিকে।"[১৮] পূর্বেই বলা হয়েছে জগদীশ গুপ্ত বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বিশিষ্ট রচনাভঙ্গি দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হননি নরেন্দ্রনাথ মিত্র। যদিও সরোজমোহন মিত্র লেখেন — "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রাগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ', 'মহাকালের জটার জট', 'রাঘব মালাকার', 'উপায়', 'কালোবাজারে প্রেমের দর' প্রভৃতি একের পর এক গল্পে আমাদের চেতনা এবং অনুভবকেই সমূলে প্রচণ্ড নাড়া দিলেন। তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সমাজের বহু নগ্ন বাস্তবতা, নির্মম জীবনবোধ, শূন্যগর্ভ আভিজাত্য ও বিশ্বাস এমনভাবে ধরা পড়ল যাতে জীবনকে দেখার দৃষ্টিই পরিবর্তিত হয়ে গেল। এমন নির্মোহ অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সমাজ বাস্তবকে তাঁর পূর্বে আর

কেউ প্রত্যক্ষ করেননি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজ, পরিবার, প্রেম, ধর্ম, ভক্তি, বিশ্বাস, সংস্কার, সমস্ত কিছুকে দেখবার প্রকৃতিই পরিবর্তিত হয়ে গেল। মানিকের 'কেন' রোগ যেন সকলকে পেয়ে বসল। স্বাভাবিক ভাবে চল্লিশের দশকের গল্প লেখকদের উপর মানিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ছিল অপরিসীম।"[১৯] নরেন্দ্রনাথেরও আর্বিভাব চল্লিশের দশকে এবং তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপরিসীম প্রভাব থেকে বহুলাংশে মুক্ত। মনে হয় তাঁর সময়ের অন্যান্য গল্পকারদের থেকে নরেন্দ্রনাথ যে বিশিষ্ট তা প্রমাণে আলোচকের উপরোক্ত বক্তব্যটিকেও পরোক্ষ ভাবে কাজে লাগানো যায়।

বস্তুত যে বিক্ষুব্ধ জীবন জিজ্ঞাসা তিরিশের দশকে জগদীশ গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখদের মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল ও তাঁদের রচনায় প্রাধান্য লাভ করেছিল, সেই বিক্ষুব্ধ জীবনজিজ্ঞাসা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় আরও তীব্র ও ভয়াবহ আকার লাভ করেছিল। সামাজিক, আর্থিক ও মানসিক প্রকৃতির পরিবর্তন, মূল্যবোধের ভাঙন প্রভৃতি মানবজীবনে এক নগ্ন বিকারের জন্ম দিয়েছিল কিন্তু আশ্চর্যভাবে নরেন্দ্রনাথ এই সময়ে সাহিত্য রচনা করলেও এই বিক্ষুব্ধ সময়ের প্রভাব ও এই সময়ের অন্যান্য রচনাকারদের প্রভাব তাঁর রচনায় খুবই কম। নরেন্দ্রনাথ নিজেও এই বিষয়ে সচেতন — "এই মুহূর্তে পৃথিবীতে ঘটনার স্রোত বয়ে চলেছে। যুদ্ধ, হত্যা, কত দ্রুত রাজনৈতিক পরিবর্তন। সব খবরের কাগজে পড়ে যাই বড় বড় ছাপার অক্ষরে, কিন্তু মনে কোন ছাপ পড়ে না। সে সব দূরবর্তী দেশের কথা, চোখের আড়ালে যেখানে, ঘটনা তরঙ্গায়িত হয়ে চলেছে তার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু আমার চোখের সামনে, আমার চারপাশেও তো কত ছোট ছোট ঘটনার ঢেউ উঠেছে। সে সম্বন্ধেও তো কোন সচেতনতা নেই।"[২০]

এইভাবে দেখা যায় নরেন্দ্রনাথের রচনায় তাঁর পূর্বসূরীদের প্রভাব অত্যন্ত স্বল্প বা অনেকক্ষেত্রে নেই। বাংলা ছোট গল্পের প্রাঙ্গনে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের স্থান নির্ধারণ করতে গিয়ে এই অধ্যায়ে ইতিপূর্বে তাঁর অতি নিকটবর্তী পূর্বসূরীদের কিছু পরিচয় নেবার চেষ্টা করা হয়েছে। এখন নরেন্দ্রনাথের একান্ত সমসাময়িক কয়েকজন সাহিত্যসঙ্গীর পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। নরেন্দ্রনাথের একান্ত সমসাময়িক গল্পকারদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮৩), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) এবং সন্তোষ কুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫)।

পূর্বে উল্লেখিত লেখকদের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জগদীশ গুপ্তের মানসিকতা ও রচনাভঙ্গির সঙ্গে সুবোধ ঘোষের কিছুটা সাদৃশ্য দেখা যায়। এই তিন কথাসাহিত্যিকের সাদৃশ্য দেখাতে গিয়ে আলোচক বলেন — ".... জগদীশ, মানিক ও সুবোধ — তিন কথাসাহিত্যিকই নিরাসক্ত দৃষ্টিতে, পরিবেশ ও বিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন থেকে জীবনের জটিলতা ও রহস্যময়তার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। চরিত্রের প্রতি ছিলেন

পক্ষপাতশূন্য এবং আবেগ বিষয়ে ছিলেন নির্বিকার।"[২১] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুবোধ ঘোষের এই সাদৃশ্যের কথা স্মরণে রেখেও বলা যায় জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট আশাবাদ এবং গান্ধীবাদ ও সনাতন ভারতীয়ত্বে আস্থার দিক থেকে সুবোধ ঘোষ ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে অনেক দূরবর্তী লেখক। প্রকৃত পক্ষে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবোধ ঘোষ উভয়েই ছিলেন চল্লিশের দশকের গল্পকারদের উপর প্রভাব বিস্তারকারী লেখক। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার এই দুজনকে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষ কুমার ঘোষ এবং নরেন্দ্র মিত্রের পূর্বসূরী হিসেবে উল্লেখ ক'রে বলেন — "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবোধ ঘোষের দক্ষতাকে উত্তরাধিকার হিসেবে নিয়েই চল্লিশ দশকে এসেছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষ কুমার ঘোষ, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র।"[২২] তার এই বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট যে সুবোধ ঘোষের মত শক্তিশালী লেখক শুধুমাত্র পরবর্তী গল্পকারদেরই নন সমসাময়িক গল্পকারদেরও প্রভাবিত করেছিলেন। সুবোধ ঘোষের প্রভাব বা উত্তরাধিকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র কতখানি বহন করেছেন তা যথাসময়ে আলোচিত হবে। এখন দেখা যাক সুবোধ ঘোষের বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রবণতাটি কোন দিকে।

'অযান্ত্রিক' গল্প প্রকাশের (আনন্দবাজার পত্রিকা, বার্ষিক দোল সংখ্যা, ১৯৪০) মধ্য দিয়ে সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পের জগতে আর্বিভাব। রিয়ালিজমের এক নতুন রূপ নিয়ে সাহিত্য জগতে তাঁর আর্বিভাব, তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য "গভীর অর্থনীতিক ও রাজনীতিক চেতনা, প্রখর বাস্তবজ্ঞান ও অভ্রান্ত জীবনবোধ" [২৩] সুবোধ ঘোষের ছোট গল্পের সংখ্যা ১৫৭টি। এই গল্পগুলির মধ্যে 'অযান্ত্রিক', 'ফসিল', 'গোত্রান্তর', 'সুন্দরম্', 'পরশুরামের কুঠার', 'চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ' ইত্যাদি সুবিখ্যাত। তিনি তাঁর ছোটগল্পে যেমন ভাবে মধ্যবিত্ত মানুষের ভণ্ডামি, আত্মপ্রতারণা, ভীরুতা, নীচতা, হীনতা ও সুবিধাবাদী মানসিকতা প্রকাশ করেছেন তা তুলনারহিত। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আত্মপ্রতারক মধ্যবিত্ত শ্রেণির মনবিশ্লেষণ।

সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তার বিষয়গত বৈচিত্র্য। তাঁর রচিত গল্পগুলির বিষয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তিনি এমন সব বিষয় ও এমন এক জগতকে আমাদের সামনে তুলে এনেছেন যা এরপূর্বে বাংলা ছোট গল্পের জগতে দেখা যায়নি। এক 'যন্ত্রপশু'র সঙ্গে মানুষের আত্মিক সম্পর্কের দিকটি ফুটে উঠেছে 'অযান্ত্রিক' গল্পে। যন্ত্রের সঙ্গে মানবের বিচ্ছেদের ট্র্যাজেডি গল্পের মূল যা একই সঙ্গে অর্থনৈতিক সঙ্কটের উপর নির্ভরশীল। 'ফসিল' গল্পে অঞ্জনগড়ের অভ্রখনির পটভূমিকায় তিনি রচনা করেছেন সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র ও শ্রমজীবি শ্রেণির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামকে। অর্থনীতিকে গভীরভাবে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তুলে এনেছেন তিনি এই গল্পে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির আত্মপ্রতারণা, অসার দম্ভ ও আভিজাত্যকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন 'সুন্দরম', 'গোত্রান্তর' , 'উচলে চড়িনু', 'পরশুরামের কুঠার' প্রভৃতি গল্পে। এই সব গল্পে তিনি কখনো দেখান যে মধ্যবিত্ত শ্রেণি কেমন করে অর্থনৈতিক চাহিদা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ('গোত্রান্তর'), আবার কখনো দেখান এই শ্রেণির আপাত নীতিবোধের আড়ালে কেমন করে

প্রকাশিত হয় চরম দেহকামনা ও লোলুপতা ('সুন্দরম')। 'পরশুরামের কুঠার' গল্পে দেখা যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির সুবিধাবাদী মানসিকতা এক সময়ে স্তন্যদানকারীকে কেমন করে বারবণিতায় রূপান্তরিত করে। এদের পাশাপাশি 'চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ' গল্পে দেখা যায় ধর্মকে অবলম্বন করে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের প্রসারণ ও আদিবাসী মানুষের জীবনযন্ত্রণার দিকটি।

অসামান্য ভাষাভঙ্গী, অনন্য শিল্পচাতুর্য ও সমাজ চেতনার প্রাখর্যে সুবোধ ঘোষ আমাদের পরিচিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির অজানা মানসিকতাকে যেমন নিপুণভাবে ব্যবচ্ছেদ করেছেন তেমনি অপরিচিত জনসমাজকেও পরিচিত করবার প্রয়াস করেছেন। আদিবাসী সমাজ ও পরিচিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি উভয়ের নিপুণ রূপকার হিসেবেই তিনি অসামান্য। এই ক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের তুলনা করলে দেখা যায় নরেন্দ্রনাথের রচনায় অপরিচিত জনসমাজ বিশেষ উঠে আসেনি, বরং তিনি চেয়েছেন "পরিচিতদের সুপরিচিত করতে।"[২৪]

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সমসাময়িক আর এক গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'খেলনা' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৬ সালে। 'প্রখর ইন্দ্রিয়চেতনা' এবং 'প্রকৃতি ব্যবহারের অভিনবত্ব'— এই দুটি বৈশিষ্ট্য জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্প পর্যালোচনা করলে উপলব্ধি করা যায়। যে ভাবে তিনি প্রকৃতিকে তাঁর গল্পে ব্যবহার করেছেন তা বাংলা ছোটগল্পের জগতে অভিনব। এই প্রকৃতিচেতনা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃতিচেতনা নয়, এই প্রকৃতিচেতনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে যৌনচেতনা। প্রকৃতিচেতনার সঙ্গে অন্বিত যৌনচেতনাযুক্ত যে অভিনব রচনা তার প্রকৃষ্ট পরিচয় আছে 'নদী ও নারী', 'সমুদ্র', 'মীরার দুপুর', 'বনের রাজা', 'গিরগিটি', প্রভৃতি গল্পে। শুধুমাত্র নরেন্দ্রনাথ নয় সমকালীন অন্যান্য সকল গল্পকারদের থেকেই এ বিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। তাঁর গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তিনি কালসচেতন নন, রাজনীতি ও সমাজনীতির সম্পর্কেও তাঁর সচেতনতা কিছুটা কম। শুধু তাই নয় তিনি তথাকথিত বাস্তববাদী লেখকও নন, তাই বলে ভাববিলাসিতাও তাঁর গল্পের প্রধান লক্ষণ নয়। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন — "আসলে তিনি অন্তর্লোক - উন্মোচনকারী শিল্পী, সৌন্দর্যবাদী। সৌন্দর্যের সামগ্রিকতা ও ব্যক্তি নিরপেক্ষতায় তাঁর আগ্রহ আছে।"[২৫] অপরদিকে সরাজমোহন মিত্র বলেন — "তিনি এক অন্তর্মুখী নিঃসঙ্গ শিল্পী। আপন খেয়ালে এই জগৎ ও জীবনকে পর্যবেক্ষণ করেন, তার সৌন্দর্যকে অনুভব করেন এবং আধুনিক কবির মত তাকে অন্তর্মুখী করেই প্রকাশ করেন।"[২৬] জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সম্পর্কে আলোচকের এই মন্তব্য থেকেই উপলব্ধি হয় যে তাঁর ছোট গল্পের বিষয় ও রীতি স্বতন্ত্র ও অভিনব। তাঁর গল্পে কাহিনিভাগ স্বল্প বরং অনুভব গভীরতাই প্রধান।

পূর্বেই বলা হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সঙ্গে সমকালীন লেখকদের বা ছোটগল্পকারদের বিশেষ স্বাতন্ত্র্য বর্তমান তবুও বলা যায় একটি স্থানে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য আছে আর সেই মিলটি

হল এই যে উভয়েই নাগরিক জীবনের কথাকার আর এই নাগরিকেরা মধ্যবিত্ত শ্রেণির। নরেন্দ্রনাথের রচনায় গ্রামজীবন ও গ্রামীণ চরিত্রও প্রচুর উঠে এসেছে কিন্তু তাঁর পরের দিকের রচনাসমূহে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শহর কলকাতার নগর জীবনের চিত্রই প্রধান। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র উভয়েই নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির চিত্রাঙ্কন করলেও উভয়ের রচনার মিল শুধু ঐটুকুই। প্রকৃতি ও সৌন্দর্যচেতনা ব্যতীত জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী যে মানুষগুলিকে রচনা করেন তারা সকলেই বিপন্ন, বিপর্যস্ত, অবক্ষয়িত সমাজের মানুষ, যারা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে নেমে কেবলই আরো বিপর্যস্ত ও অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে নরেন্দ্রনাথ রচনা করেন মানুষের উত্তরণের কাহিনি; সর্বনাশের শেষ সীমাতে এসেও যেখানে মানুষ ঘুরে দাঁড়ায় আলোর দিকে। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে মানুষের অন্তঃশীল সংঘাত ও সংকটই ব্যাপ্ত হয়ে থাকে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সমসাময়িক গল্পকারদের মধ্যে অন্যতম লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও বন্ধুত্ব ছিল ছাত্রাবস্থা থেকেই। ফরিদপুরে তাঁরা উভয়েই এক কলেজে পড়তেন এবং সেখান থেকেই তাদের সখ্য গড়ে উঠে। নরেন্দ্রনাথের ভাই ধীরেন্দ্রনাথ মিত্রের রচনা থেকে জানা যায় যে নরেন্দ্রনাথ ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শুধু ঘনিষ্ঠতা নয় তাদের টেম্পারামেন্টেরও মিল ছিল। ধীরেন্দ্রনাথ লেখেন — "ফরিদপুরে কলেজেই নারায়ণ গাঙ্গুলির সঙ্গে দাদার আলাপ। নারায়ণ ফরিদপুরে এক বছর আই এ পড়েছিল। একবার ছুটিতে আমাদের বাড়িতে একমাস কাটিয়ে এসেছিল।... কলেজে দাদার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল নারায়ণ। নারায়ণের সঙ্গে দাদার মেজাজের মিল ছিল।"[২৭] এম এ-তে ভর্তি হয়েও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে একই সঙ্গে কলকাতায় শোভাবাজারের মেসে থাকতেন এবং একই সঙ্গে লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার লড়াইয়ে সঙ্গী হয়েছিলেন।

যদিও ধীরেন্দ্রনাথ লেখেন নরেন্দ্রনাথ ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মেজাজের মিল ছিল' তথাপি এই মিল তাদের রচনায় খুব বেশি দেখা যায় না। বীভৎস ও অদ্ভুত রস এবং ভয়ানক মর্মান্তিক পরিস্থিতি ও পরিবেশ রচনার দিকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের যে বিশেষ প্রবণতা তার সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের কোনো মিল নেই। রোম্যান্টিক উদ্দাম কল্পনা ও কাব্যপ্রাণতা তাঁর গল্পের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য। 'বীতংস', 'টোপ', 'পুষ্করা' প্রভৃতি গল্পগুলিতে কখনও প্রকাশিত হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক হিংস্রতা, যেখানে রাজকীয় ব্যাঘ্র শিকারের আয়োজনে টোপ হিসেবে মানবশিশুকে ব্যবহার করা হয় ('টোপ'), আবার কখনও প্রকট হয়ে উঠেছে মন্বন্তরের সময়ের বস্ত্রসঙ্কটের তীব্রতা ('দুঃশাসন')। 'হাড়' গল্পটিতে দেখা যায় কেমন করে সভ্যতাগর্বী বিকারগ্রস্ত এক রায়বাহাদুর দুর্ভিক্ষের দিনে সম্পূর্ণ বিকারহীন থাকেন, নিজের বিবেক ও মানবিকতার দরজাকে অবরুদ্ধ রাখেন। রায়বাহাদুরের মধ্যদিয়ে সমগ্র বিত্তবান অভিজাত শ্রেণির সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশিত হয়েছে। 'ভাঙ্গা চশমা' গল্পে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন, যে দুর্ভিক্ষকে প্রতিরোধ করা

সম্ভব ছিল তা কেমন করে প্রশাসনের অবহেলায় ও কালোবাজারিদের চক্রান্তে ভয়াবহ আকার ধারণ করে আর কেমন ভাবে তা এক নিষ্ঠাবান আদর্শবাদী শিক্ষকের স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দেয়। 'পুষ্কর' গল্পেও দুর্ভিক্ষ তার ভয়াবহতা এক ভিন্ন মাত্রা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। 'বীতংস' গল্পটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। আসামের চা বাগানের কুলি সংগ্রহের দালাল সুন্দরলাল নিরীহ সাঁওতালদের বিশ্বাস অর্জন করে তাদের সরল বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে তাদের চা বাগানের কুলিতে পরিণত করবার জন্য নিয়ে যায়। গল্পের পটভূমি ও পরিবেশ রচনার ক্ষেত্রে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিচিত্র ও প্রচুর অভিজ্ঞতার দিকটি ক্রিয়াশীল। এই গল্পগুলি ছাড়াও তাঁর অন্যান্য গল্পে তিনি পরিচয় দিয়েছেন প্রখর কাল সচেতনতার, প্রবল পৌরুষ ও তীক্ষ্ণ সমাজ সচেতনতার। বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক পরিস্থিতি, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, বিক্ষোভ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত একটি কালকে তিনি সময় সচেতন গল্পকারের মতন তুলে ধরেছেন। এই প্রখর কালসচেতনতা ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও শানিত বিদ্রূপের ভঙ্গিটি তাঁর বন্ধু ও একসময়ের 'রুমমেট' নরেন্দ্রনাথের মধ্যে খুঁজে পাওয়া শক্ত।

এতক্ষণ পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথের সমকালীন সাহিত্যসঙ্গীদের যে পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করা হল তাঁরা সকলেই বিক্ষুব্ধ সময়ের লেখক। এই লেখকদের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের কিছু কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া গেলেও বৈসাদৃশ্যই যেন চোখে পড়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে সন্তোষকুমার ঘোষের সঙ্গেই তাঁর সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে মিল যেন খুঁজে পাওয়া যায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণির রূপায়ণে উভয়েই সমধর্মী বলে চিহ্নিত হতে পারেন।

নরেন্দ্রনাথের মত সন্তোষকুমারও ছিলেন ফরিদপুর জেলায়। নরেন্দ্রনাথ যেমন বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত করেন ভাঙ্গা ও সদরদিতে, তেমনি জন্মের (১৯২০) পর ষোল বছর পর্যন্ত সন্তোষকুমারও অতিবাহিত করেন ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ি নামে মহকুমা শহরে। শুধু এই সাদৃশ্য নয় নরেন্দ্রনাথের মত সন্তোষকুমারও পরবর্তীকালে (১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে) কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য চলে আসেন। ব্যক্তিজীবনের এই সাদৃশ্য ব্যতীত উভয়ের রচনাগত দিকের সাদৃশ্য অনুসন্ধানই আমাদের উদ্দেশ্য। ১৯৩৭ সালে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় সন্তোষকুমারের প্রথম গল্প 'বিলাতী ডাক' প্রকাশিত হয়, 'তারাশঙ্করের 'ছলনাময়ী' গল্প পড়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে সন্তোষকুমার এই গল্পটি লেখেন।(সূত্র — অলোক চক্রবর্তী ঃ 'সন্তোষকুমার ঘোষ ঃ কথাসাহিত্যে স্বয়ং নায়ক', পুস্তক বিপণি,কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর, ২০০১, পৃষ্ঠা — ১৩৩)। গ্রামীণ পটভূমিকায় তিনটি দিনের আশ্রয়ে লেখক বহুচরিত্রকে উপস্থাপন করেছেন এই গল্পে। যে সামাজিক সংবেদনশীলতার ধর্মে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সন্তোষকুমারের সাদৃশ্য আমরা অনুভব করি সেই সামাজিক সংবেদনশীলতার পরিচয় প্রথম গল্প থেকেই পাওয়া যায় । আলোচক সন্তোষকুমারের ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন — "কলকাতার নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের অকিঞ্চিৎকরতার

নির্মোহ চিত্রায়ণে তিনি নিপুণ। তাঁর গল্পের ভিতরে বক্তব্য স্পষ্ট রেখায়িত। আসলে বক্তব্যটাই আগে আসে, তাকে ঘিরে গল্পের ঠাস বুনন। নেই প্লটের প্রতি ঝোঁক, নেই টানা গল্প রচনার আগ্রহ। আছে পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি, আর ভাষার উজ্জ্বল প্রসাধন।"[২৮] এছাড়া তাঁর রচনার আর একটি দিক হল আত্মজৈবনিকতা। নিম্নমধ্যবিত্তের জীবন রূপায়ণের পরিচয় যে গল্পগুলিতে ফুটে উঠেছে সে গুলির মধ্যে 'যাদুঘর', 'একমেব', 'দ্বিজ', 'কানাকড়ি', 'কস্তুরীমৃগ' প্রভৃতি গল্পের নাম উল্লেখ করা যায় আর আত্মজৈবনিকতার সুর ফুটে উঠেছে 'শোক', 'চিররূপা', 'জীয়ন কাঠি' প্রভৃতি গল্পে। যুদ্ধোত্তর কালের সামাজিক বিপর্যয়ের চিত্র তাঁর গল্পে আছে, দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই-এ পরাস্ত, ধীরে ধীরে নীতিভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া মানুষের চিত্র আছে কিন্তু সেই বর্ণনায় অতিরঞ্জন নেই, বীভৎসতা নেই, বর্ণনায় নির্মমতা আছে কিন্তু একই সঙ্গে সুগভীর মমতা ও করুণাও আছে। এই দিকটি দিয়ে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সাদৃশ্য।

এই অধ্যায়ে নরেন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক ছোটগল্পকারদের কিছু কিছু পরিচয় নেবার এবং তাঁদের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের কিছু ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। এখন নরেন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্যের দিকটিকে, তাঁর বিশেষত্বের দিকটিকে নির্দেশ করে বাংলা ছোটগল্পের জগতে তাঁর স্থানটিকে নির্ধারণ করার প্রচেষ্টা করা যেতে পারে।

নরেন্দ্রনাথের আবির্ভাব কালটিকে প্রথম অধ্যায়ে কিছুটা ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। নরেন্দ্রনাথের সমকালকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তিনি নিজে এক বিক্ষুব্ধ সময়ের প্রতিনিধি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা মুহূর্তে তাঁর ছোটগল্প জগতে আবির্ভাব আর সেই সময়টি ছিল এক উদ্‌ভ্রান্ত পালাবদলের কাল। প্রচলিত নিয়মনীতির, মূল্যবোধ ও নীতিবোধের বিপর্যয়ের, পারিবারিক ও সামাজিক এক ভাঙনের কাল ছিল সেটি। তাঁর সমসাময়িক প্রায় সকল গল্পকারই সেই বিক্ষুব্ধভাবকে আশ্রয় করেই সাহিত্য জগতে পদার্পণ করেছেন, কিন্তু লক্ষ করার বিষয় যে প্রচলিত সাহিত্যস্রোতধারা থেকে নরেন্দ্রনাথ ছিলেন অনেকটাই দূরবর্তী। বিক্ষুব্ধ সময়ের লেখক হয়েও তিনি স্থিতধী, শান্ত ও সংযত। তিনি মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত মানুষদেরকে নিয়েই তাঁর ছোটগল্প রচনা করেছেন, কিন্তু এই মানুষদের সমসাময়িক সকল গল্পকারই তাঁদের রচনায় স্থান দিয়েছেন এবং এটি সেই সময়ের গল্পের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু এই একই বিষয়ে নিয়ে গল্প রচনা করলেও সমসাময়িক লেখকদের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট পার্থক্য বর্তমান, আর এই পার্থক্য মমতার-সহমর্মিতার। আলোচক এই প্রসঙ্গে বলেন — "সমসাময়িক লেখকরা যখন নির্মম হাতে মধ্যবিত্ত বিবেকের ব্যবচ্ছেদ করেছেন, নির্মোহ নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সকল রকম ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন, কঠিন সময়কে ততোধিক কঠিন ধিক্কারে জর্জরিত করে সাহিত্যে তুলে এনেছেন, সেখানে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের বড় রকমের ব্যতিক্রম ঘটে গেছে। মধ্যবিত্ত বিবেকের কাঁটাছেড়া নরেন্দ্রনাথও করেছেন। কিন্তু এই মানুষের পাপের কথায় পঞ্চমুখ তিনি হতে পারেননি, তাদের

পদস্খলনের চিত্র আঁকার সময় অন্যদের মত নির্মম হতে পারেন নি নরেন্দ্রনাথ। বরং বেদনাহত চিত্তে তাদের সহমর্মী হয়েছেন।"[২৯] এই সমবেদনা ও সহমর্মিতার ক্ষেত্রেই নরেন্দ্রনাথ বিশিষ্ট হয়ে পড়েন। তাই আমরা দেখতে পাই, সর্বনাশের প্রান্ত সীমায় দাঁড়িয়েও মানুষ ফিরে আসে, পতনোন্মুখ হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানবাত্মার জয়কেই ঘোষণা করে। নরেন্দ্রনাথের গল্পে এই বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও সেগুলিতে বাস্তবতার হানি ঘটেনি, যেখানে প্রয়োজন সেখানে অনেক নির্মম, নিরাবরণ বর্ণনা আছে, কিন্তু পাপ বা স্খলন পতনের ত্রুটির বর্ণনা তাঁর গল্পের প্রধান লক্ষণ নয়। তাই 'রসাভাস' গল্পে দেখি নারীমাংস লোলুপ মুকুন্দ ভাঙনের শেষ সীমায় এসে দাঁড়ালেও মনুষ্যত্ববোধ তার মরে যায়নি। বরং তার মধ্যে সহসা মনুষ্যত্ববোধের জাগরণ ঘটেছে, আকস্মিক আঘাতে সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে সে, সোহাগীকে ভোগের বাসনা ছিল তার অন্তরে, কিন্তু যখন সে দেখে নিজের আপন মাসি হওয়া সত্ত্বেও পদ্মমণি সোহাগিকে মুকুন্দের ভোগের সামগ্রী হতে দিতে বিন্দুমাত্র অরাজি নয়, বরং সানন্দে সহায়তা করতে ও হাতপেতে অর্থ উপার্জনের জন্য উদ্‌গ্রীব, তখন পদ্মমণির নির্লজ্জ ব্যবহার ও অমানবিকতায় স্তম্ভিত হয়েছে গেছে মুকুন্দ,তার নিজের স্খলন- পতন-ত্রুটিকে সে যেন সহসা উপলব্ধি করেছে। পদ্মমণির নির্লজ্জ বাক্যালাপ, লোভ ও রসিকতায় অস্থির হয়ে পদ্মমণিকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে সে, নিজেও আহত পশুর মত পালিয়ে গিয়ে যেন নিজের কাছে নিজেকে ছোট হবার থেকে বাঁচাতে চেয়েছে।

মানুষের মনুষ্যত্বের অবক্ষয়ের চূড়ান্ত রূপ পরিলক্ষিত হয় 'পুনশ্চ' গল্পেও। গ্রাম্য তাঁতি জৈনুদ্দিন তার খদ্দেরদের জন্য নারী সংগ্রহের ঘৃণ্য বৃত্তি গ্রহণ করেছে। এর পেছনে অবশ্য কারণ ছিল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। দাদা মৈনুদ্দিনের বিধবা ফতেমাকে বিয়ে করেছিল জৈনুদ্দিন, কিন্তু দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে একদিন ফতেমাকে ত্যাগ করে সে, আর ফতেমাও ক্ষুধার জ্বালায় অবস্থাপন্ন আবদুল খাঁয়ের শরণাপন্ন হয়। পরিণামে শহরের পতিতালয়ে স্থান হয় ফতেমার। সময়ের পরিবর্তনে একদিন জৈনুদ্দিনকেই তাঁর পূর্বের স্ত্রী ফতেমার জন্য খদ্দের ধরে এনে জীবিকা অর্জন করতে হয়। মনুষ্যত্বের এই চরম অবক্ষয়ের গল্পেও দেখা যায় শেষ পর্যন্ত জৈনুদ্দিন ও ফতেমা উভয়েই নিজেদের পাপজীবনকে পরিত্যাগ করে সুস্থজীবনে ফিরে আসার জন্য প্রয়াসী, পুনরায় নিজেদের ঘর বাঁধতে আগ্রহী। এভাবেই অবক্ষয়ের চূড়ান্ত সীমাতে এসেও মানুষের শুভবুদ্ধি, মানবিকবোধের জয় ঘোষিত হয় নরেন্দ্রনাথের গল্পে।

শুভবুদ্ধির জয় বিষয়টি নরেন্দ্রনাথের ছোটগল্পের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত হতে পারে। তাঁর সমসাময়িক লেখকেরা অনেকাংশেই ফ্রয়েডের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গল্প রচনা করেছেন, কিন্তু নরেন্দ্রনাথের ফ্রয়েডপ্রভাবিত গল্প বিশেষ নেই। তিনি নিজে 'সংসার', 'জরা' ও 'যযাতি'- কে বিকৃত বা পরোক্ষ যৌনভোগের গল্প বলে উল্লেখ ক'রে ফ্রয়েডের কোনো কোনো সূত্রের নিদর্শন বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি নিজে 'যযাতি' গল্পকে ফ্রয়েডপ্রভাবিত বললেও এই প্রভাব কেবলমাত্র গল্পের শেষ

পরিচ্ছেদেই ব্যক্ত হয়েছে অবশ্য এই শেষ পরিচ্ছেদেই গল্পের রসনিষ্পত্তি। দেহ উপভোগের বাসনা অথচ শক্তিহীনতা, মানুষের মনের এই হতাশার বহিঃপ্রকাশই যেন রয়েছে গল্পে। এই প্রসঙ্গে গল্পের শেষ পরিচ্ছেদটি উদ্ধার করা যেতে পারে — "হিমানীর কালো, মোটা, মন্থর গতিতে অপসৃয়মাণ শরীরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ভুবনবাবুর নিজেকে অত্যন্ত বঞ্চিত মনে হয়। তিনি যেন উপবাসী রয়ে গেছেন, বুভুক্ষু রয়ে গেছেন, যৌবনে যেন তিনি কোনোদিন কিছু উপভোগ করেননি। অলক্ষ্যে কখন প্রৌঢ়ত্ব এসে পড়েছে। আর সম্পূর্ণ বুড়ো হবার আগেই এল দুর্দৈব পঙ্গুত্ব। এই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শময় পৃথিবী তার কাছে যেন অনাস্বাদিত রয়ে গেল। বিগত দীর্ঘ দাম্পত্যজীবনের দিনগুলির মধ্যে একটি উদ্বেল রঙীন মুহূর্তের কথাও আজ তাঁর মনে পড়ল না। বিশ বছর যেন একটানা কেবল একটা অভ্যাসের মধ্যে কেটেছে। নিতান্তই একটা শারীরিক অভ্যাস, আর কিছু নয়।" এই প্রসঙ্গে বলা যায় 'যযাতি' গল্পটি রচিত হয়েছে ফাল্গুন ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে, তবে এই একই নামে নরেন্দ্রনাথের আরেকটি গল্প রয়েছে, তার রচনাকাল আশ্বিন, ১৩৬৬ তারিখে। এই দ্বিতীয় 'যযাতি' গল্পেও প্রায় বৃদ্ধ দম্পতির শারীরিক সক্ষমতার প্রসঙ্গ রয়েছে। যেমন — "এই ষাট বছর বয়সেও তিনি যতখানি সজীব আর সচল বাসন্তী তা নেই। বাসন্তী যেন অনেক আগেই বুড়িয়ে গেছে। কুড়িতে না হলেও চল্লিশে তো বটেই। চল্লিশের পর থেকে বাসন্তী শুধু গৃহিণী আর সচিব। সখী নয়। ললিতকলায় শিষ্যত্বগ্রহণেরও কোন আগ্রহ নেই।... তাতে অবশ্য দুঃখ নেই পঞ্চাননের।"

ফ্রয়েড ব্যতীত অন্য যার দ্বারা লেখকেরা প্রভাবিত হয়ে গল্প রচনা করেছেন তিনি হলেন কার্ল মার্কস। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্প এবং সমরেশ বসুর প্রথম দিকের গল্প যে ভাবে মার্কসবাদের দ্বারা প্রভাবিত নরেন্দ্রনাথের গল্পে মার্কসবাদের সেরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' বা 'হারানোর নাতজামাই' কিংবা সমরেশ বসুর 'কিমলিস'-এর সমগোত্রীয় গল্প নরেন্দ্রনাথের রচনায় পাওয়া যায় না, তবে রাজনৈতিক মতাদর্শ ও রাজনীতি প্রভাবিত গল্প নরেন্দ্রনাথ বেশ কিছু লিখেছেন। এই প্রসঙ্গে 'পতাকা', 'বিষাদযোগ' 'অপঘাত' প্রভৃতি গল্পের নাম উল্লেখ করা যায়। মার্কসবাদ বা অন্য কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা গল্প রচনার ক্ষেত্রে উৎসহিত না হলেও কাল সচেতন শক্তিশালী লেখক নরেন্দ্রনাথ খাদ্যসংকট ও বস্ত্র সংকটকে নিয়ে গল্প রচনা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ 'মদনভস্ম' (খাদ্য সংকটের চিত্র) এবং 'আবরণ' (বস্ত্র সংকটের চিত্র) গল্পের কথা উল্লেখ করা যায়।

নরেন্দ্রনাথের গল্পের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল এই যে তাঁর গল্পে শত অনাচার ও বীভৎসতার মধ্যেও মানুষের ন্যায়বোধ নিঃশেষ হয়ে যায়না, কল্যাণময় ও সুন্দরের শান্তিময় বাতাবরণ সেখানে বিরাজ করে। একথা সর্বতোভাবে সঠিক হলেও যেখানে প্রয়োজন সেখানে নিরাবরণ বর্ণনা ও সত্যের নগ্ন প্রকাশও

নরেন্দ্রনাথের রচনায় আছে। অতএব তাঁকে ভালোত্ববাদী দার্শনিক উপাধিতে ভূষিত করা যায়না। তবে একথাও সত্য যে অনাবশ্যকভাবে বা ইচ্ছাকৃত ভাবে পঙ্কিল বর্ণনা দ্বারা তাঁর রচনাকে তিনি আবিল করেননি। যে লেখক 'রসাভাস' গল্পে দেখান যে, অর্থলালসার বিকৃতরূপ দেখে, মাসি- বোনঝির সম্পর্ককে কলুষিত হতে দেখে মুকুন্দের পাপ ও নারী মাংস লোলুপতা বিলীন হয়ে গেছে, তিনিই 'মদনভস্ম' গল্পে দেখান যে দুঃসহ ক্ষুধার আগুনে দয়া, মায়া, স্নেহ, ভালোবাসা ও উদগ্রকামনা বাসনাও কেমন করে নিঃশেষ হয়ে যায়। কেবলমাত্র 'ভালোবাসার গল্পে'র লেখক নরেন্দ্রনাথ জৈবিক প্রবৃত্তির যে নগ্ন ভয়ংকর রূপকে 'মদনভস্ম' গল্পে ফুটিয়ে তোলেন সেটি তাঁর সমসাময়িক লেখকদের রচনায় উপস্থাপিত ভয়াবহ বর্ণনা থেকে কম ভয়ংকর নয়। এই গল্পে নরেন্দ্রনাথ দেখান যে ধনঞ্জয় ধুপীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মালতী অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছে ভাগ্নে মানিকের সঙ্গে। কঞ্চির প্রহার, তিরস্কার, ভর্ৎসনাও মালতীকে তার দুর্বার বাসনা থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। কিন্তু ক্ষুধার আগুনে সেই কামনা নিঃশেষ হয়ে গিয়ে কেবলমাত্র ক্ষুধার জ্বালাকেই অবশিষ্ট রেখেছে। এই বিষয়টিকে যেমন ভাবে কঠোর বস্তুনিষ্ঠতার সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে তাঁর ভালোত্ববাদী রচনাকারের তকমা ঘুচে যায়, বরং এক শক্তিশালী লেখকের বাস্তবনিষ্ঠাকেই তুলে ধরে। তাই বলা যায় 'শান্ত মধুর ভাব' তাঁর রচনায় বেশি, কিন্তু সমাজের শঠতা, ক্রুরতা ও বীভৎস দিকের পরিচয় তাঁর রচনায় কম কিন্তু একেবারেই নেই তা নয়। এর কারণ এই যে, তাঁর মেজাজ রোম্যান্টিক সৌন্দর্যপ্রিয় তাই তাঁর রচনার প্রবণতাও সেইদিকে। এ তাঁর দুর্বলতা নয়, বরং বিশিষ্টতা; যা তাঁকে সমসাময়িক গল্পকারদের থেকে পৃথক করেছে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, তাঁর গল্পের পরিবেশ ও চরিত্রগুলি আমাদের খুব চেনা ও আমাদের আশেপাশে যেন এমন চরিত্র আমরা প্রত্যহই দেখতে পাই। তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচকদের অভিযোগ এই যে, গল্প রচনার ক্ষেত্রে তিনি যেন খুব নির্দিষ্ট একটি গন্ডির মধ্যেই ঘোরাফেরা করেছেন, সেই পরিচিত মানুষের চেনা গন্ডির বাইরে তাকে খুব একটা বেশি ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়না। একথা অনেকাংশে সত্য কিন্তু তার সঙ্গে এই কথাও সত্য যে পরিচিত যে পরিবেশ ও চরিত্রকে তিনি বর্ণনা করেন তা কিন্তু অতি চেনা হলেও কম আকর্ষণীয় নয় এবং একঘেয়েমির লেশ মাত্র সেখানে নেই। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিচিত জনের জীবনেও যে বহুরহস্য, বহু আকর্ষণ, বহু গল্পের উপাদান আছে তা নরেন্দ্রনাথ আমাদের সামনে সুস্পষ্ট রূপেই প্রকাশ করেছেন। তিনি নিজের এই প্রবণতা অর্থাৎ আমাদের সুপরিচিত মানুষদের নিয়ে গল্প লেখার বিষয়টি সম্পর্কে সম্যকরূপে অবহিত ছিলেন এবং নিজের বিভিন্ন রচনায় তা সুস্পষ্টভাবে স্বীকারও করেছেন। 'দ্বীপপুঞ্জ' উপন্যাসের তৃতীয় সংস্করণে 'বলাবাহুল্য' শিরোনামাঙ্কিত ভূমিকায় তিনি বলেন — "আমার কোন রচনাতেই অপরিচিতদের পরিচিত করবার উৎসাহ নেই। পরিচিতরাই সুপরিচিত হয়ে উঠেছে।" আবার 'গল্প লেখার গল্প' - এ নরেন্দ্রনাথ

বলেন — "সব লেখকই নিজের চেনাজানা গন্ডির ভিতর থেকে গল্পের উপাদান পেয়ে যান। আমিও তাঁদের ব্যতিক্রম নই। তবে কেউ কেউ বলেন আমার লেখায় সামান্য ছদ্মনামের আড়াল যদি বা থাকে, ছদ্মবেশের আড়ালটুকু থাকে না।" নরেন্দ্রনাথের নিজের এই বক্তব্য থেকে ও তাঁর ছোটগল্পের বিশ্লেষণ করলে তাঁর পরিচিত মানুষদের সুপরিচিত করবার প্রয়াসটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়। তারাশঙ্কর তাঁর ছোটগল্পে যে সকল মানুষকে ফুটিয়ে তুলেছেন, সেই মানুষেরা তারাশঙ্করের পরিচিত অর্থাৎ বীরভূমের গ্রামীণ সমাজের প্রধান জমিদার শ্রেণি এবং তাদের সঙ্গে সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণি, শৈলজানন্দের পরিচিত মানুষদের মধ্যে আছে কয়লাকুঠিতে বিচরণকারী জনসমাজ কিন্তু নরেন্দ্রনাথের পরিচিত জনের ক্ষেত্রটি পৃথক। নরেন্দ্রনাথের এই পার্থক্য শুধুমাত্র উপরোক্ত দুই গল্পকারের থেকে নয়, তাঁর সমকালীন অন্যান্য অনেক গল্পকারদের থেকেও। সমাজের বৈভবশালী মানুষ, উচ্চবিত্ত ব্যবসায়ী, অভারতীয় বা অবাঙালি মানুষেরা যেমন নরেন্দ্রনাথের অপরিচিত তেমনি সমাজের একেবারে অন্ত্যজ গোষ্ঠী, কয়লাখনি অঞ্চলের সাঁওতাল, ওঁরাও কুলি কামিন বা 'হিন্দু মসুলমান সাপুড়ে-বেদে-ডাকাত-চাষী-ঠ্যাঙাড়ে, কাহার-বাগদী-ডোম-বাউরি-বীরবংশী' সমাজ ও মানুষও তাঁর কাছে অপরিচিত জন। অভিজ্ঞতা বা পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা যাদের সঙ্গে নেই তাদের নরেন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পে তুলে আনার চেষ্টা করেননি। এই কারণে 'চাঁদমিঞা', 'রত্নাবাঈ' ও 'শ্বেতময়ূর' এই তিনটি গল্পে যথাক্রমে চাঁদমিঞা, রত্নাবাঈ ও আবীরচাঁদ-রূপচাঁদ এবং জার্মান যুবক ম্যাকস এই কয়টি চরিত্র ব্যতীত নরেন্দ্রনাথের অন্যান্য সকল গল্পের সকল চরিত্রই বাংলাদেশ ও বাঙালিয়ানার গন্ধ মিশ্রিত। নরেন্দ্রনাথের অপরিচিত জনের খোঁজ নেবার পর তাঁর পরিচিত জনের অন্বেষণ শুরু করা যেতে পারে। তাঁর অপরিচিত জনের সংখ্যা যেমন কম নয় তেমনি তাঁর পরিচিত জনের তালিকাও কম দীর্ঘ নয়। স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশে বসবাসের অভিজ্ঞতায় যে সকল মানুষকে তিনি তাঁর গল্পে, বিশেষ করে তাঁর প্রথম দিকের গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন তারা প্রত্যেকেই তাঁর পরিচিত আর এই পরিচিত জনেরা সকলেই পূর্ব বাংলার গ্রামীণ মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও অন্ত্যজ প্রান্তিক শ্রেণির মানুষজন।এদের অর্থনৈতিক শ্রেণি যেমন ভিন্ন তেমনি বৃত্তিগত পার্থক্য বা ভিন্নতাও কম নয়। কৃষাণ, কামলা, ছুতোর, গাছি, মালাকার, মাঝি প্রভৃতি পেশার মানুষদের খুঁজে পাওয়া তাঁর গল্পের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। অপরদিকে লেখকের কলকাতাবাসের অভিজ্ঞতালব্ধ গল্পগুলির চরিত্রও মধ্যবিত্ত মানুষ কিন্তু তারা গ্রামীণ নয় বরং নাগরিক। আর লেখকের মত তাদের অনেকেই দেশভাগের শিকার, তাদের জীবিকাও ভিন্ন ও বিচিত্র। তারা কখনও লেখক, গায়ক, শিল্পি, কাঠমিস্ত্রি, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, কেরানি, ফেরিওয়ালা, লেখক, সাংবাদিক কখনও বা টিউশন শিক্ষক।নরেন্দ্রনাথের গল্পের অন্যতম আকর্ষণের কারণ হয়তো এই যে, তাঁর গল্পের চরিত্রগুলি আমাদেরও পরিচিত তাই এই চরিত্রগুলি আমাদের বিস্মিত করে না, বরং অধিক মাত্রায় আকর্ষণ করে। তাঁর পরিচিত মানুষেরা আমাদেরও

পরিচিত আর তাঁর রচনার দ্বারা আমরা আরও অধিক পরিমাণে সেই মানুষদের পরিচয় পাই। নরেন্দ্রনাথের রচনার এই বৈশিষ্ট্যের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে তাই আলোচক বলেন— "নরেন্দ্রনাথের শক্তির প্রকাশ তাঁর চেনাপরিচিত মানুষের গল্পে। 'পরিচিত'দের 'সুপরিচিত' করানোর অর্থ কী এই ঃ চরিত্রের কিছুটা জানা ছিল লেখকের সাহায্যে তাকে সম্পূর্ণভাবে জানা গেল। অর্থাৎ জানা ছিল 'অর্ধসত্য' ('পরিচিত'), লেখক সেই চরিত্রের 'সম্পূর্ণ সত্য'কে ('সুপরিচিত') উন্মোচিত করলেন।"[৩০] অপরদিকে নরেন্দ্রনাথের একই বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ করে তাঁর জনপ্রিয়তার কারণ অন্বেষণ করে অপর আলোচক বলেন— "গল্পের পরিবেশ ও চরিত্রগুলি ছিল খুব চেনা জানা আমাদের চারপাশের আপনজনেরা। এই সহজ গ্রহণযোগ্যতা সর্বস্তরের পাঠকের কাছে নরেন্দ্রনাথকে অত্যন্ত প্রিয় করে তুলেছিল।"[৩১] প্রকৃতপক্ষে বাঙালি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জীবন নরেন্দ্রনাথের গল্পে শিল্পরূপ লাভ করেছে। আপাতদৃষ্টিতে সাধারণভাবে যা নিতান্তই গতানুগতিক তার মধ্য থেকেও গল্পের বিষয়কে তুলে এনে তাকে অনায়াস দক্ষতায় অসামান্যতা দিয়েছেন নরেন্দ্রনাথ।

নরেন্দ্রনাথের রচনার আর একটি বিশেষ দিক হল এই যে, দেশবিভাগকে কেন্দ্র করে তিনি যত সংখ্যক গল্প রচনা করেছেন সম্ভবত এত সংখ্যক গল্প আর অন্য কোনো লেখক এই বিষয়কে নিয়ে রচনা করেননি। তিনি নিজে ছিলেন ছিন্নমূল উদ্বাস্তু। যদিও দেশভাগের পূর্ব থেকেই তিনি পূর্ব-পাকিস্তান পরিত্যাগ করে কলকাতাবাসী হয়ে ছিলেন কিন্তু দেশের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট যোগ ছিল, কারণ পরিবারের অন্যান্য সদস্যেরা তখনও পূর্ব- পাকিস্তানেই ছিলেন। ফলে দেশবিভাগের পর হিন্দু জনসমাজের ভারতবর্ষে চলে আসা ও তাদের জীবন সংগ্রামকে যেমন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তেমনি দেখেছেন ভিটেমাটি আঁকড়ে ধরে সজল আবেগে জীবনকে তুচ্ছ বিবেচনা করে পুরোনো বাসস্থানেই থেকে যাওয়া মানুষকে, অনুভব করেছেন তাদের বিশিষ্ট মন মানসিকতাকে। ফলে তাঁর ছোটগল্পগুলিতে উদ্বাস্তু মানুষের জীবন সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গেই স্থান পেয়েছে নিজের জন্মস্থানকে পরিত্যাগ করতে না চাওয়া মানুষের কাহিনি। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'পালঙ্ক' গল্পের ধলা কর্তার চরিত্রটি আমাদের কাছে বিশিষ্টতা লাভ করে। দ্বিখণ্ডিত বাংলার বিপর্যস্ত উদ্বাস্তু স্রোত, অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা হ্রাস, পুরোনো আমলের সামাজিক সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে না পারার ব্যর্থতা, নিঃসঙ্গতা, নিরপত্তাহীনতা প্রভৃতি বিষয় যেমন তাঁর 'হেডমাস্টার', 'দ্বিচারিণী', 'এক পো দুধ' প্রভৃতি গল্পে প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি কলকাতা বা ভারতবর্ষে এসে নতুন নাগরিক জীবনের সন্ধান পাবার আলোকে উজ্জ্বল চরিত্রও তাঁর গল্পে আছে ('কাঠগোলাপ'), আবার এই দেশবিভাগের ফলে যে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মেয়েরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বা স্বচ্ছলতার খোঁজে জীবিকা উপার্জন করার পথে নেমেছে এবং পুরুষের যোগ্য সহধর্মিণী হবার পথে এগিয়েছে ('অবতরণিকা') এমন চিহ্নও নরেন্দ্রনাথের গল্পে বর্তমান। অতএব এদিক থেকে দেখলে বোঝা যায় দেশভাগের বিষয়টি তাঁর বহু গল্পের পরিবেশ

বা পটভূমি রচনা করেছে আর মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজের ও পরিবারের উপর এই দেশবিভাগের ভিন্ন ভিন্ন অভিঘাত তিনি তাঁর রচনায় ফুটিয়ে তুলেছেন যা তাঁর সমসাময়িক রচনাকারদের থেকে তাঁকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। এই ভাবে নরেন্দ্রনাথের রচনার বিভিন্ন দিকগুলি আলোচনা করলে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায় আর সেগুলি সূত্রাকারে নিম্নে দেখানো যেতে পারে—

১. নরেন্দ্রনাথ বিশেষ কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা চালিত হয়ে তাঁর ছোটগল্প রচনা করেননি। যদিও প্রগতিশীল শিল্পি ও লেখক সংঘের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল কিন্তু বিশেষ কোনো মতাদর্শ দ্বারা নিজের লেখনীকে তিনি পরিচালিত করেননি বা প্রচারধর্মীতাকে তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য করে তোলেননি। যদিও 'পতাকা', 'অপঘাত', 'শোক', 'বিষাদযোগ' প্রভৃতি কয়েকটি তথাকথিত রাজনৈতিক গল্প তিনি রচনা করেছেন।

২. বিশিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা যেমন নরেন্দ্রনাথ পরিচালিত হননি তেমনি তাঁর সময়কার রচনাকারদের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য, মার্কস ও ফ্রয়েড দ্বারা প্রভাবিত হওয়া ও রচনায় তাঁদের তত্ত্বকে ব্যবহার করা— এই দিকটিও নরেন্দ্রনাথের গল্পে প্রকট নয়।

৩. নরেন্দ্রনাথের রচনার বিষয় মানুষ আর সেই মানুষ বিশেষ কোনো বিশেষত্ব বা অসাধারণত্ব মণ্ডিত নয়। নিছক বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবন ও তাদের অন্তর্গূঢ় জীবন কাহিনিই তাঁর উপজীব্য। এই ক্ষেত্রে দেখা যায় তাঁর প্রথম দিকের গল্পে পূর্ববাংলার গ্রাম জীবন তার অনুপুঙ্খ বাস্তবতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে আর পরবর্তী পর্যায়ের গল্পে কলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণি তাদের রক্ত, মাংস, ঘাম ও অশ্রু নিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছে।

৪. মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষ যেহেতু নরেন্দ্রনাথের রচনার মুখ্য চরিত্র, তাই দেখা যায় তাঁর চিত্রিত চরিত্রগুলি অনেকক্ষেত্রে দ্বিধা জর্জর, চিন্তাধারায় অনেক পরিমাণে স্ববিরোধে আক্রান্ত, একই সঙ্গে প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার ভিন্নমুখী আকর্ষণ ও বিকর্ষণে ক্ষতবিক্ষত।

৫. এক বিক্ষুব্ধ সময়ে তাঁর সাহিত্য জগতে আর্বিভাব কিন্তু এই বিক্ষুব্ধ সময় ও জীবনের বিক্ষুব্ধ রূপের রূপকার তিনি নন। তাই তাঁর মধ্যে সমকাল চেতনা থাকলেও এই সমকাল চেতনা তাঁর রচনার প্রেক্ষাপট রচনা করেছে, চরিত্রদের প্রভাবিত করেছে কিন্তু গল্পের প্রধান বিষয় হয়ে ওঠেনি।

৬. জীবনের ক্লেদাক্ত ও পঙ্কিল দিক থাকলেও এবং এই দিকগুলি সম্পর্কে তিনি সচেতন থাকলেও নরেন্দ্রনাথের মানসিকতা বা মেজাজ রোম্যান্টিক সৌন্দর্যপ্রিয়তার তাই তাঁর রচনাতেও এই রোম্যান্টিক সৌন্দর্যপ্রিয়তার দিকটিই প্রাধান্য লাভ করেছে। যদিও প্রয়োজনীয় স্থানে জীবনের নিরাবরণ বর্ণনা ও ক্লেদাক্ত দিকের বর্ণনাও তাঁর রচনায় আছে কিন্তু এই বর্ণনা এসেছে প্রয়োজনের খাতিরে কেবলমাত্র বাস্তব

গ্রাহ্যতা দানের আরোপিত প্রয়াসের কারণে নয়।

৭. নরেন্দ্রনাথের রচনায় নারী চরিত্রগুলির একটি বিবর্তন চোখে পড়ে। নারীরা সংসারে স্বচ্ছলতা আনয়নের জন্য কিংবা নিজের স্বাধীনতালাভের প্রয়াসে কর্মক্ষেত্রে নিজেকে মেলে ধরেছে। গৃহের নিজস্ব গণ্ডিবদ্ধতাকে অতিক্রম করে বৃহত্তর অঙ্গনে নারীরা পা রেখেছে বা রাখছে এমন চিত্র নরেন্দ্রনাথের রচনায় প্রচুর আর অনেকক্ষেত্রে তাঁর চিত্রিত নারী চরিত্রগুলি তাদের পার্শ্ববর্তী পুরুষ চরিত্রগুলি অপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল। নারী চরিত্রগুলি কেবল পুরুষের পরিপূরক নয় বরং নিজস্ব শক্তির প্রকাশে উজ্জ্বল।

৮. দেশবিভাগ নরেন্দ্রনাথের রচনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই দেশবিভাগ, তার প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভুত পরিস্থিতি, উদ্বাস্তু স্রোত ও উদ্বাস্তু মানুষের জীবন সংগ্রাম যেমনভাবে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা নিয়ে তাঁর গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে তা বাংলা ছোটগল্পের জগতে বিরল।

৯. নরেন্দ্রনাথের রচনার আর একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে তার রচনার বিষয়গত স্বাতন্ত্র্যের আলোচনা শেষ করব আর সেটি হল, নরেন্দ্রনাথের রচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক শুভবুদ্ধির জয় দেখতে পাওয়া যায়। তিনি যখন কোনো জটিল সমস্যার অবতারণা করেন তখন কেবলমাত্র সমস্যার যন্ত্রণাটুকুকেই প্রকাশ করেন না বরং সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির দিকটির দিকেও ইঙ্গিত প্রদান করেন।

নরেন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বিষয় ও চরিত্রের এই সকল বৈশিষ্ট্য ব্যতীত সমসাময়িক রচনাকারদের সঙ্গে তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও ভিন্নতার আর একটি কারণ হল তাঁর গল্প বলার ভঙ্গি। অত্যন্ত অনায়াস সহজ ভঙ্গিতে, সহজ সরলতায় তিনি তাঁর গল্পকে বলতেন; ভাষাবিন্যাস, চরিত্রচিত্রণ ও আঙ্গিকের মধ্যে জটিলতার সঞ্চার করতেন না। তাঁর রচনা যে খুব আঙ্গিকসচেতন তা মনে হয়না আর এই সচেতনার অভাবযুক্ত আঙ্গিকটিই তাঁর বিশেষত্ব, তাঁর বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গী। যেখানে একটা গল্প আছে আর সেই গল্পকে সহজ সরলতায় প্রকাশ করা আছে। গল্পকে প্রথম থেকেই কৌতূহলদ্দীপক করে, নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে ঘটনাকে ভিন্নমুখী করে পাঠককে চমকে দেওয়ার প্রবণতা নরেন্দ্রনাথের নেই বরং তাঁর গল্পে চমকহীন এক উদ্ভাসন আছে যা পাঠকের অন্তরে গল্প পাঠের শেষেও অনেকক্ষণ অনুরণিত হয়। তাঁর 'রস', 'জৈব', 'নাম', 'দীপান্বিতা' এমন অনেক গল্পের কথাই এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। নরেন্দ্রনাথের গল্পের আঙ্গিক সম্পর্কে তাই আলোচক সঙ্গত কারণেই বলেন—"নরেন্দ্রনাথ পাঠের মধ্যে আরও একটি ধারণা স্বচ্ছ হয়ে ওঠে—ঘাসের ওপর শিশির বিন্দুটি আবিষ্কারের মতো গল্পের প্লটের জন্যে দেশ দেশান্তরে পাহাড়ে জঙ্গলে না গিয়েও অবলীলায় ও অনায়াসে খুঁজে পাওয়া যায় সেই জমি যা সাধারণ জীবন যাপনের ঘটনাগুলির মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে। শুধু চাই একটি কোমল বুক ও তৃষ্ণার্ত চোখ। নবীন লেখক যখন কোনো প্লটের জন্যে ক্রমশ অস্থির হয়ে ওঠে তখন মনে হয় নরেন্দ্রনাথ পাঠ একান্ত

অনিবার্য। কোনো কাহিনিতে এক নতুন মাত্রা কীভাবে যোগ করা যায় তার সুন্দর নিদর্শন প্রতিটি গল্পেই অসামান্য নৈপুণ্যে উপস্থাপনা করেন তিনি।"[৩২]

নরেন্দ্রনাথ প্রচুর ছোটগল্প লিখেছেন। তাঁর প্রাপ্ত ছোট গল্পের সংখ্যা চারশতেরও উপরে। শুধু তাই নয় তিনি আটত্রিশটি উপন্যাসও রচনা করেছেন, যাদের মধ্যে 'দ্বীপপুঞ্জ', 'চেনামহল', 'সূর্যসাক্ষী', 'তিনদিন তিনরাত্রি', 'দেহমন' প্রভৃতি উপন্যাস অসামান্য জনপ্রিয়তা ও পাঠক- আনুকূল্য লাভ করেছে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথের সাফল্যের কথা উল্লেখ করেও বলা যায় যে তাঁর প্রতিভার সার্থক প্রকাশ রয়েছে তাঁর ছোটগল্পের মধ্যেই। রচনার পরিমাণ এত অধিক বলে স্বাভাবিক কারণেই একথা বলাই বাহুল্য যে তাঁর সমস্ত গল্পই আঙ্গিক বা রচনারীতির দিক থেকে ত্রুটি মুক্ত নয়, কিন্তু এর সঙ্গে একথাও সত্য যে রচনার অধিক্য সত্ত্বেও তাঁর অধিকাংশ রচনায় তিনি সর্বোচ্চ মান বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এই দিকটি অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়। চারশতের উপর ছোটগল্পের অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি যে অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন সেই বিষয়টিই তাঁকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। কারণ এত অধিক সংখ্যায় এত ভালোমানের গল্প বাংলা সাহিত্যে প্রায় আর কেউই রচনা করেননি। এই প্রসঙ্গে তাঁর ছোটগল্প গ্রন্থগুলির তালিকা উল্লেখ করা যেতে পারে — 'অসমতল' (১৩৫২), 'হলদেবাড়ি' (১৩৫৩), 'উল্টোরথ' (১৩৫৩), 'পতাকা' (১৩৫৪), 'চড়াই উৎরাই' (১৩৫৬), 'পাটরাণী' (১৩৫৭), 'শ্রেষ্ঠগল্প' (১৩৫৯), 'কাঠগোলাপ' (১৩৬০), 'অসবর্ণ' (১৩৬১), 'ধূপকাঠি' (১৩৬১), 'মলাটের রঙ' (১৩৬২), 'রূপালী রেখা' (১৩৬৩), 'দীপান্বিতা' (১৩৬৩) , 'ও পাশের দরজা' (১৩৬৩), 'একূল ওকূল' (১৩৬৩), 'বসন্ত পঞ্চম' (১৩৬৪), 'মিশ্ররাগ' (১৩৬৪) 'উত্তরণ' (১৩৬৫), 'পূর্বতনী' (১৩৬৬) 'অঙ্গীকার' (১৩৬৬), 'দেবযানী' (১৩৬৬), 'রূপসজ্জা' (১৩৬৬), 'সভাপর্ব' (১৩৬৬), 'স্বরসন্ধি' (১৩৬৭), 'ময়ূরী' (১৩৬৮), 'বিদ্যুৎলতা' (১৩৬৮), 'পত্রবিলাস' (১৩৬৮), 'মিসেস গ্রীণ' (১৩৬৮), 'বিন্দু বিন্দু'(১৩৬৮), 'একটি ফুলকে ঘিরে' (১৩৬৯), 'বিনি সুতার মালা' (১৩৬৯), 'যাত্রাপথ' (১৩৬৯), 'সুধা হালদার ও সম্প্রদায়' (১৩৬৯), 'অনধিকারিনী' (১৩৬৯), 'রূপলাগি' (১৩৭০), 'চিলেকোঠা' (১৩৭১), 'প্রজাপতির রঙ' (১৩৭২), 'অন্য নয়ন' (১৩৭২), 'বিবাহ বাসর' (১৩৭৩), 'চন্দ্রমল্লিকা' (১৩৭৪), 'সন্ধ্যারাগ' (১৩৭৫), 'সেই পথটুকু' (১৩৭৬), 'অনাগত' (১৩৮২), 'পালঙ্ক' (১৩৮২), 'উদ্যোগপর্ব' (১৩৮২), 'বর্ণবহ্নি' (১৩৮৪), 'বিকালের আলো' (১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ), 'নাগরিক প্রেমের উপাখ্যান' (১৩৯০), 'গল্পমালা -১' (১৯৮৬খ্রি), 'কিশোর গল্প সমগ্র' (১৩৯৫), 'গল্পমালা -২' (১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ), 'স্রোতস্বতী' (১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ), 'সাধ সুখ স্বপ্ন'(১৯৯০খ্রি), 'এই টুকু বাসা' (১৯৯০ খ্রি), 'গল্পমালা-৩' (১৯৯২খ্রি), 'গল্পমালা-৪' (১৯৯৪ খ্রি), 'গল্পমালা-৫' (১৯৯৭খ্রি), 'গল্পমালা-৬' (২০০১খ্রি), 'গল্পমালা-৭' (২০০৩খ্রি)।

এই সকল গল্পগ্রন্থে সংকলিত অসংখ্য গল্পগুলি কোনো তত্ত্ব বা উদ্দেশ্যমূলকতার দ্বারা ভারাক্রান্ত

নয়, অথচ আমাদের চির পরিচিত মানুষজনের চির পুরাতন অথচ চির নবীন প্রাত্যহিক জীবনের উপস্থাপনায় উজ্জ্বল। নরেন্দ্রনাথের গল্পগুলি যেমন বিভিন্ন বিখ্যাত ও স্বল্পখ্যাত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তেমনি রেডিওতেও পঠিত হয়েছে; শুধু তাই নয় বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু গল্প বিদেশি ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে। তাঁর একাধিক গল্প চলচ্চিত্রেও রূপায়িত হয়েছে। যেমন 'অবতরণিকা' গল্পটি অবলম্বনে সত্যজিৎ রায় 'মহানগর' ছবিটি তৈরি করেন। এছাড়া অগ্রগামী পরিচালিত 'বিলম্বিত লয়', 'হেডমাস্টার' এবং ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ প্রযোজনায় রাজেন তরফদার পরিচালিত 'পালঙ্ক' গল্পের চলচ্চিত্রায়িত হওয়ায় কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। শুধু তাই নয় নরেন্দ্রনাথের 'রস' গল্পটি হিন্দিতে 'সত্তদাগর' নামে চিত্ররূপ লাভ করেছে। এই সব গল্পের চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হবার দিকটি গল্পগুলির গুণমানের ঔৎকর্ষকেই সপ্রমাণ করে। এত গল্পগ্রন্থ, চলচ্চিত্রে রূপায়ণ, সমসাময়িক গল্পকারদের স্তুতি ও আলোচকদের আনুকূল্য সত্ত্বেও দেখা যায়, নরেন্দ্রনাথ যে পরিমাণে প্রশংসিত ও আলোচিত হবার যোগ্য, সেই পরিমাণে যেন স্বীকৃতি লাভ করেননি। ১৯৬২ তে আনন্দ পুরস্কার ব্যতীত অন্য বিশেষ কোনো প্রতিষ্ঠানিক স্বীকৃতিও তিনি লাভ করেননি। যদিও সন্তোষকুমার ঘোষ দিব্যেন্দু পালিতকে বলেছিলেন- "একটা কথা লিখে দাও নরেন্দ্রনাথ মিত্র ছিলেন আমাদের সময়কার সবচেয়ে বড়ো লেখক।" (সূত্র- 'আমার চেনা নরেনদা' ঃ দিব্যেন্দু পালিত। গ্রন্থ- 'প্রসঙ্গঃ নরেন্দ্রনাথ'। সম্পাদনা সমীর বসু। পৃষ্ঠা-২৩)। সমসাময়িক প্রখ্যাত গল্পকারদের কাছে একটি সময়ের 'সবচেয়ে বড়ো লেখক' অভিধায় ভূষিত হয়েও দেখা যায়, যে নরেন্দ্রনাথ অন্য অনেক রচনাকারদের থেকে কম আলোচিত ও পঠিত। এর একটি কারণ হিসেবে বলা যায় — বিজ্ঞাপনের অভাব ও তাঁর গল্পগ্রন্থের দুস্প্রাপ্যতা। আনন্দ পাবলিকেশনের 'গল্পমালা' গুলি প্রকাশিত হবার পূর্বে নরেন্দ্রনাথের গল্পগ্রন্থগুলি খুব একটা সহজলভ্য ছিল না। যেহেতু তাঁর রচনা প্রচারধর্মী নয় তাই তাঁর প্রশংসালাভের ক্ষেত্রটি যেন সংকুচিত হয়ে গেছে। নরেন্দ্রনাথের স্বীকৃতিলাভের স্বল্পতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তাই আলোচক বলেন — "মূলতঃ নরেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রচার বিমুখ, সাহিত্যের কোন বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত হতেও তাঁর তেমন উৎসাহ ছিলনা। তাই সমসাময়িক কালের লেখকদের মধ্যে সংখ্যায় এত বেশি ভাল গল্প আর কেউ না লিখলেও তুলনায় স্বীকৃতি তিনি কিছুটা কমই পেয়েছেন।"[৩৩]

স্বীকৃতি ও পরিচিতির স্বল্পতা থাকলেও নরেন্দ্রনাথ শুধুমাত্র তাঁর সময়ে নন বাংলা ছোটগল্প জগতেই একজন অসামান্য ও উল্লেখযোগ্য শিল্পি। সহজ সরলতায়, দৈনন্দিন ব্যবহার্য ভাষায় প্রাত্যহিক জীবনের কঠোর বাস্তবতার চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন আর তার সঙ্গে যুক্ত করেছেন নিজের হৃদয়ের উষ্ণতা। হৃদয়গ্রাহী তাঁর রচনাগুলিকে তিনি তাঁর মানসিকতা অনুসারেই শান্ত, স্নিগ্ধ ও সুস্থ সুষ্ঠুতায় প্রকাশ করেছেন। লেখার পিছনে যে অনেক চিন্তন, মননশীলতা আছে তা রচনার সহজ সরলতা ও সাবলীলতায় যেন চোখে পড়ে না কিন্তু তা হৃদয়কে নাড়া দিয়ে যায়। সময়ের চাহিদা মেটাতে নিজের রচনাকে জনপ্রিয়তা দেবার

জন্য সহজ ও সস্তা কোনো পন্থা তিনি গ্রহণ করেননি বরং নিজের মানসিকতা বুঝে তিনি চিরকাল 'ভালোবাসার গল্প'ই রচনা করে গেছেন। এই ভালোবাসার গল্পের সহজ স্নিগ্ধতা অথচ অনিবার্য প্রবল গতি, সংহতি ও লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা বাংলা ছোটগল্পের জগতে প্রকৃতপক্ষেই এক নতুন মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রের শক্তিমত্তার পরিচায়ক।

-ঃঃ উল্লেখপঞ্জি ঃঃ-

১. নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'গল্প লেখার গল্প', গল্পমালা - ১, প্রথম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা - ১১.

২. 'ধ্বনি' পত্রিকার সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সাক্ষাৎকার, মে ১৯৬৮

৩. রত্না মণ্ডল ঃ 'নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে মধ্যবিত্ত সমাজ', 'বাংলা ছোট গল্প ঃ পর্ব-পর্বান্তর', সম্পাদনা তরুণ মুখোপাধ্যায়, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০০৫, পৃষ্ঠা - ১৫৯

৪. অরুনকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ 'কালের পুত্তলিকা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৪, পৃষ্ঠা - ১৮২.

৫. শ্রী ভূদেব চৌধুরী ঃ 'বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্প ও গল্পকার', মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ (নতুন সংস্করণ) ২০০৩, পৃষ্ঠা - ৩৮৭.

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লিখিত পত্র, ৩১শে আশ্বিন, ১৩৩৫.

৭. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ 'কালের পুত্তলিকা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৪, পৃষ্ঠা - ২০৮.

৮. তদেব, পৃষ্ঠা ১৯৯

৯. নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'গল্প লেখার গল্প', 'গল্পমালা - ১', প্রথম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৯ পৃষ্ঠা - ১১.

১০. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ 'কালের পুত্তলিকা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৪, পৃষ্ঠা - ১৯৯.

১১. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৯৬.

১২. সরোজ মোহন মিত্র ঃ 'বাংলায় গল্প ও ছোট গল্প', তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত তুলসী প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা - ১৯৪.

১৩. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ 'কালের পুত্তলিকা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৪, পৃষ্ঠা - ২২০.

১৪. বীরেন্দ্র দত্ত ঃ 'বাংলা ছোট গল্প ঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ' (প্রথম খন্ড), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ, ২০০৪, পৃষ্ঠা - ৩০৬.

১৫. সুকুমার সেন ঃ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', (পঞ্চম খন্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,

কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা - ৩৫৫.

১৬. শ্রীভূদেব চৌধুরী ঃ 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার', মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা পঞ্চম প্রকাশ (নতুন সংস্করণ), ২০০৩, পৃষ্ঠা - ৪১১.

১৭. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ 'কালের পুত্তলিকা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৪, পৃষ্ঠা - ৩৩৮.

১৮. তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৩৮.

১৯. সরোজ মোহন মিত্র ঃ 'বাংলায় গল্প ও ছোট গল্প', তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তুলসী প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা - ২৫২.

২০. 'নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী', ২য় খন্ড, বিশেষ সংস্করণ ১৯৯৬, পৃষ্ঠা - ৬৩০.

২১. অরিন্দম গোস্বামী ঃ 'সুবোধ ঘোষ ঃকথা সাহিত্য', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০০১, পৃষ্ঠা - ২৬২.

২২. উজ্জ্বল কুমার মজুমদার ঃ 'শতবর্ষের বাংলা ছোট গল্প ঃ একটি রূপরেখা', 'দেশ' ৩রা আগষ্ট ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত।

২৩. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ 'কালের পুত্তলিকা', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৪, পৃষ্ঠা -৩৫৮

২৪. নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'বলা বাহুল্য'। ('দ্বীপপুঞ্জ' উপন্যাসের ভূমিকা), 'উপন্যাস সমগ্র - ১', আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৪, পৃষ্ঠা - ৭৫২.

২৫. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ 'কালের পুত্তলিকা', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৪, পৃষ্ঠা -৩৭৪.

২৬. সরোজমোহন মিত্র ঃ 'বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প', তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তুলসী প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা - ২৭৮.

২৭. ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ'আমাদের কথা', 'প্রসঙ্গ নরেন্দ্রনাথ মিত্র', সম্পাদনা সমীরবসু, পদক্ষেপ সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০০১, পৃষ্ঠা -৫.

২৮. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ 'কালের পুত্তলিকা', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৪, পৃষ্ঠা -৩৭৫.

২৯. মঞ্জুরী চৌধুরী ঃ 'ছোটগল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্র', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬,

পৃষ্ঠা- ১৮১.

৩০. সমীর বসু ঃ 'নরেন্দ্রনাথের ছোটগল্পের কয়েকটি চিহ্ন বিচার', 'প্রসঙ্গ নরেন্দ্রনাথ মিত্র', সম্পাদনা সমীর বসু, পদক্ষেপ সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০০১, পৃষ্ঠা - ৯৫

৩১. শরদিন্দু কর ঃ 'সাধারণ পাঠকের চোখে নরেন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্প', 'প্রসঙ্গ নরেন্দ্রনাথ মিত্র', সম্পাদনা সমীর বসু, পদক্ষেপ সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০০১, পৃষ্ঠা -৮৭

৩২. তদেব, পৃষ্ঠা -৯১

৩৩. মঞ্জুরী চৌধুরী ঃ 'ছোটগল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্র', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা - ১৮৭

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্প থেকে যে সকল পংক্তি উদ্ধার করা হয়েছে সে সকল অভিজিৎ মিত্র সম্পাদিত ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পমালা ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কিশোর গল্প সমগ্র থেকে গৃহিত।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'গল্পমালা ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ এবং ৭'।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'কিশোর গল্পসমগ্র'।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'উপন্যাস সমগ্র ১, ২, ও ৩'।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী - ২.

সহায়ক গ্রন্থ

১. সমীর বসু (সম্পাদিত) ঃ 'প্রসঙ্গ ঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র'।

২. অঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য ঃ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'জীবন ও সাহিত্য'।

৩. বর্ণালী ঘোষ সিন্‌হা ঃ 'নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাসের আঙ্গিক'।

৪. মঞ্জুরী চৌধুরী ঃ 'ছোট গল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্র'।

৫. অর্জুন রায় (সম্পাদিত) ঃ 'ভাঙা কাঁচের শিল্প'।

৬. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ও জ্যোতিপ্রসাদ রায় (সম্পাদিত) ঃ 'ছোটগল্প ঃ বিকাশ, পরিণতি ও উপলব্ধি'।

৭. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী ঃ 'রবীন্দ্রনাথ ঃ ছোটগল্পের প্রকরণ শিল্প'।

৮. সরোজমোহন মিত্র ঃ 'বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প'।

৯. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ 'কালের পুত্তলিকা' (বাংলা ছোটগল্পের একশ দশ বছরঃ ১৮৯১-২০০০)

১০. শ্রীভূদেব চৌধুরী ঃ 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার'।

১১. ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঃ 'বাংলা সাহিত্য পরিচয় ও সাহিত্য টীকা' (প্রাচীন মধ্য - আধুনিক যুগ)।

১২. অরিন্দম গোস্বামী ঃ 'সুবোধ ঘোষ কথাসাহিত্য'।

১৩. রবিন পাল ঃ 'বাংলা ছোটগল্পঃ কৃতী ও রীতি'।

১৪. রমাপ্রসাদ নাগ ঃ 'স্বতন্ত্র নির্মিতি ঃ অমিয়ভূষণ সাহিত্য'।

১৫. রবিন পাল ঃ 'উপন্যাসের উজানে'।

১৬. গৌরমোহন রায় ঃ 'তারাশঙ্কর সাহিত্য সমীক্ষা'।

১৭. অতুলচন্দ্র গুপ্ত ঃ 'কাব্যজিজ্ঞাসা'।

১৮. বীরেন্দ্র দত্ত ঃ 'বাংলা ছোটগল্পঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ' (১ম ও ২য় খন্ড)।

১৯. তরুণ মুখোপাধ্যায় ঃ 'বাংলা ছোটগল্পঃ পর্ব - পর্বান্তর'।

২০. প্রসূন ঘোষ ঃ 'উপন্যাসের নানা স্বর'।

২১. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী ঃ 'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য'।

২২. ভাস্বতী চক্রবর্তী (লাহিড়ী) ঃ 'সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলা ছোটগল্প' (১৯৪০-৫০)।

২৩. অশ্রুকুমার শিকদার ঃ 'আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস'।

২৪. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর'।

২৫. শিশির কুমার দাশ ঃ 'বাংলা ছোটগল্প'(১৮৭৩-১৯২৩)।

২৬. সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী ঃ 'আধুনিক বাংলা ছোটগল্প মূল্যবোধের সংকট'।

২৭. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'সাহিত্যে ছোটগল্প'।

২৮. তপোব্রত ঘোষ ঃ 'রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ'।

২৯. তপোধীর ভট্টাচার্য ঃ 'ছোটগল্পের অন্তর্ভুবন'।

৩০. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ 'ছোটগল্পের সীমারেখা'।

৩১. অলোক চক্রবর্তী ঃ 'সন্তোষ কুমার ঘোষ কথাসাহিত্যে স্বয়ং নায়ক'।

৩২. রথীন্দ্রনাথ রায় ঃ 'ছোটগল্পের কথা'।

৩৩. সুকুমার সেন ঃ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (৫ম খন্ড)।

৩৪. মনোজ মুখোপাধ্যায় ঃ' বাংলা ছোটগল্প উৎস ও স্বরূপ'।

৩৫. কোকা আন্তোনভা, গ্রিগোরি বোন্‌গার্দ লেভিন, গ্রিগোরি কতোভ্‌স্কি ঃ 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'।

৩৬. উজ্জ্বল কুমার মজুমদার (সম্পাদিত) ঃ 'পঞ্চাশের দশকের কথাকার'।

৩৭. সন্দীপ দত্ত (সম্পাদিত) ঃ 'গল্পের কোলাজ'।

৩৮. জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) ঃ 'সুবোধ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প'।

৩৯. 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা'।

৪০. রামেশ্বর শ ঃ 'আধুনিক বাংলা উপন্যাস'।

৪১. বারিদবরণ দাস (সম্পাদিত) ঃ 'সতীনাথ ভাদুড়ীর শ্রেষ্ঠ গল্প'।

৪২. যুগান্তর চক্রবর্তী (সম্পাদিত) ঃ 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প'।

৪৩. 'সমরেশ বসুর বাছাই গল্প' (মন্ডল বুক হাউস,কলকাতা)।

৪৪. 'বিমল করের বাছাই গল্প' (মন্ডল বুক হাউস, কলকাতা)।

৪৫. দেবকুমার বসু (সম্পাদিত) ঃ 'বাছাই গল্প অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত'।

৪৬. জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) ঃ 'প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প'।

৪৭. সুবীর রায়চৌধুরী (সম্পাদিত) ঃ 'জগদীশ গুপ্তর গল্প'।

৪৮. জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) ঃ 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প'।

৪৯. 'বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প' (বাণীশিল্প সংস্করণ)।

৫০. নিতাই বসু (সম্পাদিত) ঃ 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প'।

৫১. জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) ঃ 'তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ ১ম, ২য় ও ৩য়'।

৫২. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ঃ 'কল্লোল যুগ'।

৫৩. প্রমথনাথ বিশী ঃ 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প'।

৫৪. ক্ষেত্রগুপ্ত ঃ 'রবীন্দ্রনাথ ঃ ছোটগল্পের সমাজতত্ত্ব'।

৫৫. অশোক কুমার মিশ্র ঃ 'সাহিত্যের রূপরীতি কোষ'।

৫৬. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ 'সাহিত্য সন্ধান'।

৫৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার ঃ 'বাংলাদেশের ইতিহাস'। (চতুর্থ খণ্ড)

৫৮. Sumit Sarkar : ' The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908'।

৫৯. Buddhadeva Bose : 'An Acre of Green Grass : A review of modern Bengali Literature.'।

৬০. E. M. Forster : 'Aspects of the Novel'।

৬১. Brander Mathews : 'The Philosophy of the Short Story' ।

৬২. Frank O' Conor : 'The lonely voice : A Study of Short Story'।

৬৩. Sean O' Faolin : 'The Short Story'।

৬৪. Valerie Show : 'The Short Story : A critical introduction'।

৬৫. William Henry Hudson : 'An Introduction to the Study of Literature' ।

সহায়ক পত্রিকা

১. 'শারদীয়া দেশ', ১৪০৩.

২. 'মাসিক বাংলাদেশ', ৪র্থ বর্ষ, সংখ্যা ৯ম, ১০ম।

৩. 'এবং মুশায়েরা', সুবল সামন্ত (সম্পাদিত) গল্প ও গল্পকার সংখ্যা ১,২,৩,৪।

৪. 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি', সঞ্জীব কুমার বসু (সম্পাদিত), নরেন্দ্রনাথ মিত্র সংখ্যা।

৫. 'পরিচয়', ডিসেম্বর ১৯৭৫.

৬. 'দেশ', সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮২ বঙ্গাব্দ।

৭. 'আবহমান ভাঙ্গা', সাদ কামালী (সম্পাদিত), নরেন্দ্রনাথ মিত্র সংখ্যা।

৮. 'কল্লোল' চৈত্র ১৩৩৪।

৯. 'দেশ', সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৮২